তামস-তপস্যা

এক

পানু ওরফে প্রাণকৃষ্ণ দাস অকস্মাৎ গো-হত্যা করিয়া বসিল।

কারণ অতি সামান্য;—একটি হাস্নাহানার কলমের চারা। পানু তাহার দোকানের বারান্দার দুই পাশে অতি যত্নে মাটি তৈয়ারী করিয়া সেখানে কিছু ফুলের চারা বসাইয়াছিল। বর্ষার শেষে বসাইয়াছিল, কিছু গাঁদার চারা, কয়েকটি অতসী, গোটা-দুয়েক মোরগ ফুল, তাহারই মধ্যে একটি হেনার কলম। হেনার গাছ এ অঞ্চলে নাই। সে মুরশিদাবাদ গিয়াছিল, সেখান হইতে একটি ডাল আনিয়া পুঁতিয়াছিল। দিনে দশ-বিশবার যখনই সে অবসর পাইত, তখনই গাছটির কাছে গিয়া বসিত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডালটির সর্ব্বাঙ্গ খুঁজিয়া দেখিতে চাহিত সবুজ একটি অঙ্কুর-কণা। ক্রমে সেই ডালটি বর্ষার স্নেহ-সিঞ্চনে, পানুর সযত্ন পরিচর্য্যায় সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া অঙ্কুর বিকাশ করিল—ধীরে ধীরে সেই অঙ্কুর পত্রঘন সরস সবুজ পল্লবে পরিণত হইল। গাছটি সতেজ নধর একটি শিশুর মত দিন দিন নব নব লাবণ্যে ও পরিপুষ্টিতে বাড়িয়া উঠিতেছিল। পানু হুঁকা হাতে গাছটির পাশে বসিয়া মায়ের মত স্নেহে তাহার পত্রপল্লব-গুলিতে হাত বুলাইত। পাতার উপর এতটুকু ধূলামাটি লাগিয়া থাকিলে মুছিয়া দিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মুখের মত তাহার মুখ—আকারে প্রকাণ্ড, চোখের পাশে হনুর হাড় দুইটা উঁচু, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, অতি বিস্তৃত মুখগহ্বর; পানুর সেই মুখ, গাছটির পাশে বসিয়া হাসিতে ভরিয়া

উঠিত। পানু শক্তিতে আকৃতিতে দৈত্যের মত। একা কোদাল চালাইয়া সে বাড়ীর পাশে একটা ছোট গড়ে কাটিয়াছে, গড়েটির পাড়ের উপর তরীতরকারী কলা—আম জাম কাঁঠালের গাছে ভরিয়া তুলিয়াছে। বৃক্ষশিশু তাহার অনেক। কিন্তু এই হেনার চারাটি তাহার কাছে যেন শত পুত্রের মধ্যে একমাত্র কন্যা।

সেদিন সবেমাত্র পানুর ভক্তের নেশাটি ধরিয়া আসিয়াছে; মৃদু মৃদু নাক ডাকিতে শুরু করিয়াছে, এই অবসরে একটা দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার বাছুর কোথা হইতে আসিয়া সরস সবুজ গাছটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। পশুর মেধা নাই, কিন্তু বোধ-শক্তি আছে, সে অজ্ঞান কিন্তু অভিজ্ঞতাকে সে ভোলে না। গরু-ছাগল সযত্নপালিত গাছ চিনিতে পারে এবং সেগুলিকে অতি দ্রুত খাইয়া সরিয়া পড়ে; কিন্তু এ বাছুরটা এত দুর্ব্বল এবং হেনার চারাটির রস এত মধুর যে, সে খাইতেছিল অতি ধীরে ধীরে। গাছটাকে খাইয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে এমন সময় পানুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দুঃখে, ক্ষোভে, দুর্দ্দান্ত পানু প্রথমটা যেন মূক হইয়া গেল। সদ্য ঘুমভাঙ্গা লাল চোখ বিস্ফারিত করিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত গাছটা ও বাছুরটার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর অকস্মাৎ প্রচণ্ড রাগে বুদ্ধিবিবেচনা সব হারাইয়া ফেলিয়া পাকা বাঁশের লাঠিখানা টানিয়া লইয়া ঝাড়িয়া দিল বাছুরটার উপর। বাছুরটার এতক্ষণে বোধশক্তি জাগিয়াছিল, দুর্ব্বল দেহে সে ছুটিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু লাঠিখানা হইতে বাঁচিবার মত দূরত্ব অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই লাঠিখানা আসিয়া পড়িল কোমরের পাশে—পিছনের একখানা পায়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বাছুরটা একটা অতি কাতর শব্দ করিয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল।

পানুর রাগ তবু গেল না। বাছুরটার বেদনাবিস্ফারিত বড় বড় কালো চোখ দুইটার সম্মুখে লাঠিগাছটা বার বার ঠুকিয়া বলিল—ওঠ শালা ওঠ! আবার কলা ক'রে পড়ে আছে দেখ। ওঠ! লাঠির ডগার খোঁচা দিয়া বাছুরটাকে আবার সে ঠেলিয়া দিল।

ভয়বিহ্বল জীবটা আর কয়েক বাকী পা তিনটা আছড়াইয়া উঠিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। নিরুপায়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার সে শিথিল দেহে নিশ্চেষ্ট হইয়া এলাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা ঘন আন্দোলনে বার কয়েক কাঁপিয়া উঠিল; সে কম্পিত আন্দোলনের চাপে চোখের কোণ হইতে অশ্রুর দুইটি দীর্ঘ ধারা গড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। কয়েকটি বিন্দু চক্ষুপল্লবের দীর্ঘ রোঁয়ের প্রান্তে শিশিরবিন্দুর মত লাগিয়া রহিল। পশুটার দিকে পানু চাহিয়া ছিল স্থির দৃষ্টিতে।

পানু দাস নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। অত্যন্ত রূঢ়—মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুর। কথায় কথায় সে মানুষের অপমান করে, দুই চারি কথার পরেই সে লাঠি চালাইয়া বসে। আহত মস্তক, মানুষের রক্তাক্ত মুখ সে অনেক দেখিয়াছে। কিন্তু আজ ওই জীবটার চোখের জল দেখিয়া অকস্মাৎ সে বিচলিত হইয়া পড়িল। হাতের লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে, সসঙ্কোচে বাছুরটার গায়ে হাত দিল।

অস্থিচর্ম্মসার পশু-শাবক। গায়ের রোঁয়াগুলি পর্য্যন্ত অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে। বিরল রোমগুলির উপরেই মাঝে মাঝে তাহার মায়ের সস্নেহ লেহনের চিহ্ন চিকণ হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। বেচারার মায়ের দুধের শেষ ফোঁটাটি পর্য্যন্ত গৃহস্থে টানিয়া বাহির করিয়া লয়। ক্ষুধার জ্বালায় কঙ্কালসার বাছুরটা ওই ঘনসবুজ নরম গাছটির উপর মুখ বাড়াইয়াছিল; মুখের পাশ বাহিয়া সবুজরস-মিশ্রিত লালা এখনও গড়াইয়া পড়িতেছে; কয়েকটা পাতা এখনও গোটাই রহিয়াছে। পানু ধীরে ধীরে স্নেহভরেই বাছুরটার পাঁজরাগুলির উপর হাত বুলাইয়া দিল।

বাছুরটা ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল; বড় কালো চোখের অসহায় ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিও কাঁপিতেছিল। থাকিতে থাকিতে সে জিভ দিয়া পানুর হাত চাটিতে আরম্ভ করিল।

পানুর চোখ অকস্মাৎ সজল হইয়া উঠিল। বেশ ভাল করিয়া নাড়িয়া-

চাড়িয়া দেখিল, বাছুরটার পিছনের পা খানা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পানুর মনে পড়িয়া গেল,—তাহার বাবা দারোগার কাছে প্রচণ্ড নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত হইয়া সামান্য কয়েকটা আশ্বাসের কথায় হাসিয়া—আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিল। সে আপনার পিঠে হাত দিল। চামড়া জমাট বাঁধিয়া লম্বা টানা চলিয়া গিয়াছে পিঠের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত। একটা নয়—একটার পর একটা। সারি সারি। পানুর প্রকাণ্ড প্রশস্ত পিঠের কালো চামড়ার উপর গাঢ়তর কালো রঙের লম্বা টানা সারি সারি দাগ দেখা যায়।

বেতের দাগ।

বহুদিন পূর্ব্বের কথা।

বাংলা তের শো তের সাল; জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনা।

পানুর বয়স তখন বার-তের বৎসর। সে তখন স্কুলের ছাত্র। হাকিম অথবা উকীল হইবার কিম্বা লেখাপড়া শিখিয়া গাড়ী ঘোড়া চড়িবার সাধ পানুর ছিল কিনা সে কথা পানুর মনে নাই। তবে স্কুলে সে শান্ত শিষ্ট বোকা ছেলে ছিল। পৃথিবীর মধ্যে নিরীহ পোষ্টমাষ্টারটিকে তাহার বড় ভাল লাগিত— এমনই একটি পোষ্টমাষ্টার হইবার সাধ মধ্যে মধ্যে তাহার হইত।

পানুর বাপের ছিল জাতীয় ব্যবসা, বেনেতী মশলার দোকান। বড় ভাই জীবন বাপের সঙ্গে দোকান দেখিত। বেচাকেনা মন্দ ছিল না। গ্রামখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। পোষ্টাপিস, সাবরেজেষ্ট্রী আপিস, হাইস্কুল আছে, থানা পানুদের বাড়ীর একেবারে সামনে; ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার এপারে পানুদের বাড়ী, ওপারে থানা। থানার জমাদার মধ্যে মধ্যে তামাক খাইতে আসিত। বাপ বলিত বন্ধু লোক। কিন্তু বন্ধুলোক একদিন বিগড়াইয়া গেল। পানুদের বাড়ীর পাশের প্রতিবেশী ধনী মহাজন নাকু দত্ত অকস্মাৎ একদিন রাত্রে খুন

হইয়া গেল। নাকু দত্ত কৃপণ অর্থশালী লোক ছিল, সোনা রূপার অলঙ্কার বাঁধা রাখিয়া চড়াসুদে মহাজনী কারবার করিত। নাকু দত্তের বাড়ীর এক দিকে পানুর বাপ শ্যামাদাসের দোকান ও বাড়ী, অন্য পাশে মাধব ময়রার বাড়ী, সামনে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার ওপারে পুলিশের আস্তানা—থানা। নাকু দত্ত সংসারে একা মানুষ। স্ত্রী অনেক পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিল। তিনটি কন্যার সকলেই থাকিত স্বামীর ঘরে, নাকু দত্ত সম্মুখের থানার ভরসায় রাস্তার ধারের বারান্দায় শুইয়া থাকিত নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে। সেদিন সকালে দেখা গেল নাকু দত্ত দোকানের বারান্দা হইতে গড়াইয়া রাস্তার উপরে পড়িয়া আছে, আতঙ্কবিস্ফারিত নিষ্পলক দৃষ্টি, তাহার গলার নলীটা কে বা কাহারা দুইভাগে কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। বিছানাটা রক্তাক্ত, ফোয়ারার মত রক্তের ফিনকিতে দেওয়ালটাও রক্তাক্ত। নাকুর দেহের পাশে রাস্তার খানিকটা অংশের ধূলা কাদার মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। নাকুর দরজা ভাঙ্গা, ঘরের জিনিষপত্র ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, বন্ধকী সোনা রূপার অলঙ্কারের নাকি এক টুকরাও নাই।

নাকু দত্তের মৃতদেহের সে বীভৎস রূপ আজও পানুর মনে আছে। জীবনে বিভীষিকার মধ্যে একমাত্র নাকু দত্তের মৃতদেহের স্মৃতি এবং স্বপ্ন। বালক পানু সেদিন অঝোর ঝোরে কাঁদিয়াছিল। ভয়ে দুঃখে তাহার কচি মন দুরন্ত আঘাত পাইয়াছিল। কিন্তু সেইদিন সন্ধ্যায় তাহার বাপকে যখন থানায় ধরিয়া লইয়া গেল তখন নাকু দত্তের জন্য দুঃখ এক মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইয়া গেল। অসহনীয় আতঙ্কে সে অধীর হইয়া উঠিল।

'খুন করিলে খুন দিতে হয়', যে খুন করে তাহাকে ফাঁসী কাঠে ঝুলিয়া খুন হইতে হয়। প্রতিমুহূর্ত্তে নাকু দত্তের ছিন্নকণ্ঠ দেহের পাশে সে তাহার বাপের দেহ ফাঁসীতে ঝুলানো দেখিতে পাইল। বালকের কল্পনা সে দেহখানাকে দুলিতে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল। সমস্ত রাত্রি তাহার ঘুম হইল না।

পরদিন সকালে পুলিশ আসিয়া তাহাদের বাড়ীর সমস্ত জিনিষপত্র

ছড়াইয়া তছনছ করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। এমন কি ঘরের মেঝে বাড়ীর উঠান পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া বাড়ীটাকে চষা মাঠে পরিণত করিয়া ফেলিল। কিন্তু তবু পানু খানিকটা আশ্বস্ত হইল—নাকু দত্তের সোনা রূপার এক কণাও তাহাদের বাড়ীতে পাওয়া গেল না। তবে তাহার বাবা খুন করে নাই। আরও আশ্বস্ত হইল যখন পুলিশ তাহার বাপকে ছাড়িয়া দিয়া গেল।

শ্যামাদাস স্তব্ধ হইয়া নতমুখে বসিয়া ছিল—চোখ দিয়া কেবল ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

পানুর মনে বার বার একটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল, বাবা, তোমাকে মেরেছে? কিন্তু শ্যামাদাসের এই মূর্ত্তির সম্মুখে তাহার সে প্রশ্ন মূক হইয়া গেল। সে মাধব ময়রার বাড়ীও একবার ঘুরিয়া আসিল। মাধবকেও পুলিশ ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার বাড়ীর অবস্থাও ঠিক তাহাদের বাড়ীর মতই হইয়াছে। মাধবও ঠিক তাহার বাপের মত বসিয়া আছে। সেও কাঁদিতেছে, কিন্তু তাহার বাবার মত নীরবে নয়, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছে। ওদিকে থানায় গণ্ডার ছাড়িকে ধরিয়া আনিল। সোনা রূপার ঢাকাই কারিগরকে কাল সন্ধ্যায় আনিয়াছে—আজ এখনও ছাড়ে নাই। পানু হাঁপাইয়া উঠিল। এই অবস্থার মধ্যে স্কুলে যাওয়া হয় নাই—অকস্মাৎ অসময়ে সে বই লইয়া স্কুলে চলিয়া গেল। কিন্তু সেখানে অবস্থা হইল আরও অসহ্য।

সহপাঠীরা প্রশ্নে ব্যঙ্গে শ্লেষে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল।

—কিসে ক'রে খুন করলে? ছুরী দিয়ে না ক্ষুর দিয়ে?

—তুই জেগে ছিলি পানু?

—হ্যাঁরে পেনো, তোর বাবা দালানবাড়ী করবে কবে রে?

পানু পাগলের মত ছেলেটার ঘাড়ের উপর লাফ দিয়া পড়িল। ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল ক্লাসেই; ওদিকে মাষ্টার পড়াইতেছিলেন, এদিকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত মৃদুস্বরে এই আলোচনা চলিতেছিল। অকস্মাৎ পানুর এই উন্মত্ত

আক্রমণ দেখিয়া মাষ্টার ছুটিয়া আসিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দিলেন। মার খাইয়াছিল আক্রান্ত ছেলেটাই, কিন্তু আঁ আঁ করিয়া কাঁদিতেছিল পানু। বিচার করিবার প্রয়োজন ছিল না, বিচারক স্বচক্ষেই সমস্ত দেখিয়াছেন, তিনি পানুর পিঠেই কয়েক ঘা বেত বসাইয়া দাঁড় করাইয়া দিলেন। পানু উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিল না—ছুটিয়া স্কুল হইতে বাহির হইয়া পলাইয়া আসিল। বাকী দিনটা মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সন্ধ্যায় যখন সে বাড়ী ফিরিল তখন তাহাদের দুয়ারে কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে। শ্যামাদাসের আবার তলব পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পর ডাক পড়িল বড় ভাই জীবনের। তারপর তাহার মা। মায়ের পর পানুর বড়দিদি চারু। সব শেষে—সে।

শ্যামাদাস একটা থামের সঙ্গে আবদ্ধ। বড়ভাই জীবনও তাই। তাহার মা জমাদারের পা ধরিয়া কাঁদিতেছে। দিদি চারু নাই, দারোগাবাবু তাহাকে ঘরের মধ্যে প্রশ্ন করিতেছে। দরজা বন্ধ। পানু ভয়বিস্ফারিত চোখে সকলের দিকে চাহিয়া রহিল।

জমাদার শ্যামাদাসকে প্রশ্ন করিল, কবুল করবি কি, না ?

ঠিক এই সময়ে ফিরিয়া আসিল পানুর বড়দিদি চারু। চারুর অবস্থা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মা মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চারু সুন্দরী মেয়ে ; গোলাপ ফুলের মত তাহার গায়ের রঙ। এক পিঠ ঘন কালো চুল ; দেহভঙ্গিমা সরল দীঘল। চারুর রূপ একবর্ণ অতিরঞ্জন নয়, শ্যামাদাস ও তাহার স্ত্রী কন্যাকে দুর্লভ সম্পদের মত ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত। চারু টলিতে টলিতে আসিয়া মায়ের কোলের কাছে অবশ দেহে লুটাইয়া পড়িল ; মা মেয়েকে বুকে টানিয়া লইল। এতক্ষণে চারুর দুই চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে আরম্ভ করিল। পানুর মনে হইল—চারুকে বোধ হয় পায়ে দড়ি বাঁধিয়া হেঁট মুখে এতক্ষণ ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। শরীরের সমস্ত রক্ত তাহার মুখে আসিয়া জমিয়াছে, চোখ

দুইটাও গাঢ় লাল—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, কাপড়চোপড় বিশৃঙ্খল—মাথার চুল বিপর্য্যস্ত, মুখে চোখে চারিপাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পানুর ইচ্ছা হইল, দারোগা জমাদারের পায়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে—ও গো, দারোগাবাবু—জমাদার বাবু—পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও গো। ঈশ্বরের দিব্যি ক'রে বলছি—আমরা কেউ কিছু জানি না। ভগবানের দিব্যি।

সে চাকুর মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল। অকস্মাৎ একটা ভীষণ চীৎকারে সে চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, থামে আবদ্ধ তাহার বাপ শ্যামাদাস পশুর মত ওই চীৎকার করিয়া থামের গায়ে মাথা ঠুকিবার চেষ্টা করিতেছে। অদ্ভুত তাহার চোখের দৃষ্টি; গোটা চোখ দুইটাই যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিবে। জমাদার নীরবে হাতের বেতখানা শ্যামাদাসের পিঠের উপর চালাইতেছে। আঘাতের পর আঘাত।

কেমন করিয়া কি হইয়া গেল। বিড়ালকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া আক্রমণ করিলে একমুহূর্ত্তে যেমন তাহার চেহারা পাল্টাইয়া যায় তেমনি ভাবেই মুহূর্ত্তে পানুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। কালো ছোট নিরীহ পানু কালো বিড়ালের মতই একটা চীৎকার করিয়া জমাদারের ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। জমাদারের কাঁধে গেঞ্জির উপরেই দুরন্ত শক্তিতে কামড় বসাইয়া দিয়া প্রায় ঝুলিতে আরম্ভ করিল। ছাড়াইয়া দিল একজন কনেষ্টবল। তাহারই প্রতিফলে পানুর পিঠে ওই দাগগুলার সৃষ্টি হইয়াছে। জমাদারের হাতের বেত দিয়া আঁকা। সেদিন দাগগুলার রঙ কালো ছিল না, সেদিন ছিল গাঢ় রাঙা। দারোগা মীর সাহেব, জমাদার ধর্ম্মদাস ঘোষের নাকি পরে পদাবনতি ঘটিয়াছিল, নানা কারণের মধ্যে এই নির্য্যাতনও একটা কারণ, কিন্তু তাহাতে পানুর কি? পিঠে হাত দিলেই পানুর সব কথা মনে পড়িয়া যায়।

পরের দিনই পানু বাড়ী হইতে পালাইয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই বিপুল তাহার দৈহিক শক্তি। রূপ ও বুদ্ধি হইতে বঞ্চনার এটা পরিপূরক কিনা কে জানে! এই কঠোর প্রহারেও পানু অজ্ঞান হয় নাই। কিন্তু থানার সম্মুখে বাড়ীতে কোনমতে সে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। পিঠে তেলের প্রলেপ দিয়া একটা মাদুরের উপর বালিশে বুক দিয়া উপুড় হইয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল; সম্মুখে থানার প্রাঙ্গণে কনেষ্টবল চৌকীদার গিস গিস করিতেছিল; ভিতর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল মানুষের চীৎকার।

মাধব ময়রা—নাকুদত্তের ওপাশের প্রতিবেশী।

গণ্ডার হাতি—প্রকাণ্ড দেহ এবং প্রচণ্ড বলশালী বলিয়া লোকে তাহাকে গণ্ডার বলে।

ঢাকার সেকরা—ঢাকা হইতে এখানে সোনা-রূপার ব্যবসা করিতে আসিয়াছে।

হাতেম মিঞা দর্জ্জি—পানুদের দোকানের পরেই তাহার দোকান।

কেবল নাকি মধু সিংকে একবার ডাকিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকটা কবুল খাইয়াছে। বলিয়াছে, সে পা ধরিয়াছিল, নাকু দত্তের গলা কাটিয়াছিল দারোগা মীর সাহেব। অকাতরে নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও সে দ্বিরুক্তি করে নাই। যুক্তিও সে দিয়াছে, নাকু দত্তের বাড়ীর সামনে থানা, সেখানে দারোগা জমাদার মোতায়েন, অন্য কার ঘাড়ে দশটা মাথা যে আপনারা থাকতে এ কাজ ক'রে যাবে!

অন্ধকার রাত্রে পানু ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল, ওই মধুর কথাই পুলিশ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইতে।

দুই

গভীর রাত্রে আক্রোশের তাড়নায় প্রায় দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্যের মত সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। থানায় তখন চীৎকার করিতেছিল

গণ্ডার হাড়ি। চারিটা পায়ে দড়ি বাঁধিয়া হাড়িকাঠে ফেলিবার সময় মহিষে যেমন চীৎকার করে তেমনি চীৎকার। পান্নু নিঃশব্দে উঠিয়া বাড়ীর খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার বাবা-মা, দিদি চারু, দাদা সকলেরই তখন সবে ঘুম আসিয়াছে। গত রাত্রের নির্য্যাতনের পর আজ সন্ধ্যায় যখন অপর ব্যক্তির চীৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তখনই তাহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। পান্নুর কিন্তু ঘুম আসে নাই; অবসর পাইয়া সে বাহির হইয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া গ্রাম অতিক্রম করিয়া পাকা শড়কে আসিয়া উঠিল। সদর শহরে যাইবে সে। পুলিশ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়া মধু বেণের কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। নিজের পিঠের ওই বেতের দাগগুলা দেখাইবে। সে শুনিয়াছে, সাহেবেরা অন্যায় কখনও করে না। দারোগার অন্যায় জানিতে পারিলে সাহেব একেবারে ক্ষেপিয়া যায়। এখান্‌কারই কুমী কলুনী হেম দারোগার অন্যায় সাহেবকে জানাইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে হেম দারোগাকে জমাদারীতে নামাইয়া দিয়া সাহেব তাহাকে অন্য থানায় বদলী করিয়া দিয়াছিল। চণ্ডী দারোগা ঘুষ লইয়াছিল, সাহেব তাহার চাকরীর মাথা খাইয়া দিয়াছে। বাবুরা হালে 'বন্দেমাতরম্' 'বন্দেমাতরম্' করিয়া যতই সাহেবদের বিরুদ্ধে চীৎকার করুক, তবুও পুলিশ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপর পান্নুর অগাধ বিশ্বাস। এইবারই স্কুলে প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের সময় হাতজোড় করিয়া কবিতা বলিয়াছে—

"সকলে দাঁড়াই এস সারি সারি হয়ে,
ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন অদ্য বিদ্যালয়ে।"

পণ্ডিত মহাশয় বলেন—রাজপ্রতিনিধি। রাজা দেবতা; সেই দেবতার প্রতিনিধি।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; সুদীর্ঘ পথ। তাহাদের গ্রাম হইতে সদর শহর বিশ মাইল দূর। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের পাকা শড়কটা জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়া

গিয়াছে, বিশ মাইলের মধ্যে গ্রাম পাওয়া যায় মাত্র দুখানি। প্রচণ্ড আবেগোচ্ছ্বসিত আক্রোশের বশে সে রওনা হইয়া গেল। মনের মধ্যে এমন তন্ময় হইয়া সে সাহেবদের সঙ্গে ভাবী সাক্ষাৎকারের কল্পনায় বিভোর ছিল যে, সুন্দীপুরের জঙ্গলের সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার পথের কথা একবারও মনে হয় নাই। জঙ্গলটার মধ্য দিয়াই শড়কটা চলিয়া গিয়াছে। এই ভয়াবহ স্থানটার সম্মুখে আসিয়াই সে অকস্মাৎ সচেতন হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তে মনের অন্তস্তলের ঘুমন্ত ভয় সুন্দীপুরের বটগাছ ও জঙ্গলের যত ভয়াবহ ইতিহাস লইয়া জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সুন্দীপুরের বটতলায় ঠ্যাঙাড়েরা লুকাইয়া থাকিত। রাত্রে পথিক একা হইলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না। ঠ্যাঙাড়েরা এখন লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ভয় এখনও যায় নাই। লোকে বলে ঠ্যাঙাড়েরা এখন প্রেত হইয়া গভীর রাত্রে ওই বটতলায় আড্ডা জমায়, গাছের ডালে লম্বা পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে, অট্টহাসি হাসে। আর যে হতভাগ্যেরা একদা ঠ্যাঙাড়ের হাতে মরিয়াছে, তাহারা মাটিতে লুটাইয়া অতি করুণ আর্ত্তনাদে কাঁদে।

শুধু তাই নয়, আরও আছে। ক্রোশ-ব্যাপী প্রান্তরের বুকে ঘন জঙ্গলের প্রায় মাঝখানটিতে ওই যে বটগাছটি, যে-বটের নামেই এ স্থানটা পরিচিত—ওই বিরাট গাছটার এখন অসংখ্য কাণ্ড। কতদিনের পুরানো গাছ কেহ জানে না, তাহার মূল কাণ্ডটাও এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, পুরানো আমলের ঝুরিগুলাই এখন কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। দিনের বেলায় গাছটার ঘনছায়াচ্ছন্ন তলদেশে দাঁড়াইলে মনে হয় এ-যেন কোন খেয়ালী শিল্পীর গড়া এক বিচিত্র স্তম্ভ-ভবন। মধ্যে মধ্যে গভীর রাত্রে ওই গাছতলা হইতে 'এক-শেয়ালী' ডাক শোনা যায়। একটিমাত্র শেয়ালের অস্বাভাবিক উচ্চ এবং অসাময়িক প্রহর-ঘোষণার শব্দ। শেয়ালের ডাক নয়, ডাকাতদের সঙ্কেত। হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়া শেয়ালের ডাকের অনুকৃতি অসময়ে প্রহর-ঘোষণা করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; অন্য কোন শেয়াল সে ডাক শুনিয়া ডাকিয়া

উঠে না। আশপাশের গ্রামগুলিতে নিরীহ গৃহস্থ নরনারী সভয়ে শিহরিয়া উঠে। পরদিন শোনা যায় কোথাও ডাকাতি হইয়াছে। রাখাল ছেলেরা দিনের বেলায় বটগাছতলায় দেখিতে পায় পোড়া মশালের ছাই, কাঠকুটার আগুনের আঙার, পোড়া বিড়ির টুকরা, কখনও কখনও দুই একখানা এঁটো পাতা ; বর্ষাবাদলে মাটি নরম থাকিলে অস্পষ্ট-স্পষ্ট কতকগুলা পায়ের দাগ। চকিতের মধ্যে বিদ্যুদালোকিত মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত সুবিস্তৃত ভয়ঙ্কর ইতিহাসের স্মৃতি পানুর জাগ্রত-চেতনায় ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা গুর-গুর করিয়া উঠিল। ভয়ের স্মৃতিই যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল। পানু থমকিয়া দাঁড়াইল। পা দুইটা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল।

সে ফিরিয়া যাইবে? কিন্তু তাহার দুরন্ত আক্রোশ মনের মধ্যে পাক খাইয়া উঠিল ক্রুদ্ধ অজগরের মত। ভয় এবং আক্রোশের দ্বন্দ্বের মধ্যে সে পঙ্গুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের চোখের সম্মুখে পাশাপাশি ভাসিতে লাগিল ভয়ঙ্কর এক প্রেতের মুখ এবং প্রহার-জর্জ্জরিত তাহার বাপের সেই অব্যক্তযন্ত্রণা-কাতর মুখচ্ছবি ; বটতলার অন্ধকারে প্রতীক্ষমাণ ডাকাতের হিংস্র জ্বলন্ত দুইটা চোখ এবং দিদি চারুর জলভরা ডাগর দুটি চোখ ; এক কানে বাজিতেছিল ঠ্যাঙাড়ের হাতে অপঘাতে মৃত্যুকবলিত আত্মার করুণ ক্রন্দন, অপর কানে বাজিতেছিল তাহার মায়ের কান্নার সুর ; ঠ্যাঙাড়েদের প্রেতাত্মার অট্টহাসি এবং গণ্ডার হাড়ির সেই মহিষের মত আর্ত্তনাদ। স্তব্ধ জঙ্গলটাকে সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতে ভাবিতে সে যেন পাগল হইয়া উঠিল। জঙ্গলটার স্তব্ধতার মধ্যে তাহার সাহস বাড়িয়া উঠিতেছিল বর্ষাসিক্ত বীজের অঙ্কুরের মত। সে পা বাড়াইল কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিদারুণ ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। লঘু দ্রুত পদক্ষেপে পাশ দিয়া চলিয়া গেল কে? না, কেহ নয়, প্রেত নয়, ডাকাত নয়, একটা শেয়াল। তাহার চীৎকারে ভয় পাইয়া শেয়ালটা ছুটিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। পানু

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শেয়ালটার দিকে চাহিয়া রহিল। কিছু দূর গিয়া শেয়ালটা দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া বোধ হয় পানুকেই ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর ধীর পদক্ষেপে আবার অগ্রসর হইল সম্মুখের পথে ওই ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া। পানু যেন বাঁচিয়া গেল, শেয়ালটার মধ্যেই সে খুঁজিয়া পাইল দোসর,—সঙ্গে সঙ্গে ওই জঙ্গলের ভিতর দিয়া সেও আগাইয়া চলিল।

জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার প্রগাঢ়তর, যেন অখণ্ড; মনে হয় যেন হারাইয়া গিয়াছি। তবু কিছুখানি পথ চলিয়াই পানু অনুভব করিল, অন্ধকার তাহার সাহসের কাছে হার মানিয়াছে; সে যেন স্পষ্ট দেখিল, অন্ধকারের অন্তরের সকল ভয়ঙ্কর স্তব্ধ হইয়া তাহাকে পথ দিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে। সে যেমনি আগাইয়া চলিয়াছে তেমনি তাহার পাশের জঙ্গলের পতঙ্গ-কীটের ডাক বন্ধ হইয়া যাইতেছে; পাতার উপর দিয়া খর খর শব্দে বোধহয় সাপ চলিতেছিল, পানুর পায়ের শব্দে সে শব্দ বন্ধ হইল; খ্যাক-খ্যাক শব্দে শেয়ালেরা ঝগড়া করিতেছিল, মুহূর্ত্তে ঝগড়া বন্ধ হইয়া গেল, নিঃশব্দে তাহারা ছুটিয়া পলাইল; প্রেতাত্মার করুণ কান্না, নিষ্ঠুর অট্টহাসি, রহস্যময় সঞ্চরণের কানাকানি সব স্তব্ধ, কোথাও কিছু নাই। ক্রমশ নির্ভয় পদক্ষেপে বটগাছটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। স্থির দৃষ্টিতে বটগাছটার দিকে চাহিয়া স্তম্ভকাণ্ডময় তলদেশ হইতে নিবিড় পুঞ্জিত অন্ধকারের মত উপরের ঘনপল্লব আচ্ছাদনীর সমস্তটা দেখিয়া লইল। কেহ কোথাও নাই, কোথাও কিছু নাই। সব তাহার ভয়ে লুকাইয়াছে। পানু হা-হা করিয়া উচ্চ হাসিতে স্তব্ধ অন্ধকারটাকে সচকিত করিয়া তুলিল। ভয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারানোর আবিষ্কারে নয়, ভয়কে জয় করার উন্মাদনায় সে সেদিন অট্টহাসি হাসিয়াছিল। ভয়ের কথা হইলে সেই অট্টহাসি সে আজও হাসে। জীবনে অভয় সে পায় নাই, কিন্তু সেইদিন হইতে সে নির্ভয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দর্পিত পদক্ষেপে সে অতিক্রম করিতে পারে, অন্তত তাহার নিজের

এই বিশ্বাস। সে অট্টহাসিতে তাহার নিজেরই সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিয়াছিল।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ পানু আসিয়া পৌঁছিল সদর শহরে। তখন তাহার মূর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছে অদ্ভুত। লাল ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, কাপড় লাল, জামা, বুক, পিঠ, মুখ ধূলা ও ঘামের সংমিশ্রণে লাল কাদার দাগে বিচিত্রিত, ভুরু ও মাথার চুল লাল ধূলায় পিঙ্গল; দীর্ঘ-পথ-হাঁটার পরিশ্রমে, রাত্রি জাগরণের অবসাদে চোখের ক্ষেত রাঙা, দৃষ্টি রুক্ষ; আক্রোশ ক্রোধ ভয় হতাশার দ্বন্দ্বে মনের যন্ত্রণার অভিব্যক্তির ছাপে তাহার কালো গোল শ্রীহীন মুখখানা বিকৃত হইয়া এমন কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে যে, দেখিয়া মানুষের মন মুহূর্ত্তে বিরূপ হইয়া উঠে। পানু কিন্তু আপনার এ অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে হতচেতন, এসব কথা পানুর ভাবিবার অবসর পর্য্যন্ত নাই। পথের পাশে পুকুর অনেক পড়িয়া আছে কিন্তু সে সব পানুর চোখে পড়ে নাই; তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল পাকা শড়কটার দূরবর্ত্তী মধ্যস্থলে, যেখানে পথটির পার্শ্ববর্ত্তী দুইটি সমান্তরাল রেখা একটি বিন্দুতে মিশিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, সেইখানে।

শহরে ঢুকিতেই শহরতলীর সামান্য একটু বাজার, তারপর রেল লাইন; রেললাইন পার হইয়া সাহেবদের গোরস্থান; গোরস্থানের পরই বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে কতকগুলা লম্বা একতলা বাড়ী। পানু এতক্ষণে চমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে প্রশ্ন জাগিল কোথায় পুলিশ সাহেব থাকে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিই বা কোথায়? তাহার কানে আসিল কাহারও জোর উচ্চ আদেশধ্বনি। আবার তাহার মন ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অন্ধকার, ভূত-প্রেত, জানোয়ার, সরীসৃপ এদের ভয়কে সে জয় করিয়াছে, কিন্তু মানুষের ভয় একতিল কমে নাই। পরক্ষণেই তালে তালে একটা কঠোর উচ্চ শব্দ ধ্বনিত হইতে আরম্ভ করিল—মনে হইল কোন একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত মানুষ অথবা দৈত্য জোরে জোরে পা ফেলিয়া আশে-পাশে কোথাও আসিতেছে।

আরও কিছুক্ষণ পর পানুর নজরে পড়িল একটা লম্বা দালানের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে সারিবদ্ধ সিপাহীর দল। হ্যাঁ, সিপাহী। পরনে হাফপ্যাণ্ট, গায়ে হাতকাটা কামিজ, মাথায় পাগড়ী, পায়ে পটি জুতা, কাঁধে বন্দুক, সারি বাঁধিয়া তালে তালে সকলে একসঙ্গে পা ফেলিয়া চলিয়া আসিতেছে। মুহূর্ত্তে পানুর বুকের ভিতরটা প্রচণ্ডতম ভয়ে অধীর অস্থির হইয়া উঠিল। জমাদারের সগোত্র—ইহারা সকলেই যেন জমাদার। মুখে চোখে পদক্ষেপে তেমনি কর্কশতা তেমনি রূঢ়তা তেমনি হিংস্রতা। অন্ধকারের বুকের মধ্যে পানুর সম্মুখে যে মুখ লুকাইয়াছিল সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিমন্ত হইয়া অকস্মাৎ উন্মুক্ত দিবালোকে কঠোর দীর্ঘ পদক্ষেপে তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে বলিয়া পানুর মনে হইল। পর মুহূর্ত্তেই সে ছুটিতে আরম্ভ করিল। পথ ধরিয়া নয়, মাঠের মধ্য দিয়া।

খানিকটা মাঠ পার হইয়া আসিয়া একটা প্রান্তরের মধ্যে কতকগুলি বাড়ী পাইয়া পানু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বেশ নূতন ঝকমকে কতকগুলি বাড়ী, কতক সম্পূর্ণ, কতক সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, কতক তৈয়ারী হইতেছে। শহরের প্রান্তে নূতন শহরবাসীদের একটি পাড়া গড়িয়া উঠিতেছে। একটা সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়া বাড়ীর দাওয়ায় সে বসিয়া পড়িল। মনে মনে সে নিষ্ঠুর আক্রোশে ওই সিপাহীর দলকে গাল দিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনের অবস্থা একরাত্রেই অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে। ভয়কে গত-রাত্রে সে জয় করিয়াছিল—মনে হইয়াছিল,—কিন্তু ভয় তাহার যায় নাই; কিন্তু ভয়ের কারণে আপনাকে একান্ত অসহায় ভাবিয়া অভিমানাহত প্রার্থনার সুরে আগে সে যেমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ভাঙিয়া পড়িত, তেমন ভাবে কান্নাও আসে না, ভাঙিয়াও পড়ে না। সিপাহীগুলা যদি তাহাকে ধরিয়াও ফেলিত তবুও সে কাঁদিত না, তাহাদের পায়ে ধরিত না ইহা নিশ্চিত। সমস্ত রাত্রি খায় নাই পানু, পেটটা তাহার জ্বলিয়া যাইতেছিল। এমন সুন্দর ঝকঝকে বাড়ী,

ইহারা চারিটি খাইতে দিবে না? সে প্রায় মরীয়া হইয়াই ডাকিল—বাবু! বাবু! বাবু!

কেহ সাড়া দিল না। আবার সে ডাকিল—মা! মা! মা-ঠাকরুণ! তবুও কেহ সাড়া দিল না। এবার সে দুয়ারে ধাক্কা দিয়া ডাকিল—বাবু! বাবু! মা-ঠাকরুণ!

—কে? এবার ভিতর হইতে সাড়া আসিল।

—কাল থেকে কিছু খাই নাই বাবু! দয়া ক'রে দুটি···

দরজা খুলিয়া এবার বাহির হইয়া আসিলেন এক ভদ্রলোক। পানুর আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—বাড়ী কোথা তোর?

—আজ্ঞে রত্নপুর।

—রত্নপুর? থানা রত্নপুর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

—কাদের ছেলে তুই? কি জাত?

—আজ্ঞে গন্ধবণিক।

—গন্ধবণিক? বেণে? কি নাম তোর?

—আমার নাম প্রাণকৃষ্ণ দে। কাল থেকে খাই না বাবু, আমাকে চারটি খেতে দেন!

—হুঁ। ভদ্রলোক খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—চাকরী করবি?

চাকরী? কথাটা পানুর কাছে এমন আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত যে, সে অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোক আবার বলিলেন—

কি, চাকরীর নামেই চুপ করলি যে? ভিক্ষে বড় মজার জিনিষ—না? হরি বল্লেই কাঁড়া বালাম চাল মেলে যখন, তখন চাকরী কে করে? এ্যাঁ? এদিকে গতর তো বেশ! ভাগ্! বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

পানু তাড়াতাড়ি ডাকিল—বাবু!

—কি ?

—আমি চাকরী করব। আমাকে চারটি খেতে দেন!

—খেতে পাবি, মাইনে দেড় টাকা, বছরে দুজোড়া কাপড়।

পানু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল—তাহাতেই সে রাজী।

—আয় তবে ভেতরে আয়। ঘরদোর পরিষ্কার করতে হবে, কাপড় কাচতে হবে, কূয়ো থেকে জল তুলতে হবে।

—আজ্ঞে করব।

—ওগো, ছোঁড়াটাকে চারটি মুড়ি দাও তো।

এবার গৃহিণী বাহির হইয়া আসিলেন। পানুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—এ তো ভিখেরীর ছেলে নয়।

—না হোক—ক্ষেতি কি ? চাকরী করবে মাইনে নেবে, ব্যাস।

হাসিয়া সস্নেহেই গৃহিণী বলিলেন—তোমার বাপ-মা আছে তো খোকা ?

পানুর বুকের মধ্যে এতক্ষণে একটা উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল, সে কথা বলিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—আছে।

—বাড়ী থেকে রাগ ক'রে পালিয়ে এসেছ ?

ঘাড় নাড়িয়া পানু জবাব দিল—না, রাগ করিয়া আসে নাই।

—তবে ?

কর্ত্তা মারাত্মক রকম চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—চুলোয় যাকগে তবে। দাও, দুটো মুড়ি দাও ছোঁড়াকে। মুড়ি খেয়ে, এই ছোঁড়া, মুড়ি খেয়ে কূয়ো থেকে জল তুলে এই গাছগুলোর গোড়ায় দে। বুঝলি ?

পানু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাই দিবে সে।

একখানা শালপাতায় কতকগুলি মুড়ি ও একটু গুড় দিয়া গৃহিণী বলিলেন—ওই চৌবাচ্চার জলে হাত-পাটা ধুয়ে ফেল্ বাছা। নোংরা জামাটা খুলে রাখ, কেচে ফেলবি আজ।

সম্মুখে আহার্য্য পাইয়া পানুর আর কোন কিছুই মনে হইল না। আহার্য্য ও তাহার মধ্যে যেটুকু আদেশের বাধা ছিল, সেটুকু তৎক্ষণাৎ পালন করিয়া সে মুড়ির পাতাটার সম্মুখে ক্ষুধার্ত্ত জানোয়ারের মত বসিয়া পড়িল, আদেশমত হাতমুখ ধুইয়া, জামাটা খুলিয়া সে খাইতে বসিয়া গেল।

গিন্নী শিহরিয়া আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করিলেন—আহা বাছারে! হ্যারে তোকে এমন ক'রে কে মেরেছে রে?

পুলিশের বেতের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত পিঠটার কথা পানুর মনে ছিল না, এমন কি জামা খুলিবার সময়ও যে বেদনা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল সে বেদনাও তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারে নাই। গিন্নীর কথার উত্তর দিবার তাহার সময় ছিল না; মুড়িতে জল দিয়া মুড়িগুলাকে নরম করিয়া লইয়া গুড় মাখিয়া সে গ্রাসের পর গ্রাস গিলিতে লাগিল।

গিন্নী আবার প্রশ্ন করিলেন—পানু?

কয়েক গ্রাস গিলিয়া খানিকটা জল খাইয়া পানু বলিল—আঃ!

—এমন ক'রে কে মেরেছে রে?

আর একটা বড় গ্রাস মুখে তুলিবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই পানু বলিল—পুলিশে! বলিয়া সে গ্রাসটা মুখে পুরিয়া ফেলিল।

তিন

(ক)

ভদ্রমহিলা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—পুলিশে?

বুভুক্ষু পানুর সমস্ত গ্রাসটা ভরিয়া ঘুরিতেছিল—মুড়ি গুড়ের দলা, কর্ত্রীর কণ্ঠস্বরের বিস্ময়ে তাহার চর্ব্বণ মুহূর্ত্তে বন্ধ হইয়া গেল। সে বুঝিল সে অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। আহার্য্যভরা মুখেই আতঙ্কিত দৃষ্টিতে পানু কর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—পুলিশে মেরেছে তোকে?

শঙ্কিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া পানু জানাইল—হ্যাঁ।

—কেন?

পানুর মুখ এবার দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল, বুভুক্ষু গরু যেমনভাবে অদূরবর্ত্তী মানুষের সাড়া পাইয়া ফস্‌স খাইয়া যায় তেমনি ভাবে সে গ্রাসটা গিলিয়া আবার একদলা ভিজা মুড়ি মুখে পুরিয়া দিল।

বাড়ীর কর্ত্রী আবার প্রশ্ন করিলেন—কারও বাড়ী কিছু চুরি করেছিলি বুঝি?

ঘাড় নাড়িয়া পানু জানাইল—না। এবং চোখ মুছিয়া সে গ্রাসটাও কোৎ করিয়া গিলিয়া ফেলিল।

—তবে? তবে তোকে মারলে কেন তারা?

ভিজা মুড়ি-গুড়ের বড় দলাটা কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া যাইতেছিল—নাটের মধ্য দিয়া কড়া বোল্টের মত, দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। পানু জলের ঘটিটা তুলিয়া খানিকটা জল মুখে ঢালিয়া দিয়া বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল।

কর্ত্রী এবার ডাকিলেন—ওগো, বলি শুনছ? কানের মাথা খেয়েছ না-কি?

কর্ত্তা আসিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—এমন ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন? বাইরে যে মক্কেল এসেছে। ভদ্রলোক মোক্তার।

—চেঁচাচ্ছি সাধে। ওই দেখ।

—কি?

—ছোঁড়ার পিঠে।

কর্ত্তাও শিহরিয়া উঠিলেন—আরে বাপরে! এ কি?

—পুলিশে মেরেছে ওকে।

—পুলিশে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—তা বলছে না। গোগ্রাসে শুধু গিলে যাচ্ছে।

—চোর নয় তো? এই ছোঁড়া! চুরি করেছিলি না কি?

—ঘাড় নাড়িয়া পানু উত্তর দিল—না। তখনও সে খাইয়া চলিয়াছে।

—তবে? এই ছোঁড়া! এই! উত্তর না পাইয়া এবার তিনি, বকরাক্ষস যেমন ক্রোধভরে আহাররত ভীমকে চাপিয়া ধরিয়াছিল, তেমনি ভাবেই পানুর হাত চাপিয়া ধরিলেন—এই ছোঁড়া!

কর্ত্তা যখন এইভাবে পানুকে নির্য্যাতন করিতে উদ্যত হইলেন—তখন কর্ত্রী প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন—ওকি? তুমি মানুষ না অসুর? খেতেই দাও আগে!

কর্ত্তা কঠিন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি বললে? আমি অসুর?

—খাচ্ছে বেচারা, খেতেই দাও আগে।

—তা' হ'লে তুমিও তো ওর খাবার পর চিলের মত চেঁচাতে পারতে। তুমি চেঁচালে কেন?

গৃহিণী এবার মোক্ষম উত্তর প্রয়োগ করিলেন—হাত জোড় করিয়া বলিলেন—ঘাট হয়েছে, আমার ঘাট হয়েছে। ঘাট মানছি আমি।

কর্ত্তা স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

গৃহিণী বলিলেন—পুলিশে ছেলেটাকে এমন ক'রে মেরেছে, দেখে আমি চীৎকার ক'রে তোমাকে ডেকেছি—আমার ঘাট হয়েছে।

কর্ত্তা বিপদাপন্ন হইয়া পড়িলেন। অকপট ভাবেই আপনার অসহায় অবস্থা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া ফেলিলেন—কি বিপদ!

গৃহিণী বলিলেন—তুমি মোক্তার। পুলিশে এমনি ক'রে দুধের ছেলেকে মেরেছে, তাই তোমাকে দেখাবার জন্যে চীৎকার ক'রে ডেকেছি, আমার ঘাট হয়েছে!

কর্ত্তা এবার বলিলেন—উঃ, ব্রুটাল এ্যাসাণ্ট! নে রে ছোঁড়া খেয়ে নে, তোকে আমি নিয়ে যাব ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে, এস-পির কাছে।

পানুর আর খাওয়া হইল না। সে দুই হাতে কর্ত্তার পায়ে ধরিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—আমাকে মেরেছে, আমার বাবাকে মেরেছে, আমার দিদিকে মেরেছে, আমার দাদাকে মেরেছে। বাবু!—সে তাহার অশ্রুসিক্ত কুৎসিৎ স্থূল মুখখানা উপরের দিকে তুলিয়া কর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—নে নে, আগে খেয়ে নে।

—আর খেতে পারব না আমি। পানু ফোঁপাইতে আরম্ভ করিল।

কর্ত্তা বলিলেন—না পারিস তো গরুর ডাবায় দিয়ে আয় যা।

গৃহিণী বলিলেন—গরুর ডাবায় দিয়ে আসবে? মুড়ি গুড় ভারী সস্তা, না? এই ছেলে, খেয়ে নে বলছি। নইলে ভাল হবে না। খেয়ে নে!

পানু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না, আর খেতে পারব না।

—খুব পারবি। পেটটা তোর এখনও ধক্-ধক্ করছে। খেয়ে নে। না যদি পারবি তো গোড়ায় দেবার সময় বললিনে কেন তুই? সহরের ধান-চাল ঘাসের বীজ নয়। খেয়ে নে বলছি।

কাঁদিতে-কাঁদিতেই পানুকে মুড়িগুলি শেষ করিতে হইল।

গৃহিণী বলিলেন—বল এইবার কি হয়েছে। কর্ত্তাকে বলিলেন—তুমি এইখানে বস। তা'হ'লে আমারও শোনা হবে। ওই মোড়াটা নাওনা টেনে।

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণীর চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

কর্ত্তা গম্ভীর চিন্তিত মুখে বাঁ হাতের মুঠায় দাড়িহীন চিবুকটা ধরিয়া রঙ্গমঞ্চের কুটিল বাদশাহের ভূমিকায় অভিনেতার মত মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিলেন—হুঁ! তারপর বলিলেন—তোকে আজই আমি নিয়ে যাব ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে।

গৃহিণী বলিলেন—হ্যাঁ গা! ওরা কি—

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কর্ত্তা বলিলেন—এঁ্যা?

—ওরা কি সত্যিই—? এই ছোঁড়া যা না, বাইরে গিয়ে বস্ না।

—বালতী নিয়ে গাছগুলোয় জল দিয়ে দে ততক্ষণে। আমি স্নান ক'রে নি।

পানু বাহিরে যাইতে যাইতে শুনিল—গৃহিণী বলিতেছেন—সত্যিই ওরা খুন করেছে না কি?

কর্ত্তা বলিলেন—সমস্ত আমি টেনে বের করব। তুমি দেখ না। কেসটা নিয়ে তুমুল কাণ্ড করব আমি। ছোঁড়াটার উপর নজর রেখো একটু, না পালায় যেন।

—না। ওরকম ছেলেকে আমি ঘরে ঠাঁই দেব না।

—কি বিপদ!

গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—না-না-না।

* * * *

(খ)

পানু ছুটিয়া আসিয়াছিল দুরন্ত ক্রোধে। মনে মনে সংকল্প করিয়াছিল—সাহেবের পায়ে সে আছাড় খাইয়া পড়িবে। ওই কর্ত্তাটির পায়েও সে সকাতর উচ্ছ্বাসে গড়াইয়া পড়িয়াছিল—হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়াছিল। কিন্তু সাহেবের সম্মুখে আসিয়া সে যেন পঙ্গু হইয়া গেল। উর্দ্দিপরা পিওন, প্রহরারত কনেষ্টবল, সাহেবের ঘরের অস্বাভাবিক স্তব্ধতা, তাঁহার গম্ভীর ভাবলেশহীন মুখ দেখিয়া একটা দুরন্ত ভয় তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার পা দুইটা ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মোক্তারবাবু তাহার ময়লা জামাটার প্রান্তদেশ টানিয়া তুলিয়া তাহার ক্ষতবিক্ষত পিঠটা দেখাইলেন। সাহেবের মুখে সহানুভূতির প্রকাশ প্রত্যাশা করিয়াই পানু তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু সাহেবের মুখ ভাবলেশহীন, কোন একটি নূতন রেখাও সেখানে ফুটিয়া উঠিল না। শুধু একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া খস্-খস্ করিয়া কি লিখিয়া

মোক্তারের হাতে দিলেন। সাহেব তদন্তের ভার দিলেন এস-ডি-ওর উপর, পুলিশ সাহেবকেও লিখিলেন বিভাগীয় তদন্তের জন্য। পুলিশ সাহেবের আপিসে আসিয়া পানুর ইচ্ছা হইল সে ছুটিয়া পলাইয়া যায়। খাকী পোষাক পরা কত দারোগা এখানে! বাহিরে বারাণ্ডায় কনেষ্টবল গিস্‌-গিস্‌ করিতেছে! যে দুরন্ত ভয় সে তাহাদের থানা হইতে সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে, যাহার প্রতিক্রিয়ায় উন্মুক্ত প্রান্তরে তাহার ক্রোধের আর সীমা ছিল না, যাহার আবেগে সে এতটা দীর্ঘপথ রাত্রির অন্ধকারে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, সেই ভয় যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়া তাহার বুকের উপর পাহাড়ের মত চাপিয়া বসিল। ব্যাপারটা শুনিয়া ইন্সপেক্টার এবং সাব-ইন্সপেক্টারের দল তাহার দিকে একবার তীর্য্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। পানুর মনে হইল— উহাদের ওই তীর্য্যক দৃষ্টির মধ্যে কঠিন আক্রোশ লুকানো রহিয়াছে।

পুলিশ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নোট পড়িয়া—মোক্তার বাবুকে কি ইঙ্গিত করিলেন। মোক্তার আবার তাহার জামাটা টানিয়া তুলিয়া—প্রহারের চিহ্নগুলি দেখাইলেন। সাহেব প্রশ্ন করিলেন—কে মেরেছে? সাহেব বাঙালী।

পানু হাঁ করিয়া মুখে নিশ্বাস লইতেছিল, নাক দিয়া নিশ্বাস লইয়া সে যেন কুলাইতে পারিতেছিল না। কোন উত্তর সে দিতে পারিল না, ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মোক্তার বাবু বলিলেন—কে মেরেছে বল্‌?

সাহেব বলিলেন—ভয় নেই; বল তুমি, বল।

শুষ্ককণ্ঠে পানু বলিল—জল!

সাহেব পিওনকে বলিলেন—পানি দো। পানি।

এক নিশ্বাসে একগ্লাস জল খাইয়া পানু বলিল—জমাদার বাবু।

সাহেব সমস্ত শুনিয়া পানুকে সঁপিয়া দিলেন—একজন ইন্সপেক্টারের হাতে। হুকুম দিলেন, একজন কনেষ্টবল সঙ্গে দিয়া উহাকে তাহাদের থানার

ইন্সপেক্টারের কাছে পৌঁছাইয়া দাও ; ইন্সপেক্টারকে নোট দিলেন—অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত কর।

মোক্তার চেষ্টা করিলেন পানুকে নিজের কাছে রাখিবার জন্য ; কিন্তু সাহেব বলিলেন—এর জন্যে আপনি জেদ করবেন না। ওকে মেরেছে এ তদন্তের চেয়ে জরুরী তদন্তে ওকে আমাদের দরকার আছে। খুনের তদন্তে ওকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলেই আমার মনে হয়।

পানুর মনে হইল—তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সাহেব তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন তাহাদেরই থানায় সেই দারোগার কাছে, সেই জমাদারের কাছে।

মাটির পৃথিবীর মোহাচ্ছন্ন মানুষ ; মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রেম, রাগ-রোষ, হিংসা-আক্রোশ তার হৃদয়গত সম্পত্তি ; মানুষের আক্রোশ মানুষ সহ্য করে, তার সঙ্গে মানুষ লড়াই করে, কখনও হারে কখনও জেতে ; মানুষের সে সহ্য হয়। কিন্তু পক্ষপাতশূন্য শাসন-কার্য্যের জন্য সূক্ষ্ম বিচারের জন্য মানুষ যখন শাসকের আসনে বসিয়া মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রেম, রাগ-রোষ, হিংসা-আক্রোশ সব ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ নির্বিকার হইয়া বসে—তখন সাধারণ মানুষ তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। ভগবানের মতই সে তাহাকে ভয় করে। তেমনি ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া পানু কনেষ্টবলের সঙ্গে চলিয়াছিল। ভগবানের বিচার, আপন কর্ম্মের প্রতিফলও যেমন মানুষের অসহ্য হইয়া উঠে, মধ্যে মধ্যে তেমনিভাবেই অবস্থাটা তাহার অসহ্য বলিয়া মনে হইতেছিল। অদৃষ্টের কঠিন নির্য্যাতনে বিদ্রোহী হইয়া মানুষ যেমন মধ্যে মধ্যে আত্মহত্যা করিয়া বসে—তেমনি ভাবেই তাহারও মনে হইতেছিল--ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ে।

কনেষ্টবলটির কাজটা মোটের উপর কঠিন কাজ ছিল না। এক ফোঁটা ছেলেকে ট্রেণে চড়াইয়া সদর শহর হইতে সার্কেল ইন্সপেক্টারের আপিস মফস্বলের একটা শহরে পৌঁছাইয়া দেওয়া। সে খইনী টিপিতে টিপিতে গান ধরিয়াছিল। গরমের দিনে সন্ধ্যার পর ট্রেণে বেশ আরামই বোধ হইতেছিল।

মধ্যে মধ্যে সে পুলিশোচিত তদন্ত-কৌশলের পরিচয়ও দিতেছিল—পান্নুর সঙ্গে মিষ্ট কথায় আলাপ জমাইয়া খুনের সত্যসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিল।

—আরে, বোল না রে! এই! এই ছোকরা!

—এ্যাঁ!

—বোল্না! তোহার বাপকে সরকারী সাক্ষী করিয়ে দিবে। কে—কে—খুন করলো—বোল না?

—আমি জানি না। সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—জানিস না তো কানছিস কাহে? এ্যাঁ? আরে? তোরা বাপকে সাজা হোবে বোলে কানছিস! সমঝিয়েছি আমি। জরুর জানিস তু।

পান্নু তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া চুপ করিল।

কনেষ্টবলটি কিছুক্ষণ পর আবার বলিল—আরে! আঁ! বোল না কি জানিস তু?

এবার সবিনয়ে ম্লান হাসি হাসিয়া পান্নু বলিল—আজ্ঞে না, আমি জানিনা।

কনেষ্টবলটিও হাসিয়া বলিল—জানিস তু! জরুর জানিস! তু হাসছিস!

পান্নুর এবার ইচ্ছা হইল—সে ওই কনেষ্টবলটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। কিন্তু জমাদারের কথা মনে করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

গাড়ীটা সেই মুহূর্ত্তেই আসিয়া থামিল একটা ষ্টেশনে। একটা রেলওয়ে জংসন। এইখানে গাড়ী বদল করিয়া অন্য গাড়ীতে চড়িতে হইবে। দেরী ছিল। কনেষ্টবল তাহাকে এক জায়গায় বসাইয়া একটা ঠোঙায় কিছু খাবার কিনিয়া দিল। সরকার হইতে এ জন্য পয়সা দেওয়া হইয়াছিল। নিজেও খাবার কিনিয়া খাইয়া আরাম করিয়া বসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল।

ছোট জংসন ষ্টেশন। রাত্রিকাল। প্লাটফর্ম্মে কয়েকটা আলো জ্বলিতেছে তবুও সমস্ত স্থানটা প্রায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গ্রীষ্মের দিন, যাত্রীর দল এখানে ওখানে আপন-আপন মোটের উপর ঠেস্ দিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। পান্নুরও

ঘুম পাইতেছিল, সেও ঢুলিতেছে। কনেষ্টবলটি তাহাকে বলিল—কি রে? ঘুমাইবি?

পান্নু বলিল—হ্যাঁ।

—আভি ট্রেণ আসবে, ঘুমাস না!

পান্নু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজাগ হইয়া বসিল।

—হাঁ রে, পান্নুয়া? একটা বাত সাচ বোল দেখি?

পান্নু তাহার মুখের দিকে চাহিল।

হাসিয়া কনেষ্টবল তাহার বুকের উপর হাত দিয়া বলিল—হ্যাঁ ঠিক জানিস তু। আরে বাপরে, কলিজার অন্দরে তোহার ট্রেণ চলছে রে! ঠিক জানিস তু।

পান্নুর আর সহ্য হইল না। মুহূর্ত্তে আত্মহত্যাকামী উন্মত্তের মতই স্থান কাল, তাহার নিজের শক্তি অক্ষমতা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল সম্মুখের দিকে।

—আরে—আরে! কনেষ্টবলটিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ছুটিল—আরে!

জ্ঞানশূন্য পান্নু ছুটিয়াছে। প্লাটফর্ম পার হইয়া রেল লাইন। অন্ধকারের মধ্যেও লাইন পার হইয়া সে ছুটিল। হঠাৎ একটা কিছুতে হুঁচোট খাইয়া রেল লাইনের মাটির বাঁধ ডিঙাইয়া পড়িল একটা মাটি-কাটা খাদের মধ্যে। সেইখানেই সে পড়িয়া রহিল চেতনাহীনের মত। কঠিন আঘাতে তাহার সমস্ত শরীর ঝিম-ঝিম করিতেছে। ষ্টেশনে সোরগোল শোনা যাইতেছে। কিন্তু উঠিবার এমন কি নড়িবার ইচ্ছা করিবার মত মনের সাড় তাহার হইল না।

(গ)

কতক্ষণ পর তাহার জানার কথা নয়। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে তখন কাস্তের মত এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছে। পান্নুর মনের সাড় ফিরিয়া আসিল। সমস্ত কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল। পায়ে বুড়া

আঙুলের ডগায় বিষম যন্ত্রণা। কিন্তু সে যন্ত্রণার কথা সে ভুলিয়া গেল। কান পাতিয়া সে মানুষের সাড়ার সন্ধান করিতেছিল। কিন্তু কোন সাড়াই নাই। চারিদিকে শুধু ঝি ঝি পোকার ডাক উঠিতেছে। এবার সে খাদটা হইতে অল্প মাথা তুলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল। ওই দূরে প্লাটফর্মটা। আলো সব নিভিয়া গিয়াছে। জাগ্রত মানুষের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। কেহ দাঁড়াইয়া নাই, কেহ বসিয়া নাই, কোন শব্দও আসিতেছে না। সে এবার চতুষ্পদের মত হামাগুড়ি দিয়া খাদ হইতে উঠিয়া আসিল। যথাসাধ্য লাইনটাকে পাশে আড়াল রাখিয়া সে সেই আহত পায়েই খোঁড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। দিক ঠিক নাই, কিছুদূর আসিয়া চোখে পড়িল একটা জঙ্গলের মত ঘন কালো কিছু, সে সেই দিকেই অগ্রসর হইল।

চার

(ক)

তারপর আর তাহার মনে নাই। কেমন করিয়া, কোন্ পথ দিয়া, কয়দিন বা কয়ঘণ্টা হাঁটিয়া সে কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছিল তাহার কোন স্মৃতিই তাহার মনের মধ্যে নাই, অত্যন্ত অস্পষ্টভাবেও কিছু মনে পড়ে না। বন্দুকের গুলিতে আহত পাখী যখন কিছুদূর উড়িয়া গিয়া লুটাইয়া পড়ে, তখন যেমন তাহার আপনার ভীষণতম অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা থাকে না—কোন্ দিক দিয়া কোন্ আশ্রয়ের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে, তাহারও কোন হিসাব থাকে না—থাকে শুধু ভয়ঙ্কর শব্দ ও নিষ্ঠুরতম আঘাত হইতে সঞ্জাত প্রচণ্ড ভয়াতুর জীবনের একমাত্র মৌলিক কামনা, বাঁচিবার উন্মত্ত আশায় পলায়নের চেষ্টা,—তেমনি একটা উন্মত্ত অচেতনতার মধ্যে সে পায়ের ওই কঠিন আঘাত লইয়া পলাইয়াছিল। তাহারই মধ্যে আসিয়াছিল জ্বর। সেই জ্বরে তাহার স্মৃতির সচেতনতা

বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তবুও ভয় যায় নাই। তাহাদের গ্রামের থানা হইতে এই ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রতিপদক্ষেপেই তাহার ভয় বাড়িয়া গিয়াছিল। কাঁদিলে পরিত্রাণ নাই, হাসিলে পরিত্রাণ নাই, না-হাসিয়া না-কাঁদিয়া সকরুণ ভাবে 'না' বলিলেও বিশ্বাস করে না; এই অবস্থায় সে জলে-ডোবা মানুষের মতই হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দেহের প্রতিটি দেহকোষের মধ্যে বিকাশ-কামনায় আনন্দশিহরণ-মুখর জীবনকণিকাগুলি পর্য্যন্ত দুরন্তভয়ে দ্রুততম আবেগে আবর্ত্তিত হইয়া তাহাকে ঐ অবস্থাতেও পলায়নের শক্তি জোগাইয়াছিল। অন্য কোন অধিকারই সে আর চায় নাই—বিচার পাইবার অধিকার না, মান মর্য্যাদার অধিকার না, প্রতিবাদের অধিকার না, কেবল চাহিয়াছিল বাঁচিবার অধিকার। যখন তাহার মনে হইল সে অধিকারও তাহাকে ইহারা দিবে না, তখনই সে ছুটিয়া পলাইয়া সেই অধিকার অর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিল আপন শেষ এবং সকল শক্তি প্রয়োগে। জ্বরটা তাহার আসিয়াছিল কতকটা শরীরের উপর অত্যাচার এবং আঘাত হেতু, কতকটা এই নিদারুণ উত্তেজনা হেতু। একদিন—সে দিন ঐ ঘটনা হইতে কতদিন পরে সে তাহা স্মরণ করিতে পারিল না—সে সজ্ঞান চৈতন্যে অনুভব করিল—চোখে দেখিল—একটা দুর্গন্ধময় কুঁড়ে-ঘরে সে শুইয়া আছে। ঘরটাকে ঘর বলিয়া চিনিলেও, সে ঘর কোথায়, সে ঘর কাহার, সেও সে বুঝিতে পারিল না। ঠিক এই সময়ে একজন প্রকাণ্ডদেহ লোক ঘরে ঢুকিল। লোকটি যেমন কালো, দেখিতেও তেমনি ভয়ঙ্কর। পানুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসিয়া ঢুকিল ওই পুরুষটারই অনুরূপ এক ভীষণদর্শনা মেয়ে। নাকে বড় বেসর, কানে সারি-সারি মাকড়ী, মাকড়ীগুলা এত ভারী যে কানের ছিদ্রগুলি নাসারন্ধ্রের ছিদ্রের চেয়েও বড় হইয়া গিয়াছে, গলায় হাঁসুলি, লাল পাথরের মালা, উল্কিতে চিত্র-বিচিত্র মুখ—দেখিয়া পানুর সন্তলব্ধ চেতনা আবার যেন অসাড় হইয়া পড়িল।

নিম্নতম স্তরের যাযাবর সম্প্রদায়। পানু তাহাদের গ্রামে এই শ্রেণীর যাযাবরদের দুই একবার দেখিয়াছে। পানুরা বলিত—'হা'ঘরে'।

যেটাকে পানু কুঁড়ে-ঘর ভাবিয়াছিল সেটা কুঁড়ে-ঘর নয়, কালো কাপড়ের তাঁবু। পানুকে তাহারা অজ্ঞান অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়াছিল। পথ-প্রান্তর, লোকালয়, অরণ্য সর্ব্বত্রচারী হা'ঘরের দল এক জায়গায় তাঁবু ফেলিয়াছিল—একটা রেল-ষ্টেশনের ধারে। সেই জংসন ষ্টেশনের পরের ষ্টেশনের কাছে। পুরুষের দল ভোরবেলায় শীকারে বাহির হইয়াছিল। সাপ, গোসাপ, ইঁদুর, কাঠবেড়ালী, শেয়াল, সজারু, খরগোস—যাহা পাওয়া যায় সন্ধান করিতে গিয়া ঐ পুরুষটি একটা জঙ্গলের মধ্যে পানুকে পাইয়াছে। 'ধান দিলে খই হইয়া যায়'—এমনি তখন তাহার গায়ের উত্তাপ। সম্পূর্ণরূপে অচেতন, কেবল পানুর চওড়া বুকটা উঠিতেছে নামিতেছে হাপরের মত, আর কণ্ঠনালী দিয়া বাহির হইতেছে যন্ত্রণাকাতর একটা অনুনাসিক শব্দ, জানোয়ারের মত একটা গোঙানী। ঐ পুরুষটি—বুধন—তাহাকে কুড়াইয়া আনে। বুধন ভূত প্রেত পিশাচ তাড়াইতে পারে, বহুবিধ গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিয়া রাখে, রোগের চিকিৎসা করে, মরা বাঁদরের, মানুষের, পেঁচার খুলি তাহার আছে; ধানস পাখীর তেল, কুমীরের দাঁত, বাঘের পাঁজরা লইয়া সে ঔষধ তৈয়ারী করে,—সে যাযাবর দলের মধ্যে গুণী লোক। পানুকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল, একটা ভীষণ শক্তিশালী জিন ছেলেটাকে তাড়া করিয়া আনিয়া এইখানে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। সে আপন গুণপনার প্রেরণাতেই ওই শক্তিশালী জিনটাকে পরাজিত করিবার কল্পনার উল্লাসেই তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া আসে।

আরও একটু গোপন গূঢ় কারণ ছিল। বুধন ছিল নিঃসন্তান। শিশু, বালকের উপর তাহার একটা গভীর মমতা ছিল। তাহাদের সম্প্রদায়ের ছেলে-পিলেদের সঙ্গে তাহার একটি ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ ছিল—কিন্তু গোপন সম্বন্ধ। কারণ তাহাদের সম্প্রদায়ের সকলে তাহাকে শুধু খাতিরই করিত না,

ভয়ও করিত। বুধন শুধু গুণী এবং চিকিৎসকই নয়, সে আরও ভয়ঙ্কর মানুষ —সে ডাইন। মানুষের রক্ত সে দৃষ্টি দিয়া শুষিয়া লইতে পারে, বিশেষ করিয়া শিশুর নধর কোমল দেহের উপর তাহার বড় লোভ। দুই-তিন বার সে পল্লীগ্রাম হইতে ছেলে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। একবার জেল খাটিতে হইয়াছে, বাকী কয়েকবার গ্রামের লোকে তাহাকে এমন প্রহার দিয়াছিল যে, তিন চারিদিন ধরিয়া তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। এই সব কারণে সম্প্রদায়ের লোকেরা আপন আপন শিশুদের যথাসম্ভব বুধনের নিকট হইতে আগলাইয়া রাখে। মৃতকল্প পানুকে জনহীন প্রান্তরের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বুধন তাহার দেহটাকে কাঁধে ফেলিয়া আপন তাঁবুতে আনিয়া তুলিয়াছিল।

তাহার স্ত্রী ভয়ে বিরক্তিতে হাউ-মাউ করিয়া উঠিয়াছিল। পানুকে শোয়াইয়া দিয়া বুধন দাঁতের উপর দাঁত ঘষিয়া বলিয়াছিল—দাঁতে কামড়ে তোর নলীটা কেটে ফেলব আমি।

সম্প্রদায়ের লোকেরাও আপত্তি তুলিয়াছিল।

বুধন প্রথমটায় বলিয়াছিল, গাঁইয়ারা তো ওকে মরবে বলে ফেলেই দিয়েছে। তাদের আবার দাবী কিসের? দারোগা যদিই আসে—তোমরা বলবে।

তবুও দুই-একজন আপত্তি করিয়াছিল—তোমার জন্যে এসব ফ্যাসাদ আমরা সইতে পারব না।

—চিল্লাও তো আমি 'বাণ' জুড়ব। অত্যন্ত সহজ স্বরেই বুধন কথা কয়টি বলিয়াছিল। 'বাণের' ভয়ে সমস্ত সম্প্রদায়টা চুপ করিয়া গিয়াছে।

(খ)

অজ্ঞান হইয়া পানু পড়িয়াছিল চল্লিশ দিন। যখন জ্ঞান হইল তখন তাহার সমস্ত দেহের মধ্যে এক বিন্দু শক্তি নাই। এই অপরিচিত ভয়ঙ্কর আবেষ্টনীর মধ্যে পঙ্গুর মতই সে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইল।

অসহনীয় উৎকট দুর্গন্ধ তাঁবুর মধ্যে।

সকালে পুরুষরা বাহির হইয়া যায়; ফিরিয়া আসে ধূলি-ধূসরিত রক্তাক্ত দেহে। কাঁধে বাঁকের দুইপাশে ঝুলাইয়া আনে অনেক বড় বড় দাঁড়াস সাপ, গোসাপ, বনবিড়াল, শেয়াল, সজারু, খরগোস; সেগুলার চামড়া ছাড়াইয়া কতক আগুনে ঝল্‌সাইয়া লয়, কতক রান্না করে। মাংস ঝলসানোর গন্ধে পান্নুর দম যেন বন্ধ হইয়া যায়; ঘরের মধ্যে রান্না মাংস পচে—সেই গন্ধের মধ্যে পান্নুর বমি আসে।

মাথার কাছে কোথাও ঝাঁপির মধ্যে সাপ ফোঁস ফোঁস করে। বুধন একটা গোখরো সাপকে মালার মত গলায় ঝুলাইয়া বেড়ায়। বহুদিনের ধরা প্রকাণ্ড বড় একটা সাপ। সাপটা বুধনের গলায় ঝুলিয়া থাকে, আর মুখটা তুলিয়া বুক হইতে বুধনের মাথা পর্য্যন্ত নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়।

বড় বড় শিকারী কুকুরগুলার ছিপছিপে শরীর, চোখে হিংস্র দৃষ্টি। তাঁবুর দরজায় বসিয়া ঝিমায়, সামান্য শব্দে মুখ তুলিয়া তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি মেলিয়া দেখে—ক্ষীণতম সন্দেহ হইলেই গোঁ গোঁ শব্দ করে।

নাকে বেসর, গলায় হাঁসুলী—দুর্গন্ধময় কাপড়ে কাঁচুলী পরা বুধনের স্ত্রী আসে, পান্নুর গায়ে-কপালে হাত বুলাইয়া দেয়, দুর্বোধ্য ভাষায় প্রশ্ন করে; উত্তর না পাইয়া ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে প্রশ্ন জানায়—কেমন আছ?

পান্নু উত্তর দেয়—মিষ্ট হাসিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতেই জবাব দেয়—ভাল। ভাল আছি।

পেটে হাত বুলাইয়া মুখে আহার তুলিবার ভঙ্গি করিয়া বুধনের স্ত্রী প্রশ্ন করে—ভুখ—ভুখ?

পান্নু বুঝিতে পারে ক্ষুধা পাইয়াছে কিনা প্রশ্ন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে 'ভুখ' শব্দটাও শিখিয়া লয়—ক্ষুধাই বোধ হয় ভুখ!

বুধন সত্যই গুণী ব্যক্তি। গ্রামে প্রতিপালিত এই ছেলেটির রুচির সঙ্গে তাহাদের রুচির পার্থক্য সে বোঝে। স্ত্রীকে সে বলিয়া দিয়াছে—

গরুর দুধ, মহিষের দুধ ছাড়া আর যেন ছেলেটাকে এখন কিছু দেওয়া না হয়। প্রথম প্রথম আহার্য্য দিলেই পান্নু সভয়ে একবার-তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত; দুধের সাদা রঙ দেখিয়াও সন্দেহ যাইত না। সে মুখের কাছে তুলিয়া শুঁকিত। কোন কিছু অপরিচিত তীব্র গন্ধের সন্ধান না পাইয়া সে একবার জিভ দিয়া স্পর্শ করিয়া স্বাদ অনুভব করিত। তারপর নিশ্চিন্ত হইয়া দুধটুকু খাইয়া মনে মনে গাঢ় স্নেহে প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত ওই বুধন ও বুধনের স্ত্রীর প্রতি।

বুধনের স্ত্রী আপন বুকে হাত দিয়া বারবার তাহাকে শিখাইয়াছে—মা! মা। মা! বুধনকে দেখাইয়া শিখাইয়াছে—বা! বা! বাবা!

শক্তিহীন কঙ্কালসার-দেহ পান্নু ডাকে—মা!

বুধনের স্ত্রী আসিয়া দাঁড়ায়।

পান্নু পেট দেখাইয়া বলে—ভুখ!

বুধনের স্ত্রী ছুটিয়া যায় দুধের সন্ধানে।

সেদিন শীকারের ফেরৎ বুধন ঘরে আসিয়া হাসিমুখে তাহার কোলের কাছে সযত্নে রাখিল একটি শীকার করা পাখী। সুন্দর বিচিত্র রঙ। এ পাখী পান্নু চেনে। তাহাদের গ্রামের প্রান্তে বড় বড় অশথ বট গাছগুলায় যখন ফল পাকে—তখন ইহারা ঝাঁক বাঁধিয়া আসে। যেমন সুন্দর পালকের রঙ ইহাদের, তেমনি সুন্দর ইহাদের ডাক—জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির মত মিষ্ট স্বরে ডাকে। বাবুদের বাড়ীর ছোকরা বাবুরা বন্দুক ছুড়িয়া গুলি করিয়া মারে। মাংস নাকি ভারি সুস্বাদু। হরিয়াল পাখী।

বুধন হাসিয়া বলিল—খাগা?—মুখে আহার তুলিবার ভঙ্গি করিয়া সে প্রশ্ন করিল।

শুধু দুধ খাইয়া পান্নুর আর নিজেরও ভাল লাগিতেছিল না। সে সাগ্রহে সম্মতি জানাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হাঁ।

সেদিন বুধনের স্ত্রী তাহার সামনে ওই হরিয়াল পাখীর মাংস ধরিল।

মুখের কাছে পাইয়া এতক্ষণে পান্থর কিন্তু মুখ শুকাইয়া গেল। ইহাদের রান্না।

বুধনের স্ত্রী বলিল—খা। খা।

সভয়ে ঘাড় তুলিয়া সে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

হাসিয়া বুধনের স্ত্রী আবার বলিল—খা!

দ্বিধা এবং সঙ্কোচের মধ্যেও সে সভয়ে এক টুকরা মাংস মুখের কাছে তুলিল, ওই মেয়েটির দেওয়া আহার্য্য প্রত্যাখ্যান করিতে তাহার সাহস হইতেছে না।

বুধনের স্ত্রী বলিল—খা, খা!

এবার সে মুখে তুলিল। লবণযুক্ত সিদ্ধ মাংস। সামান্য একটু গন্ধ সত্ত্বেও লবণাক্ত মাংসের আস্বাদ দীর্ঘকাল পরে তাহার ভাল লাগিল। খুব ভাল লাগিল। তাহার জিভের ডগা হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত একটা লোলুপ শিহরণ বহিয়া গেল। লোভাতুর আগ্রহে সে মাংসখণ্ডটা চিবাইতে আরম্ভ করিল। নরম সুস্বাদু মাংস। হাড়গুলা মুড়-মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সে খণ্ডটার পর আবার একখণ্ড। সমস্তটাকে সে নিঃশেষে খাইয়া সর্ব্বশেষে কয়েক টুকরা অপেক্ষাকৃত শক্ত মোটা হাড় লইয়া চুষিতে আরম্ভ করিল।

বুধনের স্ত্রীর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে ডাকিল বুধনকে আপনাদের ভাষায়,—দেখে যা—দেখে যা—ও মিন্সে!

বুধনও আসিয়া দেখিয়া খুব খুসী হইল। বলিল—খা—খা। তারপর নিজের হাত দুইটা দুইপাশে ঝাঁকি দিয়া দেখাইয়া বলিল—এইসা—এইসা!

পান্থ ইঙ্গিতটা বুঝিল—বুধন বলিতেছে খাইলে এমনি শক্তিশালী দেহ হইবে। পান্থ একটু মিষ্ট হাসি হাসিল।

সেই দিনই অপরাহ্ণে বুধন তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাঁবুর বাহিরে বসাইয়া দিল।

(গ)

দীর্ঘদিন পরে মুক্ত আকাশের তলে পরিপূর্ণ রৌদ্র এবং অবাধ বাতাসের স্পর্শ পাইয়া পান্নু যেন সঞ্জীবনীর স্পর্শ অনুভব করিল। তাহাদের বাড়ীর উঠান কাঁচা মাটির উঠান। মধ্যস্থলটা নিকানো হয়, নিত্য ঝাঁটা বুলানো হয়, সেখানে ঘাস হয় না। কিন্তু চারিপাশে দূর্ব্বাঘাস জন্মায়। সেই ঘাসের উপর তাহার বাপ কি প্রয়োজনে একখানা বড় পাথর আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল। দীর্ঘদিন পর একদা পান্নুই সেই পাথরখানা সরাইয়াছিল। পাথরটার নীচে দূর্ব্বার লতাগুলির রং একেবারে শাদা এবং লতাগুলি পাথরের চাপে মাটির সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য্যের কথা—পাথরখানা তুলিয়া দিবা মাত্র ওই দূর্ব্বার লতাগুলির মধ্যে একটা কম্পন জাগিয়া গিয়াছিল। দূর্ব্বার দীর্ঘ পাতাগুলি মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেহে মনে তেমনি একটা কম্পন জাগিয়া গিয়াছিল। দূর্ব্বার দীর্ঘ পাতাগুলি মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেহে মনে তেমনি একটা কম্পন জাগিয়াছে যেন।

কোন এক অজ্ঞাত গ্রামপ্রান্তের এক অবাধ প্রান্তরে যাযাবরদের তাঁবু পড়িয়াছিল। বর্ষা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আকাশ ঘন নীল, মধ্যে মধ্যে শাদা শাদা হাল্কা চাপবন্দী মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। অপরাহ্নের নীল আকাশের কোল জুড়িয়া প্রকাণ্ড বড় বড় শাদা পদ্মফুলের মালার মত ভাসিয়া উড়িয়া যাইতেছে বকের সারি। তাহাদের 'কক্-কক্' শব্দে পান্নুর শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। সম্মুখে দিগন্ত পর্য্যন্ত উন্মুক্ত। প্রান্তরটার পরেই চাষের মাঠ। বিস্তীর্ণ মাঠখানি সবুজ ধানে ভরিয়া উঠিয়াছে। হা-ঘরেদের তাঁবুর বাইরে ইটের চুলায় রান্না চাপিয়াছে। উলঙ্গ ছেলেদের দল ছুটিয়া বেড়াইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে কয়েকটা কুকুরের বাচ্চা। অদূরেই একটা তাঁবুর সম্মুখে অনেক কয়জনে বেশ একটি ভিড় জমাইয়া বসিয়াছে। বেশ একটা উল্লাস কলরোল চলিয়াছে সেখানে! বাতাসে একটা তীব্র ঘ্রাণও আসিতেছে। বেশ জোরে বার দুয়েক নিশ্বাস লইয়া পান্নু বুঝিল, মদের গন্ধ।

কয়েকজন তাহাকেই আঙুল দিয়া দেখাইতেছে। পানুও সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বুধন একটা পাত্র হাতে উঠিয়া আসিল। তাহার সঙ্গে একটা মেয়ে। বুধন বলিল—খা—খা!

পানু সভয়ে বলিল—না।

মেয়েটা খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটা হা-ঘরের মেয়ে। কালো—খাঁদা, কিন্তু চোখ দুইটা বড়। বড় চোখ দুইটা মদের নেশায় ঢুল-ঢুল করিতেছে। মাথায় রুক্ষ চুল। পরণের কাঁচুলিটা খাটো, খুব আট হইয়া গায়ে চাপিয়া বসিয়াছে—কিন্তু তাহাতেই তাহাকে বেশ একটি শ্রী দিয়াছে।

মেয়েটা এবার বলিল—খা! খা! দারু! পিয়ো।

পানু বলিল—না।

মেয়েটা হাসিয়া আকুল হইল। হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল—বসিয়া মত্ততার ঘোরে মাটির বুকে হাত বুলাইয়া হাসিতে লাগিল।

ওদিকে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে।

গ্রামের মধ্যে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকও বাজিতেছে। ঢাকের বাজনার মধ্যে সে শুনিতে পাইল ধূমুল বাজনার বোল। পূজার আগে নিত্য সন্ধ্যায় ঢাকীরা ধূমুল দেয়।

পাঁচ

হা-ঘরের দলটি বড় নয়, দশটি পরিবার সম্প্রতি বারোতে পরিণত হইয়াছে। দুইটি ছেলে বড় হইয়াছে, বিবাহ করিয়া স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র গৃহস্থালী পাতিয়াছে। ভ্রাম্যমাণ গৃহস্থালী। পানুর আশ্রয়দাতা—তাহার স্ত্রী পানুকে আশ্বাস দেয়—পানুও একদিন এমনি করিয়া গৃহস্থালী পাতিবে। উহাদের কথা-বার্ত্তা পানু এখন অনেকটা বুঝিতে পারে, অল্প-স্বল্প বলিতেও শিখিয়াছে। প্রৌঢ় গুণীন বলে—আমার মন্ত্র-তন্ত্র, জরী-বুটি, সব তুকে শিখাইব। তামাম

আদমী ডরকে মারে—তুকে খাতির করবে'। এই দলের মধ্যে সর্দ্দার তুকে পালা বৈঠনে দিবে। হাঁ!

প্রৌঢ়া বলে—নয়া কাপড়ার তাঁবু বনায় দেবে। থালা দিব, লোটা দিব, নতুন হাঁড়ি দিব; বহুৎ রঙদার দড়ি দিয়ে শিকে বানিয়ে দিব, বহু আসবে তুহার, বিস্তারা দিব, তুহার তাঁবু পড়বে হামার তাঁবুর পাশে।

প্রৌঢ়া বলে—বহুৎ আচ্ছা তীর ধনুক বানিয়ে দেব, আচ্ছা 'কুলাঢ়' বানিয়ে দেব, শড়কী বানিয়ে দেব, ডাণ্ডা বানিয়ে দেব; একটো ভঁইসা দিব, যিসকা বেটিকে তু সাদী করবি—উভি দেবে একটো ভঁইসা; দুটো আচ্ছা কুত্তা ভি দেব, শীকার খেলবি।

প্রৌঢ়া বলে—এ বুড়োয়া তুহার সাঁপটা ভি দিস বাচ্চাকে।

প্রৌঢ়ের তাহাতেও আপত্তি নাই, সে বলে—দেঙ্গে—জরুর দেঙ্গে। এই বয়স্ক ছেলেটিকে সব ভুলাইয়া একান্তভাবে আপনার করিবার জন্য তাহার জীবনের সব কিছু সম্পদ সে দিতে প্রস্তুত।

পানু ভীতিত্রস্ত হৃদয়ে শুষ্ক হাসি হাসে, আর সম্মতি জানাইয়া ঘাড় নাড়ে। তাহার মুখের রোগের পাণ্ডুরতা মনের ভীতি-সঙ্কোচ-বিরূপতা ঢাকিয়া রাখে। কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও সে ইহাদের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারে না, একান্ত ভাবে আপনার জন হইতে পারে না।

অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর মানুষ ইহারা। ইরাণী বলিয়া পরিচিত, ইউরোপের জিপ্সীদের অন্যতম শাখার যাযাবর শ্রেণীকে বাদ দিয়াও—এই দেশেরই আরও যাযাবর শ্রেণী আছে, তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত শ্রেণীর। দলে তাহারা প্রকাণ্ড, ঘোড়া-গাধা পর্য্যন্ত তাহাদের আছে! বেশভূষায় ইহাদের অপেক্ষা অনেক সভ্য। হিন্দুর পল্লীতে গিয়া তাহারা মাথায় নামাবলী বাঁধে, ফোঁটা তিলক কাটে, বহির্বাস পরে, গলায় পরে রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কমণ্ডলু নেয়। পুরাদস্তুর সন্ন্যাসী সাজিয়া 'নমো নারায়ণায়' হাঁকিয়া গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায়, মুখ দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বলে। মুসলমানদের পল্লীতে—

ফকীর সাজিয়া মুসলমানী বোল হাঁকিয়া ভিক্ষা করে, দাবী করে, কাড়িয়া লয়, ছোট-ছোট বাজার হাট সুবিধা পাইলে লুঠ করিয়া লয়। ধর্ম্মের রীতি-নীতি, আচার পালন করে না, কিন্তু ধর্ম্মের ছোঁয়াচ তাহাদের যাযাবর জীবনে লাগিয়াছে, একই দলের মধ্যে ধর্ম্মে হিঁদু এবং ধর্ম্মে ইসলাম উভয় সম্প্রদায়েরই লোক আছে। অবশ্য সে নামেই; তাহাদের খাদ্য এক, পানীয় এক, ভাষা এক, আচার এক, প্রথা এক, দলের মধ্যে আইন এক, কোন পার্থক্য নাই। না থাক, তবুও মানুষের মনের মধ্যে সভ্যতার যতটার প্রভাব পড়িলে জীবনে ধর্ম্ম আসে, ততখানি সভ্যতা তাহাদের মধ্যে আছে। ইহারা কিন্তু আজও পড়িয়া আছে মানব জীবনের অনেক নিম্নস্তরে। ভীমদর্শন বর্ব্বর হিংস্র মুখের গঠন, কালো রঙের উপর পুরু ময়লার একটা স্তর জমিয়া আছে, গরম লাগিলে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, অঙ্গমার্জ্জনা জানেনা, শীতে স্নানই করেনা, গায়ের লোমকূপে উকুন হয়, পরণের একফালি কৌপীনের মত কাপড়েতো শাদা রঙের উকুন থিক্ থিক্ করে, উহারা বলে, 'চিল্লড়'। কামড়ে মধ্যে মধ্যে অস্থির হইয়া আঙুল চালাইয়া মারিয়া ফেলে, মট্-মট্ শব্দ উঠে। অখাদ্য বলিয়া কিছু নাই, গরু ভেড়া মহিষ শেয়াল হইতে ব্যাঙ এমন কি সাপ পর্য্যন্ত খায়, অর্দ্ধসিদ্ধ লবণাক্ত মাংস হইলেই হইল, মাংসের সঙ্গে খায় মদ; এ সমস্ত হজম করিবার শক্তি উহাদের দেহের কোষে-কোষে পিতৃপুরুষক্রমে সঞ্চিত আছে। হজম করিলেও গায়ে কিন্তু একটা অত্যন্ত দুর্গন্ধ উঠে। পানু এই গন্ধটা বিশেষ করিয়া বরদাস্ত করিতে পারে না। তাহার আশ্রয়দাতা গুণী লোক, তাহার মন্ত্র—তাহার ঔষধ সবই সে তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পাইয়াছে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে প্রান্তরে ঘুরিয়া নিজেও সে কিছু কিছু আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার বুদ্ধি তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক তীক্ষ্ণ, সে পানুর কষ্ট বুঝিতে পারে, আরও বুঝিতে পারে তাহাদের সকল খাদ্য পানু হজম করিতে পারিবে না। তাই পানুকে সে পাখী, খরগোষ, ভেড়া, ছাগল ছাড়া অন্য কোন জন্তুর মাংস খাইতে দেয় না। কিন্তু পানু তাহাদের গায়ের গন্ধ সহিতে পারে না

এই সত্যটা মধ্যে-মধ্যে যখন অত্যন্ত প্রকট ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে তখন সে অত্যন্ত আহত হয়।

ধীরে ধীরে পানু সারিয়া উঠিল। তখন প্রায় চারমাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। শীতের আমেজ ক্রমশঃ ঘন হইয়া উঠিতেছে। স্থান হইতে স্থানান্তরে উন্মুক্ত অবাধ বায়ু-প্রবাহের মধ্যে ঘোরা-ফেরা-বাস, অর্দ্ধসিদ্ধ লবণাক্ত পাখীর মাংস খাদ্য, নিত্য নিয়মিত বিপুল পরিশ্রমের ফলে—আজন্ম সবল-দেহ পানু সবলতর দেহ লইয়া সারিয়া উঠিল। অন্যদিকে বিপদ বাড়িয়া উঠিল।

মানব জীবনের বিবর্ত্তন বর্জ্জিত রাক্ষসাচারসর্ব্বস্ব মানুষগুলির সঙ্গে তাহার রুচির প্রভেদ, তাহার অন্তরের ঘৃণা দুর্ব্বল পানুর পক্ষে গোপন করা সম্ভবপর হইয়াছিল, কিন্তু সুস্থ সবল পানুর পক্ষে গোপন করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তাহার আশ্রয়দাতা এখন মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত বিরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাহার স্ত্রী দাঁতে-দাঁত ঘষিয়া গর্জ্জন করে; একদিন সে পানুর চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কঠিন নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত করিল। পানু অকাতরে সব সহ্য করিল, তবু সে পলাইবার চেষ্টা করিল না। ইহাদের মধ্যে সে আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ মনে করে। পলাইবার কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়ে ছিন্ন-কণ্ঠ নাকু দত্তের কথা, থানা, পুলিশ, দারোগা, জমাদার, ফাঁসী! বুক তাহার ধড়ফড় করিয়া উঠে। এখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইহাদের মধ্য হইতে তাহাকে পানু বলিয়া কেউ, কেউ—কেউ আবিষ্কার করিতে পারিবে না। তাহার প্রমাণ সে পাইয়াছে। এই কয়েক মাসের মধ্যেই অনেকবার পুলিশ এই হা-ঘরেদের আড্ডা দেখিয়া গিয়াছে, তল্লাস করিয়াছে, কেউ তাহার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিয়াও দেখে নাই।

পানু সুস্থ হইয়া চেতনা লাভ করার পর প্রথম যেদিন সে হা-ঘরেদের তাঁবুতে পুলিশকে হানা দিতে দেখিয়াছিল, সে-দিন তাহার মনে হইয়াছিল, "পুলিশ আসিয়াছে আমারই সন্ধানে।" দুর্ব্বল হৃদপিণ্ডটা উদ্বেগে বন্ধ হইবার

উপক্রম হইয়াছিল। পুলিশ চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পর পর্য্যন্তও সে পড়িয়াছিল—পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গুর মত। ক্রমে সে দেখিল—ইহাদের তাঁবুতে পুলিশের আসা-যাওয়া অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। পুলিশ আসে, তাহাদের নাম লিখিয়া লয়, শাসাইয়া যায়—চুরি-লুট করিলে কঠিন সাজা দেওয়া হইবে। তাহার আশ্রয়দাতা অনেক দারোগা জমাদারকে জরী-বুটি, রঙীন্ পাথর দেয়, যাহার গুণে দুর্লভ স্ত্রী লাভ হইবে, প্রচুর টাকা পাওয়া যাইবে, দুষমন নাশ হইবে, কঠিন অস্ত্রের আঘাতও ব্যর্থ হইবে, অবশেষে একদিন দুনিয়ার রাজাও বনিয়া যাইবে। এত লোককে সে জরী-বুটি এবং পাথর দিয়াছে যে ভাবীকালে দুনিয়ার রাজত্বের জন্য পরস্পর-বিরোধী হাজার রাজার মধ্যে একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। নারী এবং অর্থ মধ্যে মধ্যে পুলিশের লাভ হয় ইহাদেরই কল্যাণে। সভ্যতায় বঞ্চিত এই হা-ঘরেরা সভ্যসমাজের কোন আইনই মানে না। সুতরাং পুলিশের কবলে ইহারা পড়িয়াই আছে। হা-ঘরের দল গ্রামের পাশে বাসা গাড়ে, তাহাদের গরু মহিষ ছাগল প্রভৃতি পশুগুলির জন্যে গাছ-পালা কুড়াইয়া পাতা কাটিয়া লয়, কাহারও অনুমতি লয় না। গাছ যে কোন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পারে এ আইনই তাহারা মানে না। গাছ মাটিতে জন্মিয়াছে, গাছতো মাটির, বাচ্চা যেমন মায়ের তেমনি। গাছের মালিক গ্রামের লোক আপত্তি করিলে দাঙ্গা বাধাইয়া দেয়। গ্রামের লোকের ছাগল ভেড়া দেখিলে মারিয়া খায়। ছাগল ভেড়া মারে লুকাইয়া। তাহাদের নিজেদের ছাগল ভেড়া আছে ; ও-গুলার অধিকারীত্ব তাহারা মানে। রাত্রে চুরি করে। চৌকীদার পুলিশ মোতায়েন থাকিলে—তাহাদের মেয়েরা তাহাদের সঙ্গে রসিকতা জুড়িয়া দেয়, যুবতীরা তাহাদের ভুলাইয়া দূরে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, সেই অবসরে পুরুষেরা বাহির হইয়া পড়ে নৈশ অভিযানে। পরদিন প্রাতে পুলিশ আসিয়া হাঙ্গামা জুড়িয়া দেয়, খানাতল্লাস করে। মধ্যে মধ্যে দুই-একজনকে ধরিয়াও লইয়া যায় ; ইহারা দুই-চারিদিন অপেক্ষা করিয়া দেখে, ধৃতব্যক্তি তাহার

মধ্যে ছাড়া পাইলে তাহাকে লইয়া বাসা তুলিয়া স্থানান্তরে চলে; ছাড়া না পাইলেও চলে, ধৃতব্যক্তি শাস্তিভোগ করিয়া একদিন না একদিন ফিরিবেই। সত্যই তাহারা অদ্ভুত উপায়ে ভ্রাম্যমাণ দলের সন্ধান করিয়া ফেরে।

পুলিশকে গ্রাহ্য করিলেও ভয় করে না। পান্নু দেখিল তাহারা অর্থাৎ গ্রামের লোক পুলিশকে যেমন ভয় করে, ইহাদের ভয় তেমন নয়। কখনও কখনও পুলিশের সঙ্গেও হাঙ্গামা করে ইহারা, পুলিশও ইহাদের বর্ব্বর ক্রোধোন্মত্ততাকে এড়াইয়া চলিতে চায়! এই মাস কয়েকের মধ্যেই দুইজন কনেষ্টবলকে প্রহার দিতে পান্নু দেখিয়াছে। আজই বৈকালে একজন জমাদারবাবু মার খাইয়াছে। পান্নুর আশ্রয়দাতাই প্রচণ্ড এক চড় কষাইয়া দিয়াছে। জমাদার এই তাঁবুর দিকেই আসিতেছিল, পথে সদ্য বিকশিত যৌবনা একটা হা-ঘরের মেয়েকে দেখিয়া তাহার সঙ্গে রসিকতা জুড়িয়াছিল। মেয়েটি—সেই কিশোরী মেয়েটি—যে একদিন পান্নু মদ খাইবে না শুনিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া হাসিয়াছিল। মেয়েটার নাম রুকনী। রুকনীও তাহার সে রসিকতার উত্তরে সমানে রসিকতা করিয়াছিল, ফলে তরুণ জমাদারটি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারে নাই, ধরিয়াছিল রুকনীর আঁচল। মুহূর্ত্তে আঁচলটা টানিয়া লইয়া রুকনী ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। এবং বলিয়াও দিয়াছিল সব কথা। জমাদারটি দ্বিধাভরেই অগ্রসর হইতেছিল, রাত্রের ছলনাময়ী হা-ঘরের মেয়ের সঙ্গে দুই-একবার তাহার পরিচয় হইয়াছিল, সেই পরিচয়ের উপরেই ছিল তাহার ভরসা। কিন্তু পান্নুর আশ্রয়দাতা গুণীন কথাটা শুনিবামাত্র অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, পান্নু এবং রুকনীও সঙ্গে গিয়াছিল। জমাদারের সঙ্গে দেখা হইল পথে। দেখামাত্রই গুণীন তাহার গালে প্রচণ্ড চড় কষাইয়া দিল! পান্নু অবাক হইয়া গেল, কিন্তু রুকনীর সে কি হাসি, সে দিনের মতই গড়াইয়া পড়িয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

রুকনী মেয়েটা দুরন্ত মেয়ে। পান্নুর চেয়ে বয়সে কিছু বড়। চৌদ্দ-

পনেরো বৎসর বয়স হইলেও মেয়েটা দেহে শক্তিতে ইহারই মধ্যে বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যেমন চতুর, তেমনি হিংস্র, তেমনি শক্তিশালিনী ;—গৃহস্থের বাড়ী হইতে ঘটি বাটি চুরি করিবার দক্ষতা তাহার অদ্ভুত। পথে-মাঠে-ঘাটে ছাগল ভেড়া পাইলে মুহূর্ত্তে সেটার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ঘাড়টাকে এমন কৌশল ও শক্তির সঙ্গে মোচড়াইয়া দেয় যে আক্রান্ত জানোয়ারটা বারেকের জন্যও অস্ফুট চীৎকার করিবার অবসর পায় না। ওই মেয়েটা তাহার এখানকার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ। এ সম্প্রদায়ের অনেকেই পান্নুকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে, কিন্তু রুকণীর মত কেউ নয়। তাহাদের হইতে পৃথক—গ্রাম্য-সমাজের এই ছেলেটিকে ওই সন্তানহীন বৃদ্ধ গভীর মমতায় ঘিরিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধের যাদুবিদ্যাকে সম্প্রদায়ের সকলেই ভয় করে, নতুবা এ সম্প্রদায়ের কেহই পান্নুকে ভাল চোখে দেখে না। পান্নু যে তাহাদের সকল খাদ্য খায় না, সে যে তাহাদের ভাষা ভাল বলিতে পারে না, পান্নু যে আজও পর্য্যন্ত চুরি করিতে বাহির হয় নাই, ইহার জন্য তাহারা তাহাকে ঘৃণা করে। তাহার উপর আক্রোশ পোষণ করে। কিন্তু রুকণীর আক্রোশ যেন সব চেয়ে বেশী। ঠাট্টা বিদ্রূপ সে অহরহই করে, মধ্যে মধ্যে কঠিন ভাবে অপদস্থ করিয়া নিষ্ঠুর হাসি হাসে। মদের ভাঁড় লইয়া রসিকতাটা তাহার একটা সাধারণ রসিকতা। নিজে মদের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে পান্নুকে ভাঁড়টা আগাইয়া দিয়া বলে—পিয়ো!

পান্নুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠে। সে কোন উত্তর দেয় না।

রুকণী আরও খানিকটা কাছে আসিয়া বলে—পিয়ো।

পান্নু বিরক্তি ভরে পিছাইয়া যায়।

রুকণীর হাসি সুরু হয়। হাসিতে হাসিতে পান্নুর কাছে সেও আগাইয়া গিয়া বলে—পিয়ো।

পান্নু আবার পিছাইয়া যায়, রুকণী সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া আসে। নিদারুণ বিরক্তি এবং ক্রোধ সত্ত্বেও তাহাকে কিছু বলিতে সাহস করে না। দলের

সমস্ত লোক তাহার বিপক্ষে ; সামান্য অপরাধে হয় তো কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে। যদি খুন করিয়া কোন প্রান্তরের মধ্যে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দেয়—তবেই বা সে কি করিবে! তাহার আশ্রয়দাতা একা গোটা দলটার সমস্ত লোকের সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করিবে?

শেষ পর্য্যন্ত রুকণী তাহার উচ্ছিষ্ট মদ পান্নুর গায়ে ঢালিয়া দেয়। পান্নুর সর্ব্বাঙ্গে পচাই মদের দুর্গন্ধ উঠে। রুকণী হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

হা-ঘরের দলের কুকুরগুলার ভীষণ হিংস্র প্রকৃতি ; পান্নুর সঙ্গে তাহাদের পরিচয় এখনও অল্প, অন্ততঃ পান্নুর দিক হইতে অল্প। কুকুরগুলা তাহাকে চিনিয়াছে, পান্নুকে দেখিয়া তাহারা গোঙায় না, লেজও নাড়ে, কিন্তু পান্নু তাহাদের কাছ ঘেঁষে না। রুকণী এবং অন্য হা-ঘরের ছেলেমেয়েরা কুকুর-গুলাকে লইয়া খেলা করে। তাহারা ছুটে—কুকুরগুলাও ছুটে, লাফ দিয়া কাঁধে ঘাড়ে উঠে, খেলাচ্ছলে কামড়াইয়া ধরে, রুকণীরা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া আবার ছুটিয়া যায়। কখনও কখনও কুকুরের খেলার কামড়েও ছেলে-মেয়েদের গায়ে রক্ত ঝরে, সে তাহারা গ্রাহ্যও করে না। তাহারাও তাহাদের টুঁটি টিপিয়া ধরে। পান্নু সভয়ে দূর হইতে দেখে। রুকণী কুকুর লইয়া পান্নুর পিছনে লেলাইয়া দেয়। পান্নু প্রথম প্রথম বিব্রত হইত, এখন কিন্তু একটা ডাণ্ডা লইয়া দাঁড়ায়। ডাণ্ডা দেখিয়া কুকুরগুলা রাগিয়া যায়, ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করে।

জমাদার ও রুকণী-পর্ব্বের পর, রুকণী উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিল। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে একটা পরম উপভোগ্য কৌতুক। জমাদার তাহার আঁচল ধরিয়াছিল—সেটাও কৌতুক, গুণীন তাহাকে প্রচণ্ড চড় কষাইয়া দিয়াছে—সেটাও কৌতুক। প্রত্যেক তাঁবুতে সে উচ্ছ্বসিত হাসি হাসিয়া ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া বেড়াইল। পান্নু শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নিষ্ঠুর মেয়েটা এইবার তাহাকে লইয়া পড়িবে, পড়িলও।

অভ্যাস মত মদের ভাঁড় লইয়া রুকণী আসিয়া ভাঁড় আগাইয়া দিয়া বলিল—পিয়ো।

পান্নু এখন সুস্থ, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সবল হইয়াছে। সে আজ বলিল—না।

—পিয়ো। পিয়ো। বলিয়া খিল-খিল হাসি হাসিয়া রুকণী আরও খানিকটা আগাইয়া আসিল।

—না।

পান্নুর সবল প্রতিবাদে রুকণী আজ একটু আশ্চর্য্য হইলেও কৌতুকটা তাহার কাছে আরও উপভোগ্য হইয়া উঠিল। যে সাপ ফণা তুলে না, তাহার সঙ্গে খেলা করিয়া মজা নাই। পান্নুর সবল প্রতিবাদকে অপ্রতিভ উপহাসাস্পদ করিবার উল্লাসে হাসিয়া সে অধীর হইয়া উঠিল। সেও আজ বরাবর যাহা করে তা' করিল না, মদটা তাহার গায়ে ঢালিয়া দিল না। ভাঁড়টায় চুমুক দিয়া একমুখ মদ টানিয়া লইয়া কুলকুচার মত ফু-ফু করিয়া পান্নুর মুখে গায়ে ছিটাইয়া ভাসাইয়া দিল। পান্নুর আর সহ্য হইল না, ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতই রুকণীর দিকে আগাইয়া গেল। মুহূর্ত্তে রুকণী মদের ভাঁড়টা নামাইয়া রাখিয়া কুস্তীর প্রতিদ্বন্দ্বীর মত বলিল—আও! চলে আও! বলিয়া সে-ই লাফ দিয়া পড়িল পান্নুর ঘাড়ে। তারপর আরম্ভ হইল প্রচণ্ড বিক্রমে লড়াই। পান্নু ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া যুঝিতেছিল, তাহার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিতে সে দ্বিধা করিল না, কিন্তু রুকণী পান্নুর অপেক্ষা বয়সে বড়, সে হা-ঘরের মেয়ে, তাহার শক্তি পান্নুর অপেক্ষা বেশী; কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পান্নুকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়া হি-হি করিয়া নিষ্ঠুর হাসি হাসিতে লাগিল। পান্নুর নড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না, অদ্ভুত কৌশলে পান্নুর হাত দুইটাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর পা রাখিয়া রুকণী বুকে বসিয়াছিল। পান্নু শুধু রাগে ফুলিতেছিল। চারিপাশে ততক্ষণে হা-ঘরের দলের ছেলেমেয়েগুলা জমিয়া গিয়াছে, তাহারাও হাসিতেছিল নিষ্ঠুর কৌতুকের হাসি! হঠাৎ রুকণী তাহাদের বলিল—দে তো, মদের ভাঁড়টা দে তো।

বোতলের মতই মুখ সরু মাটির ভাঁড়; ভাঁড়টা লইয়া রুকণী বলিল—পিয়ো।

পানু দাঁতে ঠোঁট টিপিয়া ধরিল। রুকণী ডান হাতে এবার চাপিয়া ধরিল পানুর গলা; বায়ুর ব্যাকুলতায় রুদ্ধ শ্বাস পানুর মুখ আপনি হা হইয়া গেল। রুকণী তাহার গলা ছাড়িয়া দিয়া—গল-গল করিয়া পানুর মুখে ঢালিয়া দিল মদ। তারপর চাপিয়া ধরিল পানুর মুখ।

ছয়

(ক)

মদের দুর্গন্ধ এবং অম্ল-কটু আস্বাদ জীবনে প্রথম এমনিভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও, মদের ক্রিয়াটা তাহার মন্দ লাগিল না। কিছুক্ষণ গা-বমির কষ্ট হইল, তাহার পর, কিন্তু সারা দেহ-মন চন্-চন্ করিয়া উঠিল। তাহার ভয় কাটিয়া গেল—সে হাত-পা ছুড়িয়া প্রবল আস্ফালনের সঙ্গে রুকণীকে গালি গালাজ জুড়িয়া দিল।

রুকণী এবং ছেলেগুলা হি-হি করিয়া হাসিতেছিল। পানুর আশ্রয়দাতা এবং তাহার স্ত্রীও হাসিতেছিল। ছেলেটা আজ মদ খাইয়াছে—ইহাতে তাহাদের ভারী আনন্দ।

রুকণী একবার কুকুর লইয়া আসিল। পানু আজ নিজেদের কুকুরগুলার সবচেয়ে বলবানটাকে লইয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বসিল। [illegible]ন মহাখুসী হইয়া হঠাৎ তাঁবুর ভিতর হইতে তাহার সেই পোষা বুড়া সাপ[illegible]কে আনিয়া পানুর গলায় জড়াইয়া দিল। সাপের শীতল স্পর্শে এবং সাপটার নিমেষহীন চাহনি দেখিয়াও নেশার উত্তেজনার শক্তিতেই পানু ভয়ে এমন কিছু করিল না যাহা দেখিয়া রুকণী ও অন্য ছেলেমেয়েগুলা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িতে পারে। পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া সেও নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে সাপটার দিকে চাহিয়া রহিল।

বুধন বলিল—ডর নাই। ডর নাই। বিষ নিকাল দিলাম। এই দেখ। বলিয়া সে সাপটার গোটা মাথাটা খপ করিয়া আপনার মুখের মধ্যে পুরিয়া স্তনপান-রত শিশুর মত চক্-চক্ করিয়া চুষিতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সে আহার করিল ভীমের মত। ঘুমাইল কুম্ভকর্ণের মত। পরদিন সকালে উঠিয়া মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করিতেছিল, গত সন্ধ্যার ঘটনাগুলা কেমন ঝাপসা মনে হইল। তবুও আপন শৌর্য্যে বেশ খানিকটা অহঙ্কার অনুভব করিল।

রুকণী বাহির হইয়া যাইতেছিল গ্রামে ভিক্ষা করিবার জন্য—তাহাদের বেসাতী বিক্রয়ের জন্য। বেসাতী তাহাদের মাটির ঝুমঝুমি; বন্যলতা দিয়া বোনা অত্যন্ত ছোট বাটির আকারের টুকরী; কিছু পথে প্রান্তরে কুড়াইয়া সংগ্রহ করা কালো-লাল মসৃণ উপলখণ্ড—বিষপাথর এবং রক্তপাথর বলিয়া বিক্রী করে। গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া প্রথমেই হাঁকে—এগে খোকার মা, ঝুম-ঝুমি লেবি? এগে খোকার মা!

ক্রমে বাহির করে লতার টুকরী, তারপর পাথর। শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় দিবার জন্য কখনও কখনও ছুরি দিয়া নিজের হাত খানিকটা কাটিয়া ধূলামাখা রক্ত পাথরটাকে এমন জোরে টিপিয়া ধরে যে সামান্য ক্ষতমুখের রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। বিষপাথর দেখাইয়া বলে, সাঁপ কাটে, বিচ্ছু কাটে—পাথর লাগা, বিষ খা লেবে। তারপর বলে—লিবি? লিবি? লে! লে!

প্রত্যাখ্যান করিলে স্থান কাল পাত্র বুঝিয়া জবরদস্তী করে, আবার ঝোলা-ঝামটা গুটাইয়া পলাইয়াও আসে। রুকণী ভিক্ষায় বাহির হইতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া মুখ ভেঙাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে পানুও দাঁত বাহির করিয়া মুখ ভেঙাইল।

রুকুণী আগাইয়া আসিল। পানু প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। রুকণী কিন্তু তাহাকে আক্রমণ করিল না, বলিল—গাঁওমে যাবি? হামারা সাথ? যাবি?

পানু চুপ করিয়া রহিল।

রুকণী বলিল—বকরী মিলে গা তো মারেগা, আও। গোস খায়েগা রাতমে। আও।

পান্নু বলিল—নেই। নেই যায়েগা!

রুকণী ঘৃণাভরে বলিল—ডরফোকনা! 'অর্থাৎ, ভীরু, কাপুরুষ। বলিয়া সে ঘাঘরা দোলাইয়া প্রায় একপাক নাচিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পান্নু অপমানে রাগে ফুলিতেছিল। কিছুক্ষণ পর তাহার নজরে পড়িল দূরে ধানক্ষেতের ধারে শাদা রঙের চতুষ্পদ কি একটা জানোয়ার ঘাস খাইয়া ফিরিতেছে। কিছুদূর সে আগাইয়া গেল। এবার স্পষ্ট বুঝিতে পারিল—জানোয়ারটা একটা ছাগল। রুকণীর 'ভীরু কাপুরুষ' গালটা তাহার কানে তখনও বাজিতেছিল—মনটা রি-রি করিতেছিল; সে ওই অপবাদ খণ্ডনের জন্যই চুপি-চুপি আগাইয়া গেল জানোয়ারটার পিছন দিকে। কাছে আসিয়া হঠাৎ ছাগলটার উপর লাফাইয়া পড়িল শিকারী চিতার মত। ছাগলটা একটা ভয়ার্ত্ত চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে পান্নু তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া সবলে ঘাড়টা পাক দিয়া মোচড়াইয়া দিল। এমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে কাজটা সম্পন্ন করিল যে, ছাগলটার মুখটা দিতেই মৃত পশুটার মুখ দিয়া অবরুদ্ধ স্বর খানিকটা শব্দ করিয়া বাহির হইয়া গেল। পান্নু চারিদিক দেখিয়া সেটাকে ঘাড়ে ফেলিয়া প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাঁবুতে ঢুকিয়া পড়িল।

রুকণীর জন্য সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। রুকণী যখন ফিরিল তখন সে পথের উপরেই দাঁড়াইয়াছিল। রুকণী আজ শুধু হাতেই ফিরিতেছিল, পান্নু বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, না—রুকণীর কাঁখের কাপড়টা এতটুকু ফুলিয়া ফাঁপিয়া নাই। সে অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল। ব্যঙ্গভরে হাসিয়া ভ্রূ নাচাইয়া প্রশ্ন করিল—কাঁহা?

শ্রান্ত রুকণী তাহার ওই ভ্রূ নাচাইয়া ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ প্রশ্নে অত্যন্ত চটিয়া উঠিল। প্রশ্নটাও সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। রুক্ষস্বরে বলিল—কেয়া ?

—বকরী ?

রুকণী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গভীর তাচ্ছিল্য-পূর্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে আস্তে আস্তে শুধু বলিল—ড-র-ফো-ক-না! বলিয়াই সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু পান্নু খপ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আও।

উগ্র ক্ষিপ্র গতিতে রুকণী উদ্যত-ফণা সাপিনীর মত ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইল—বলিল—কাঁহা ?

পান্নু হাসিয়া বলিল—আও, দেখো।

—কেয়া ?

—বকরী! বকরী।

—বকরী ?

—হাঁ, হাঁ। আও, দেখো।

এবার রুকণীর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল চঞ্চল কৌতূহল, ব্যগ্র মৃদু কণ্ঠস্বরে বলিল—দেঁখে, দেঁখে ?

—আও।

তাঁবুর মধ্যে মরা ছাগলটাকে দেখিয়া 'হা-ঘরেণীর' চোখ দুটা ঝকমক করিয়া উঠিল, তাহার মাংসলোভী মন লোলুপতায় ভরিয়া গেল। ঝকমকে দৃষ্টিভরা চোখে সে প্রশ্ন করিল—তুম ?

—হাঁ। পান্নু বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।—হাম। হাঁ।

'হা-ঘরেণী' দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—যাইবার সময় বলিল—আতা। আভি!

মিনিট কয়েক পরেই সে ফিরিল, তার এক হাতে মদের ভাঁড়, অন্য

হাতে ছুরি। পান্নুর দিকে সে ভাঁড়টা অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল —পিয়ো।

আজ কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ-শ্লেষ নাই।

গত রাত্রের নেশার উত্তেজনাময় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মদের আস্বাদ এবং গন্ধের জন্য পান্নুর মদের প্রতি এতটুকু আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু তবুও সে মদের ভাঁড়টা রুকণীর হাত হইতে তৎক্ষণাৎ টানিয়া লইল, কোনমতেই সে তাহার সদ্য অর্জ্জিত শৌর্য্যের সম্মানকে আহত হইতে দিবে না। দম বন্ধ করিয়া সে ভাঁড়ে চুমুক দিল।

রুকণী বলিল—আওর পিয়ো।

সে আবার চুমুক দিল। এবার রুকণীকে ভাঁড়টা দিয়া সে বলিল—তুম পিয়ো।

রুকণী মদ্যপান করিল—দুর্লভ বস্তুর মত, পরম তৃপ্তির সহিত। তারপর ছাগলটাকে টানিয়া লইয়া হাতের ছুরিটা দিয়া চামড়া ছাড়াইতে বসিল। পান্নুকে বলিল—পাকড়ো।

বুক ফুলাইয়া পান্নু ছাগলটাকে একদিকে টানিয়া ধরিল। রুকণী তাঁহার সঙ্গে আজ সহকর্ম্মীর মত ব্যবহার করিয়াছে—এই অহঙ্কারে সে চরম খুসী হইয়া উঠিয়াছে। মদের নেশাতেও মাথাটা বেশ চন্‌-চন্‌ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেদিন রাত্রে বুধনের তাঁবুর সামনে মদের আসর বসিল। বুধন ও তাহার স্ত্রী প্রচুর মদ্যপান করিয়া নাচিয়া গাহিয়া হুল্লোড় লাগাইয়া দিল। রুকণীও নাচিল, তাহার পায়ের পিতলের নূপুরের ক্ষিপ্র হইতে ক্ষিপ্রতর শব্দের সঙ্গে বাজনদারটা শেষ পর্য্যন্ত তাল রাখিতে পারিল না! তাল কাটিতেই রুকণী বাজনদারটার গালে একটা চড় কষাইয়া দিয়া মাটিতে পড়িয়া হাসিয়া সারা হইয়া গেল।

* * * * *

(খ)

বৎসর দুয়েক কাটিয়া গেল। তের-চৌদ্দ বৎসরের পান্নু পনের-ষোল বৎসরের হইয়া উঠিল। তাহার মুখের চেহারার বদল হইল, মাথায় বাড়িয়া উঠিল উর্ব্বর ভূমির বুনো গাছের মত। মুখ ভরিয়া দেখা দিল ফিন্‌ফিনে গোঁফ-দাড়ী। পিঠের সেই বেতের দাগগুলা ছাড়া পান্নুর পূর্ব্ব-জীবনের সকল পরিচয়-চিহ্নই বিলুপ্ত হইয়া গেল। মদে তাহার এখন প্রবল আসক্তি। এক গরুর মাংস ছাড়া আর কোন মাংসেই তাহার অরুচি হয় না। গরুর মাংসটা সে এখনও খাইতে পারে না। নাম শুনিলে ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠে। এখন সে শিকারে যায়, সাপ ধরিতে পারে। বাঁশের খুঁটার মাথায় লম্বা দুড়ি টাঙাইয়া—বাঁশ হাতে তাহার উপর নাচিয়া গ্রামে-গ্রামে খেলা দেখায়। গ্রামের লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দাঙ্গাও করে। কেবল গরুর মাংস খাইতে না পারার মত পারে না চুরি করিতে। মনে পড়িয়া যায় সেই জমাদারের কথা, দারোগার কথা, তার বাপের মুখ, মায়ের কান্না, দিদি চারুর সেই বিহ্বল চেহারা। খুন করিলে ফাঁসী হয়, চুরি ডাকাতীতেও জেল হয়। ওই দুইটা অপরাধের কায়দায় পাইলে পুলিশের চেহারা—সেই চেহারা। নহিলে পুলিশকে কিসের ভয়? তাহার মনে পড়ে, জমাদারের গালে বুধনের হাতের সেই প্রচণ্ড চড়ের কথা। সেও কামনা করে, এমনি অপরাধে অপরাধী অবস্থায় সেই জমাদারটাকে একবার পায় সে! আপন মনেই সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া হিংস্র ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

মধ্যে মধ্যে মা-বাপ-দাদা-দিদিকে মনে পড়ে। এ মনে-পড়া জমাদার বা পুলিশ প্রসঙ্গে মনে-পড়া হইতে স্বতন্ত্র। গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়া কোন বাড়ীতে তাহাদের বাড়ীর সঙ্গে কোন সাদৃশ্য দেখিলে, অথবা কাহারও মুখের সহিত আপন জনের মুখের আদল দেখিলে তার এ ধারার স্মৃতি জাগিয়া উঠে। বিশেষ করিয়া কোন সুন্দরী তরুণীকে দেখিলে তার মনে পড়ে দিদি চারুকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় বাড়ীর কথা। এই ধারার মনে-পড়ার আরও

একটা ভিন্ন রূপ আছে। গ্রামে গিয়া ঢাকের বাজনা শুনিয়া তার মন চঞ্চল হয়, সে সমস্ত গ্রামখানা খুঁজিয়া দেখে, কোথায় কোন ঠাকুরের পূজা হইতেছে। সেদিন তার মনে পড়ে বন্ধুদের কথা, গ্রামের লোকের কথা, বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপের কথা; মনে পড়ে প্রতিমা গঠনকারী কারিগরদের, বলিদানের ছেত্তাদারকে, পালকের প্রকাণ্ড ফুলওয়ালা ঢাক কাঁধে শ্রীমন্ত বায়েনকে; মনে পড়ে বলিদানের সময়ের জনতার মত্ততা, মনে পড়ে বিসর্জ্জনের সমারোহ, আলো—বাজনা—রাত্রির আকাশে ছুটন্ত এবং জলন্ত হাউই বাজী, বিসর্জ্জনের দীঘি, দীঘির পাশে হাটতলা, হাটতলার কাছে স্কুলের খেলার মাঠ, খেলার মাঠের পরে সবুজ মাঠ, মাঠের ওপারে আবার গ্রাম। সেদিন সে উদাস হইয়া থাকে।

রুকনী সেদিন তার কাছে আসিয়া সামান্য কয়েকটা কথা বলিয়াই অকস্মাৎ চলিয়া যায়, আবার আসে—আবার চলিয়া যায়, শেষ পর্য্যন্ত পান্নুর সঙ্গে দুর্দ্দান্ত কলহ জুড়িয়া দেয়। এখন আর সে তার সঙ্গে মারামারি করিতে আসে না। পান্নু এখন তার চেয়ে মাথায় অন্ততঃ ছয়-সাত আঙুল বড় হইয়া উঠিয়াছে, হৃষ্ট-পুষ্টতায়ও সে রুকনীর চেয়ে অনেক হৃষ্ট-পুষ্ট। রুকনী এখন বরং আগের চেয়ে শীর্ণ হইয়াছে, আগের সেই গোলগাল মোটা সোটা চেহারার মেয়েটি নয়। এখন খানিকটা লম্বা দেখায়, তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলি বেশ খানিকটা লম্বা হইয়াছে; সেই মোটা গাল দুটা ঝরিয়া গিয়াছে, খাঁদা নাকটা খানিকটা টিকালো হইয়াছে, গলার আওয়াজও তাহার এখন আর একরকম।

(গ)

হঠাৎ সেদিন তাহার জীবনে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাহার জীবনে সে যেন একটা ভূমিকম্পের মত ঘটনা। সে কম্পনে তাহার মনের অতীত জীবনের পুরাতন অধ্যায়গুলি প্রাচীন জীর্ণ কুটীরশ্রেণীর মত ধ্বসিয়া পড়িয়া গেল।

রুকণীর সঙ্গে সেদিন তাহার প্রচণ্ড ঝগড়া বাধিয়া গেল। রুকণীর কাছে সেই দিনের পরাজয়ের প্রতিশোধ কামনা বরাবরই তাহার মনে ছিল। সেদিন সেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। রুকণীই প্রচণ্ড ক্রোধে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ব্যাপারটা ঘটিল একটা প্রতারণার ব্যাপার লইয়া।

দুপহর বেলায় রুকণী একটা গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল পান্নু। বোধ হয় সেটা চৈত্রমাস। গরমের আমেজ, বাতাসে ধুলা, এবং অশোক ও লাল কাঞ্চনের ফুল দেখিয়া পান্নুর মনে হইল মাসটা চৈত্রের শেষ বা বৈশাখের প্রথম। গৃহস্থ বাড়ীতে লোকজনেরা ঘুম শুরু করিয়াছে। হা-ঘরেদের পক্ষে সময়টা ভারী সুবিধার। জনবিরল বাড়ীতে দরজা খোলা পাইলে যাহা সম্মুখে পড়িবে তাই লইয়াই সরিয়া পড়িতে পারা যাইবে। অবশ্য পান্নু রুকণীকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে যে, চুরি সে করিতে পারিবে না।

রুকণী হাঁকিতেছিল—এ খো-খার মা ঝুমঝুমি লেবি ?

পান্নু হাঁকিতেছিল—বিষ পাথল। খুন পাথল ! লে—লে। বিষ পাথল। সাঁপ কাটে, বিচ্ছু কাটে, খুন গিরে, সব আরাম হো যায়গা !

একটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীর দরজা খুলিয়া একটা ঝি ডাকিল—এই শোন।

—ঝুমঝুমি লেবি ? টুকরী লেবি ?

—না। শোন। তোরা কাঁউরের বিদ্যে জানিস ?

রুকণী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—কামিচ্ছা মায়ীকি জয়।

—আমাদের বউয়ের ছেলে হয়ে বাঁচে না ; মাদুলী আছে তোদের ?

—হাঁ। জরী আছে, ভূত-পিচাশ ভাগ যায়।

—না-না। জরী ওষুদ তোদের খাবে কে ? মাদুলী।

—হাঁ-হাঁ। খানে নেই হোগা। জরী বেঁধে লিবি।

—বেঁধে রাখলে হবে ?

—হাঁ।

—আয়, তবে আয়। কিন্তু চেঁচামেচি করিস নে বাপু, বাবুরা কি গিন্নীরা উঠলে মুস্কিল হবে।

—হাঁ-হাঁ। চল।

একটি সুন্দরী বধূ। বিষণ্ণ মুখ, চোখের কোলে কালী পড়িয়াছে, ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পানুর মনে পড়িয়া গেল দিদি চারুকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল রুকণী ইহাকে প্রতারণা করিবে। তাহার মন চঞ্চল ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, কি করিয়া মেয়েটিকে বুঝানো যায়—তামাম ঝুট্, সব মিথ্যা।

এদিকে রুকণী তখন তার কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মেয়েটির হাত দেখিয়া, তাহার চুল শুঁকিয়া, তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বলিল, এক 'পিচাশ' ভর করেছে, সেই তোর ছেলে মেরে দেয়।

ঝি এবং বধূটি দু'জনেই শিহরিয়া উঠিল। রুকণী বলিল—ইসকে বাদ, তোকে শুদ্ধ মারবে সেই 'পিচাশ'। শরীরের রক্ত চুসে নেবে, এই এমনি কাঠির মত হয়ে যাবি, সাদা প্যাঙাশ রঙ, তারপর একরোজ 'পিচাশ' তোর ঘাড়টাও মট ক'রে ভেঙে দেবে।

ঝি বলিল—তুই মাদুলী দিবি বললি—তাতে 'পিচাশ' যাবে?

—আলবৎ। তবে মাদুলী দেবার আগে ওকে ঝাড়তে হবে। মন্তর্—মন্তর্! একটো কাপড়া আন।

—কাপড়া? কাপড়া ফাপড়া নয়। মাদুলী দিবি কি [illegible] তাই বল?

—ডরো মৎ। কাপড়া নেবে না হামি। সব তোমাদেরই থাকবে; তবে চাই।

—দেখিস্?

—হাঁ—হাঁ। দেখবে। কাপড়া আন। আওর 'চাউর' আন 'পান্ সের'

—পাঁচ সের? চাল কি হবে?

—মন্তর্। মন্তর্। হামি মন্তর্ দেবে। ওই চাউর খাবি। পিচাশ ভাগ যায়েগা।

চাল-কাপড় আসিল। ওদিকে পানু ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিল। ঝিটা দেখিয়া শুনিয়া একখানা পুরাণো কাপড় আনিল। রুকণী কিন্তু তার অপেক্ষা অনেক হুঁসিয়ার। সে বলিল—রাখ.।

তারপর বিড়-বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া—একটা শিকড় মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বুলাইয়া দিয়া বলিল—পাকড়ো। বধূটি শিকড়টি লইল। রুকণী বলিল—আর কাপড়াটা বদল কর। মন্তর্। মন্তর্। যেটা তুই প'রে আছিস—ওটা বদল কর। ওটাতে এখনও 'পিচাশের' বাতাস লেগে আছে। কর—বদল কর।

বধূটি জীর্ণ কাপড়খানা পরিয়া পরণের নূতন কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিল।

রুকণী কাপড়খানার উপর চালগুলাকে তুলিতে আরম্ভ করিল। ঝিটা শঙ্কিত হইয়া বলিল—মন্তর! মন্তর! মন্তর দেগা।

চাল তুলিয়া বধূটির দিকে চাহিয়া রুকণী বলিল—একটুকরা 'সোনে'—সোনে দে ইসকা উপর।

—সোনা? না। কাজ নাই আমাদের ঝাড়িয়ে!

—দেও। দেও।

—না।

—নেই দেগা?

—না। চালাকী করবি তো লোক ডাকব।

সঙ্গে সঙ্গে রুকণী চোখ দুটা বড় এবং স্থির করিয়া বলিল—আব কামিচ্ছা-মায়ীর গোসা হো গেয়া। আঁ—আঁ—আঁ! বলিয়া সে ভয়ঙ্করীর মত তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল। পানু দেখিল—ঝি ও বধূটি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। চীৎকার করিবার মত সামর্থ্যও তাহাদের নাই। তাহার আর

সহ্য হইল না। সে উঠিয়া গিয়া রুকণীর হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বলিল—খবরদার।

রুকণী তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই সমস্ত বুঝিল—কিন্তু তবু শেষ চেষ্টা করিল—বলিল—সোনে দেনে কহো। সোনে—সোনে। নেহিতো কামিচ্ছা মায়ী নেই শুনেগা।

—খবরদার! চলে আও। আও। পান্নু আবাব ঝাঁকি দিয়া তাহাকে টানিল।

এবার রুকণী আর চেষ্টা না করিয়া একসঙ্গে বাঁধা চাল ও কাপড় কাঁধে তুলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিল। পান্নু তখনও তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।

গ্রাম পার হইয়া একটা জঙ্গল, সেইখানে তাহাদের ঝগড়া আরম্ভ হইল। গ্রামের পথে রুকণী কিছু বলিতে সাহস করে নাই। রুকণী এবার বলিল—কাহে, কাহে? কেন তুই এমন করলি? ছোড় দে হামকো।

পান্নুর মুখে তখনও সেই বুলি—খবরদার!

রুকণী বলিল—স্নয়তান—বেইমান!

—খবরদার।

রুকণী তাহার হাতে একটা কামড় বসাইয়া দিল। পান্নু তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া অন্য হাতে চোয়ালের কস দুইটা চাপিয়া ধরিল নির্ম্মমভাবে। যন্ত্রণায় রুকণীও কামড় ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই সে তাহার ঝোলা এবং চাল-বাঁধা কাপড়টা ফেলিয়া দিয়া পান্নুর উপর [illegible]াইয়া পড়িল। দুইজনে ক্রুদ্ধ আক্রোশে পরস্পরকে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিল। রুকণীর নখের আচড়ে পান্নুর বুক-হাত ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, পান্নু তাহার চুল ছিঁড়িয়া দিল, তাহার আক্রমণে সে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। পান্নু এখন রুকণী অপেক্ষা অনেক সবল। চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে টানিয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া পান্নু রুকণীর বুকে চাপিয়া বসিয়া গলা টিপিয়া

ধরিল। রুকণী তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। পান্নু হিংস্র আক্রোশে ব্যঙ্গভরে হাসিতেছিল। সহসা সে দেখিল রুকণীর দৃষ্টি বদলাইয়া আসিতেছে। অদ্ভুত সে দৃষ্টি! সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিতেছে হাসি। পান্নুর বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিল এক প্রচণ্ড আবেগ। রুকণী দুইহাত বাড়াইয়া পান্নুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখটা টানিয়া আনিল আপনার মুখের উপর, প্রচণ্ড আবেগে পান্নুর মুখটা চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল। উষ্ণ নিশ্বাসে চুম্বনে পান্নুর শরীরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সাত

ইহার পর পান্নু উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

রুকণীর সাহচর্য্য তাহার জীবনের অক্ষয় স্মৃতি। সমস্ত পৃথিবী তাহার কাছে পরম উপভোগ্যা হইয়া উঠিল। সে সব ভুলিয়া গেল; অতীত জীবনের কথা দিনান্তে তাহার একবারের জন্যও মনে হইত না। ধীরে ধীরে সে উপলব্ধি করিল—পেট পুরিয়া আহার—বিশেষ করিয়া পশুমাংস আহার, মদ্যপান জনিত সুগভীর উত্তেজনার বিহ্বলতা আর ওই রুকণীর উন্মত্ত সাহচর্য্য এই হইল পরম সুখ। এ সুখ উপভোগের জন্য চাই দুর্দ্দান্ত সাহস এবং প্রচণ্ড শক্তি। ও দুইটা না থাকিলে পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না। পাইবার অধিকারও নাই কাহারও। উপলব্ধিটা অবশ্য জন্মিল ক্রমশঃ;—অভিজ্ঞতা হইতে।

পূর্ব্বেই রুকণীর একজনের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ নামক প্রথাটা ইহাদের আছে, অতি সামান্য কিছু অনুষ্ঠানও আছে। উহাদের গুণীন বিবাহের স্থান নির্দ্দেশ করে অর্থাৎ প্রান্তরে, পথে, বনে চলিতে চলিতে একটা দেবতা-শ্রিত স্থান সে আবিষ্কার করে। পাহাড়ের কোন অন্ধকার গুহা-মুখ, বনের মধ্যে প্রকাণ্ড কোন বনস্পতির তলদেশ অথবা ধূ-ধূ করা প্রান্তরের মধ্যে কোন

এক শিলা স্তূপের পাদদেশ, সেইখানে দেবতার দরবারে বিবাহ হয়। গুণীন প্রধান ব্যক্তি। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, অতি অল্প কারণেই হয়। তিনবার, চারবার, পাঁচবার কতবার হয় তার স্থিরতা নাই। তবে প্রতিবারই বিচ্ছেদের সময় খানিকটা রক্তারক্তি হইয়া যায়, কখনও কখনও খুনও হয়, সে খুনের কথা পুলিশের খাতায় উঠে না; এমন ক্ষেত্রে মৃতদেহটা তাহারা জ্বালাইয়া দেয়, দলপতি বিচার করে, সাজা হয়। বৃদ্ধ বয়সের বিবাহই ইহাদের বিবাহ, সে বিবাহে আর বিচ্ছেদ ঘটে না। কিন্তু রুকনী তরুণী—রুকনীর স্বামী তরুণ না হইলেও জোয়ান। লোকটি এই হা-ঘরের মধ্যে সম্পন্ন ব্যক্তি, বয়সে রুকনীর সঙ্গে তার ব্যবধান খানিকটা বেশী। লোকটির সম্পন্নতার কারণ, তার চুরিবিত্তায় অসাধারণ দক্ষতা। লোকটি খুব সবল নয়, বয়সও চল্লিশের ওপারে; কিন্তু দীর্ঘদেহ ব্যক্তিটি সিঁধ কাটিয়া চুরি করিতে শৃগালের চেয়েও চতুর। রাত্রে বাহির হইয়া সে কখনও রিক্ত হস্তে ফেরে না! আর পারে ছুটিতে। লম্বা লম্বা পায়ে ঈষৎ হেঁট হইয়া সে ছোটে খরগোসের মত। মধ্যে মধ্যে এক-একটা লাফ দিয়া একেবারে পাঁচ-সাত হাত ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে তার তিনটা বিবাহ হইয়া গিয়াছে, রুকনী তাহার চতুর্থতমা প্রিয়া। পূর্ব্বের তিনটার মধ্যে দুইটার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াছে, একটা, —সেটা তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী,—সে সতীন সত্ত্বেও ঘর করিতেছে। রুকনীকে প্রৌঢ় টাকা দিয়া কিনিয়াছিল। রুকনীর বাপের জেল হইলে সে-ই রুকনীর মা ও রুকনীর ভরণ-পোষণ চালাইয়াছিল।

ওই সতীনটাই স্বামীকে রুকনীর সঙ্গে পানুর গোপন সম্বন্ধে সংবাদ দিল। গভীর রাত্রে রুকনী তাঁবু হইতে চলিয়া যায়।

পানু অশ্রান্ত পদক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে রুকণীদের তাঁবুর প্রান্ত পর্য্যন্ত কুকুরগুলার দৃষ্টি বাঁচাইয়া আনাগোনা করে।

ওই মেয়েটা একদিন দেখিয়া ফেলিল। রুকণীর নির্য্যাতনে তাহার পুরুষ-আনন্দ। সে একদিন স্বামীকে জাগাইয়া সব দেখাইয়া দিল। রুকণী

ফিরিতেই লোকটা খপ্ করিয়া তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিল। নলীর দুই পাশে নখ দিয়া টিপিয়া ধরিয়াছিল—অল্প সময়ের মধ্যেই রুকণীর জীবন শেষ হইয়া যাইবার্ কথা। কিন্তু ব্যাপারটা পান্নুও দেখিয়াছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া লোকটার চোয়ালে বসাইয়া দিল প্রচণ্ড এক ঘুঁষি।

তারপর আরম্ভ হইল দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ।

পান্নুর বয়স কচি, এখনও শক্তি পরিপক্ক সামর্থ্যে জমাট বাঁধিয়া উঠে নাই। পান্নু প্রচণ্ড মার খাইল। কিন্তু তবু তাহারা মানিল না।

আবার একদিন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হইয়া গেল। সে-দিন বুধন না-থাকিলে লোকটা পান্নুকে শেষ করিয়া দিত। সর্দ্দার বিচার করিয়া রুকণীকে সাজা দিল। অন্যায় রুকণীর। একটা খুঁটা পুতিয়া সেই খুঁটার সঙ্গে রুকণীকে বাঁধিয়া দড়ি দিয়া তাহাকে প্রহার করা হইল। রুকণীর পিঠ কাটিয়া দড়ির দাগ বসিয়া গেল।

পান্নু উন্মাদ হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িয়া গেল নিজের পিঠের দাগ-গুলার কথা, সে-দিনের সেই যন্ত্রণার কথা মনে পড়িল, সারাটা দিন সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়া সারা হইল। বুধন এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে অনেক বুঝাইল, অন্য একটি কিশোরী মেয়েকে আনিয়া দেখাইয়া বলিল—ইহাকেই তুমি সাদী কর। আজই সাদীর ব্যবস্থা করিব। কিন্তু পান্নু শুনিল না।

গভীর রাত্রে সে ছুরি লইয়া বাহির হইল। বুকে হাঁটিয়া তাঁবু কাটিয়া রুকণীদের তাঁবুতে প্রবেশ করিল—তারপর চাপিয়া বসিল রুকণীর স্বামীর বুকে।

রুকণীর স্বামী তখন জাগিয়াছে, কিন্তু নিরুপায়।

পান্নু ছুরিখানা লইয়া নিষ্ঠুর আনন্দে ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া লোকটাকে সে হত্যা করিবে। একেবারে বুকে বসাইয়া দিবে? অথবা গলায়,—নলীটা কাটিয়া দিবে? যেমন করিয়া তাহারা পশুর নলীটা সর্ব্বাগ্রে কাটিয়া দেয়! হঠাৎ তাহার নাকু দত্তের কথা মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্দ্দান্ত ভয় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—সমস্ত শরীর তাহার

যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল। সে ধীরে ধীরে লোকটাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—আমাকে তুই খুন ক'রে ফেল।

লোকটা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সেও পানুকে কিছু বলিল না। নিজে আসিয়া রুকণীর বাঁধন খুলিয়া দিয়া বলিল—যা, নিয়ে যা তুই।

রুকণী কিন্তু সাক্ষাৎ সয়তানী। মাস কয়েক যাইতে না যাইতে সে অন্য একটি তরুণের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। পানুও উভয়কে একসঙ্গে আবিষ্কার করিল।

বুধন বলিল—ওটাকে ছোড় দে। দুসরা সাদী কর।

পানু কিন্তু রুকণীর প্রেমে পাগল। নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে রুকণীকে নির্য্যাতিত করিয়া সে তাহাকে শাসন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহিল। একদিন এই দ্বন্দ্বের মধ্যে রুকণী তাহার হাতে বসাইয়া দিল ছুরি।

এবার সর্দ্দার বিচার করিয়া রুকণীর মাথা মুড়াইয়া দিতে হুকুম দিল এবং বলিয়া দিল, মেয়েটাকে কেহ সাদী করিতে পাইবে না। লোকে বলিল, ঠিক হইয়াছে। রুকণী কিন্তু বিচিত্র মেয়ে। সে বলিল, তাহার চুল সে মুড়াইতে দিবে না। সে হিংস্র বাঘিনীর মত দাঁড়াইল। কিন্তু এতগুলি লোকের কাছে সে কি করিবে? জোর করিয়া তাহার মাথা মুড়াইয়া দেওয়া হইল। পরদিন সকালে দেখা গেল, একটা গাছের ডালে দড়ি বাঁধিয়া রুকণী গলায় ফাঁস পরিয়া ঝুলিতেছে।

পানু বুক চাপড়াইয়া কাঁদিল। তারপর দেখা গেল, সে কেমন অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে।

বুধন এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে সাদীর জন্য ধরিল, কিন্তু সে বলিল—না! সে এবার মাতিয়া গেল বুধনের সংসার লইয়া। তাহাদের 'ভঁইষা' দুইটার পরিচর্য্যা করে, ঘাস কাটিয়া আনে, ডাল কাটিয়া আনে, দুধ হইতে ঘি তৈয়ার করে, সঞ্চয় করে।—যেখানে তাহারা তাঁবু ফেলে, সেখানে নিকটস্থ গ্রামে

গিয়া ঘি বেচিয়া আসে। বন হইতে লতা কাটিয়া আনিয়া টুকরী বোনে; ঝুম-ঝুমি তৈয়ারী করে। তাহার প্রথম জীবনের সামাজিক সংসারজ্ঞান এবং সেই জীবনের রুচি হইতে সে এই সব বস্তুগুলির অনেক পরিবর্ত্তন করিল। যাহার ফলে বুধনের স্ত্রীর জিনিষ পল্লীর লোকেরা আদর করিয়া কিনিতে আরম্ভ করিল। বুধনের সংসারে স্বাচ্ছল্যের সীমা রহিল না। অন্য পরিবার-গুলি ঈর্ষাতুর হইয়া উঠিল। এমন কি দলের সর্দ্দার পর্য্যন্ত।

ক্রমে পান্নু দেখিল—হা-ঘরেদের কিশোরী যুবতী মেয়েগুলি তাহার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য লালায়িত হইয়া ফেরে। তাহারা চোর ডাকাত দুর্দ্দান্ত জোয়ান দেখিয়াছে; পান্নুর সে শৌর্য্যেরও অভাব নাই; উপরন্তু তাহার এ এক অদ্ভুৎ শক্তি। ঘরকে এমন পরিপাটী গুছাইয়া সাজাইয়া তুলিতে তাহাদের কেহ পারে না; এমন তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধি তাহাদের কাহারও নাই। এমন রুচি কোন পুরুষের নাই, এমন পরিচ্ছন্ন কেহ নয়। মেয়েগুলা সপ্রেম দৃষ্টিতে কটাক্ষ হানিয়া কথা বলে—হাসে; পান্নু হাসিয়া বলে—ভাগ্।

একদা স্বয়ং সর্দ্দারের মেয়ে তাহার কাছে আসিল। একটা প্রান্তরে তাঁবু পড়িয়াছিল, বড় বড় পাথরের চাঁই চারিদিকে। একখানা পাথরের উপর বসিয়া দুলিতে দুলিতে বলিল—সর্দ্দারের বেটী এল।

পান্নু কথা বলিল না।

সে বলিল—তুহার পাশে এল।

পান্নু কথা বলিল না।

সে বলিল—হামাকে সাদী করবি?

পান্নু হাসিল।

সর্দ্দারের মেয়ে বলিল—কোই কো পাশ যাবে না হামি।

পান্নু এবার বলিল—যাও হিঁয়াসে।

—না।

পান্নু ডাকিল—বাবা। বুধনকে সে ডাকিল।

বুধনকে এ-দলে সকলের বড় ভয়। সে গুণীন, তাহার উপর এখন সে দলের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন। লোক, সর্দ্দার পর্য্যন্ত তাহার কাছে টাকা ধার করিয়াছে। মেয়েটা সকরুণ স্বরে বলিল—পান্নু।

পান্নু আবার ডাকিল—বাবা।

এবার সে উঠিয়া গেল।

দলের অন্য মাতব্বরেরা আপন আপন কন্যার জন্য বুধনকে ধরিল—তোমার লেড়কার সঙ্গে আমার বেটীর সাদী দাও। ভঁইষা দিব, কুত্তা দিব।

বুধন পান্নুকে বলিল। কিন্তু পান্নু বলিল—নেহি।

পান্নুর মন কেমন হইয়া গিয়াছে।

রুকণীর মোহ কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের মেয়েগুলিকে দেখিয়া কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মায় তাহার। বিশেষ করিয়া সে যখন গ্রামে যায়, গ্রামের কন্যা—বধূগুলিকে দেখে—তখন তাহার সমস্ত অন্তর হা-ঘরেদের উপর ঘৃণায় ভরিয়া উঠে।

গ্রামের মেয়েরা যখন বলে—দেখিস দেখিস, ছোঁয়া পড়বে!—মাগো—কি গন্ধ গায়ে! তখন তাহার মন বুধনের উপর পর্য্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠে। এক এক সময় মনে হয়, গভীর রাত্রে উঠিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু ভয় হয়। তাহাকে পান্নু বলিয়া চিনিলে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। গত্যন্তর-হীন হইয়া সে হা-ঘরেদের মধ্যেই কাটাইয়া চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, এক জেলা হইতে অন্য জেলায়, বাংলাদেশ পার হইয়া সাঁওতাল পরগণায়; সেখান হইতে বেহারের গ্রামে। আবার পাক দিয়া ফেরে। পৌষ-মাঘ মাসটা তাহারা বাংলাদেশে আসে। পৌষ হইতে আষাঢ়—বর্ষার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ফেরে। এ সময়ে দেশটায় লোকের হাতে সম্পদ থাকে।

সময়টা পৌষ মাস। তাহারা সাঁওতাল পরগণা পার হইয়া বাংলাদেশের

প্রান্তদেশে তাঁবু গাড়িয়াছিল। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে সরকারী পাকা সড়কের দুই পাশে ছোট কয়েকটা দোকান। সাঁওতাল পরগণা হইতে শালপাতা, কাঠ লইয়া যে সব গাড়ী যায়—তাহারা এইখানে 'আঁট' দিয়া বিশ্রাম করে। ময়ূরাক্ষীর ওপারেও একটা বাজার। ওদিকের বাজারটাই বেশ বড়। অনেকগুলি দোকান, পাশে পল্লীও আছে। পান্নু বাজার দেখিয়া হাঁড়ি লইয়া নদী পার হইয়া ওপারে গিয়া উঠিল।

—ঘিউ লেবে বাবু, ঘিউ। ভঁয়ষা ঘিউ।

কেহ দেখিল, আঙুলে লইয়া শুঁকিয়া—হাতের উপর ঘষিয়া দেখিল—তারপর বলিল—চর্ব্বি হ্যায়। সাঁপকে চর্ব্বি দিয়া।

পান্নু দাঁত বাহির করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বাংলা ভাষায় লোকে তাহাকে গাল দিল। পান্নুর বুঝিতে দেরী হইল না। গোটা বাজারটা ফিরিয়াও কেহ তাহার ঘি লইল না। লইল না নয়, যে দরে তাহারা লইতে চায়—সে দরটা যে অত্যন্ত অসঙ্গত—তাহারা যে তাহাকে ঠকাইয়া লইতে চায়—সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। রুকণী যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত—তবে সে ছুরি বাহির করিয়া বসিত। সে চলিল পল্লীটার মধ্যে। বহুদিন পরে বাংলা কথা তাহার বড় ভাল লাগিতেছে। বড় মিষ্ট মনে হইতেছে। বেহার হইতে সাঁওতাল পরগণায় আসিয়া—লোকের কথার মধ্যে এই ভাষায় যেন একটা দূরাগত সুর শুনিয়াছিল। বহু দূরের বাঁশীর ক্ষীণ আওয়াজের মত সাঁওতাল পরগণার ভাষার মধ্যে এই ভাষার ক্ষীণ সুর মিশিয়া আছে। আজ সেই ভাষা শুনিয়া তাহার কান যেন জুড়াইয়া গেল। ইচ্ছা হইল, সেও এই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সাহস হইল না।

—ঘিউ লেবে বাবু, ঘিউ। ভঁয়ষা ঘিউ।

—এই ঘি। এই! গ্রামের মোড়েই একজন দোকানদার ডাকিল।

—ভঁয়ষা ঘিউ। বহুৎ আচ্ছা। পান্নু হাঁড়িটা মাথা হইতে নামাইয়া দুই হাতে তাহার সম্মুখে ধরিল।

লোকটি আঙুলের ডগায় ঘি লইয়া বার কয়েক শুঁকিয়া দেখিয়া বলিল—চর্ব্বিটর্ব্বি নাই তো রে?

—নেই বাবু! রামজী কসম।

হুঁ! কসম তো তোদের মুখে লেগেই আছে। আবার একবার শুঁকিয়াও সে বোধ হয় নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না;—ডাকিল—ওগো! শুনছ! ওগো!

বাহির হইয়া আসিল সুন্দরী যুবতী একটি মেয়ে,—কি—কি বলছ?

পানু হাঁড়িটা ধরিয়া, তাহার হাত-পা সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, দুই হাতে আলগোছে ধরিয়া রাখা হাঁড়িটা অকস্মাৎ তাহার হাত হইতে খসিয়া দাওয়ার উপর পড়িয়া গেল।

গৃহস্থের স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বলিয়া উঠিল—যা!

পানু কিন্তু আর দাঁড়াইল না। সে পলাইয়া আসিল। কেন পলাইয়া আসিল সেই জানে! মেয়েটি যে তাহার দিদি চারু। চিনিতে তাহার ভুল হয় নাই। তাহার মুখ দাড়ি-গোঁফে ভরিয়া উঠিয়াছে, চৌদ্দ বছরের পানু আঠারো বছরের জোয়ান হইয়া উঠিয়াছে, চারু তাহাকে চিনিতে পারে নাই। পানু ঠিক চিনিল; চিনিয়াও কিন্তু পলাইয়া আসিল।

আট

বুকের ভিতর তাহার অন্তরাত্মা যেন মাথা কুটিতেছিল। তাহার দিদি চারু! হ্যাঁ—সে তাহার দিদি চারু! ভুল হয় নাই। মনের ছবির সঙ্গে মুহূর্ত্তে মিলিয়া গেল; তাহার বুকের ভিতরে ছবি মুহূর্ত্তে অস্পষ্টতা আবছায়া কাটাইয়া জল-জলে ডগ-ডগে হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে কত কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ঠিক জলছবির মত। ইস্কুলের কথা

মনে পড়িল। ইস্কুলে বইয়ের উপর জলছবি লাগাইত। কাগজের উপর ছবিগুলা থাকিত ঝাপসা মত। জলে ভিজাইয়া কাগজটার ছবির দিকটা বইয়ের উপর বসাইয়া দিত। তারপর টানিয়া তুলিয়া লইত কাগজখানা। ছবিগুলা তখন বইয়ের পাতার উপর ডগ-ডগে হইয়া ফুটিয়া উঠিত। আজও ঠিক যেন এই মুহূর্ত্তে কাগজখানা মন হইতে উঠিয়া গেল। ঘরের, গ্রামের ছবিগুলা ঝলমল করিতেছে—টাটকা আঁকা ছবির মত।

দিদি চারু এখানে কেন? হয় তো তাহারই মত পলাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ও লোকটা কে? ওতো দিদির স্বামী নয়। তাহার দিদির বিবাহ হইয়াছিল গ্রামে। কৃষ্ণলালকে তো তাহার মনে পড়িতেছে। কোঁকড়া লম্বা চুল, বড় বড় ড্যাবা-ড্যাবা চোখ, মুখে বসন্তের দাগ; কুস্তী-করা মুগুর-ভাজা শরীর। এ-তো সে নয়।

বাবা কোথায়? মা কোথায়? দাদা কোথায়? একজনের কথা লইয়া মন কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। একজনের কথা মনে হইতে-না-হইতে আর একজন সম্মুখে দাঁড়াইতেছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন। বাবাকে কি ফাঁসী কাঠে—? ভাবিতে গিয়া তাহার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। দুঃসহ ক্রোধে দেহের পেশীগুলি ফুলিয়া উঠিল, দাড়ি-গোঁফ সমাচ্ছন্ন মুখখানা হইয়া উঠিল ভীষণ, ভয়াবহ।

চলিয়াছিল সে আ-পথে। ময়ূরাক্ষীর তীর ধরিয়া শরবন-কুলঝোঁপের পাশ দিয়া কুশাঙ্কুর আস্তীর্ণ বালুভূমির উপর দিয়া। কোন দিকের লক্ষ্য ছিল না। সে যেন ভয়ে পলাইয়া যাইতেছে। ওই দিদি চারুর ভয়ে।

দিদি যদি তাহাকে চিনিতে না পারে, বলিলেও যদি বিশ্বাস না করে? সে কথা ভাবিতেও তাহার বুক আকুল হইয়া উঠে! সে যদি বলে, কখনই তুই পানু নহিস—কখনই না, তবে কেমন করিয়া সে পানু হইবে? চিনিতে পারিয়াও যদি বলে—তুই হা'ঘরে হইয়া গিয়াছিস্, তোর জাতি গিয়াছে, তোকে আর লইবনা;—তবে? তবে সে কি করিবে?

প্রায় সারাটা দিন সেখানে কাটাইয়া সে তাঁবুতে ফিরিল অপরাহ্ণে। বুধন এবং তাহার স্ত্রী তাহার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা ইতি-মধ্যেই বাজারে ঘিয়ের হাঁড়ি ভাঙার খবর পাইয়াছে। তাহারা ভাবিয়া-ছিল—এই জন্যই বোধ হয় পান্‌কু দুঃখে ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।

বুধন বলিল—গেয়া তো কেয়া হুয়া? ভঁইষা তো তুহার হ্যায়। ঘিউ ভি তুহার। তু বনায়া। তোহারা হাঁতসে গির গিয়া—ঘিউ বরবাদ হুয়া—তো কেয়া হুয়া? যানে দো!

তাহার স্ত্রী বলিল—ই সব বিলকুল চিজ তোহারা হ্যায়। হামলোক তো বুঢ্‌ঢা হো গেয়া, যব যায়েগা, সব তুহার হোগা।

পান্নুর চোখে জল আসিল। ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিল। কাহার জন্য কাঁদিল সে নিজেও বুঝিতে পারিল না। বুধন এবং তাহার স্ত্রী সযত্নে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল। ভবিষ্যতের কত গল্প শুনাইল।

পান্‌কুর যদি এই দলের মেয়েদের কাহাকেও পছন্দ না-হয় তবে তাহাদেরই গোত্রীয় অন্য দল হইতে মেয়ে বাছিয়া তাহার বিবাহ দিবে। সে জন্য যদি দরকার হয় তাহারাই অন্য দলে চলিয়া যাইবে। পান্‌কুকে একটা 'হারা' অর্থাৎ সবুজ রঙের তেরপলের তাবু কিনিয়া দিবে। তেরপলের তাঁবুতে জল পড়ে না, তেমনি মজবুত হয়। কোন শহরে গেলে—যে শহরে থাকে সাহেব লোক—গোরা লোক—সেই শহর হইতে পান্‌কুর জন্য সংগ্রহ করিয়া দিবে একটা সফেদ রঙের আর একটা কালা রঙের [illegible] কুত্তার বাচ্চা। নেপালীদের সঙ্গে মুলাকাৎ হইলে—খুব ভাল একটা ভোজালী কিনিয়া দিবে। বুধন বলিল, এইবার তাহার সব চেয়ে তাজা মন্তরগুলি সে পান্নুকে শিখাইবে। সে মন্তরের বহুৎ গুণ। সেই মন্তর পড়িয়া যাহাকে ইচ্ছা কুত্তার মত বশীভূত করা যায়। আর একটা মন্তর পড়িয়া বালি, খেজুর কাঁটা, সাপের দাঁত; আকাশে ছুড়িয়া দিলে—সে সন্‌-সন্‌ করিয়া ছুটে, যাহার নাম তুমি করিয়া দিবে, তাহার বুকে গিয়া মোক্ষম আঘাত করিবে। লোকটা যেমনই বলবান

হউক—হোক না কেন সে ভীমের মত—তাহাকে ঘায়েল হইতেই হইবে। কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া মরিবে। আর একটা মন্তর আছে—সেটা পড়িলে যেমনই বন্ধনে বাঁধুক না তোমাকে—খুলিয়া যাইবে! এমন কি সরকার বাহাদুরের হাতকড়িও যদি তোমার হাতে পরাইয়া দেয়—তবে সেও খুলিয়া-যাইবে!

বুধনের স্ত্রী বলিল—পানকু বলুক না কেন, কোন্ ছুঁড়িকে তাহার পছন্দ, সে তাহাকেই আনিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া দিতেছে। পানকু তাহার সাদী করিতেছে না, এ কি তাহার কম দুঃখ! পানকুর সাদী হইবে, তাহার ছোট্ট বাচ্চা হইবে, 'ওঁয়া-ওঁয়া' শব্দ করিয়া কাঁদিবে, সে তাহাকে কোলে তুলিয়া দোলা দিবে—কত আদর করিবে। তাহার গলার হাঁসুলিটা খুলিয়া সে তাহাকে পরাইয়া দিবে। পানকুর বধূকে সে দিবে নাকের বেসর, কানের মাকড়ী। তাহার সব গহনাই একে একে দিবে। সে 'বুঢ়্‌ঢী' হইয়াছে, কি প্রয়োজন তাহার গহণার? পানকুকে সে দিবে তাহার গলার মাদুলীটা। এই মাদুলীটা তাহাকে দিয়াছিল তাহার বাপ। সেও ছিল মস্ত বড় গুণীন। সে নাকি এমন মন্তর জানিত যে—সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া তালা-চাবী দিলেও সে তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিত। তাহার দেওয়া এই মাদুলীর বহুত গুণ। কোন ডাইনীর দৃষ্টি তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। ভূত, প্রেত, পিচাশ—যাহারা হাওয়ার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ফিরিতেছে, তাহারা সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিবে।

ওদিকে গল্পের মধ্যে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল; বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখর কণ্ঠ ক্রমশ মৃদু এবং মধ্যে মধ্যে স্তব্ধ হইয়া আসিতে আসিতে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পানুর কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। তাহার দিদি চারু! সেই টকটকে ফরসা রঙ, সেই সুন্দর মুখ, ছোট চোখ দুটির অদ্ভুত স্তিমিত দৃষ্টি, সেই বিড়ালের মত চোখের তারা, এক-পিঠ চুল, সেই সব; তাহার দিদি চারু, তাহাতে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

প্রান্তরের বুকে চারিদিকে শেয়াল ডাকিয়া উঠিল এক সঙ্গে। এই প্রথমবার নয়, এইবার তৃতীয় প্রহরের ডাক। যাহারা চুরি করিতে যায়—এই ডাক শুনিয়া তাহারা ফেরে। ইহার পর আর কেহ তাঁবুর বাহিরে থাকে না।

পানু ভাবিতেছিল—চারু বলিবে—না—না—পানু কখনও ন'স তুই!

পরদিন উঠিয়া আবার সে গেল সেই দোকানে। দোকানী তাহাকে চিনিল। সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল—কাল তোর বহুৎ ঘিউ বরবাদ হয়ে গেল।

সে এক পাশে বসিল, বলিল—হাঁ।

—কাল তোকে খুব মেরেছে তোর বাপ-মা?

—নেহি।

—তবে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলি? দু'তিনবার খুঁজতে এল এক বুঢ্যা—আর এক বুঢ্যি।

—হাঁ। অর্থহীনভাবে পানু বলিল—হাঁ।

ঠিক এই সময়েই বাহির হইয়া আসিল তাহার দিদি। হ্যাঁ, এই তাহার দিদি। ঘাড়ে, ঠিক কানের নীচে সেই কালো জড়ুল রহিয়াছে। তাহার দিদি বলিল—কালকের সেই ছোঁড়া নয়?

—হ্যাঁ।

সস্নেহে তাহার দিদি বলিল—ঘিয়ের হাঁড়ি ভেঙে ছুটে পালাল কাল। আহা-হা।

লোকটি বলিল—দাও, চারটি মুড়ি দাও ওকে।

মুড়ি লইয়াও পানু বসিয়া রহিল। তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া লোকটি বলিল—কি রে? আবার বসে রইলি যে?

পানু বসিয়া আছে—ওই মেয়েটির নাম শুনিবার জন্য। কিন্তু সে প্রশ্ন সে করিতে পারিল না।

—কি? কি মতলব আছে আর? লোকটি এবার সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

তাহার দিদি বলিল—হ্যাঁ, ওরা আবার চোরের একশেষ।

—ভাগ বলছি, ভাগ!

পান্নু উঠিল। হতাশ হইয়া উঠিল। তাহার চেহারার মধ্যে বাল্যকালের চেহারার কি এতটুকু সাদৃশ্য আর নাই, যাহা দেখিয়া দিদির মনে বারেকের জন্যও মনে হয়—পান্নুর মত মনে হইতেছে যেন!

পথে একটা পানের দোকানে সে দাঁড়াইল। দোকানে একখানা বিবর্ণ আয়না ঝুলিতেছিল। বিবর্ণ আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে নিজেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিল। নিজেকে দেখিয়া সে যেন কিছুতেই চিনিতে পারিল না। গোল-গাল শরীর—সুন্দর না হইলেও—একখানি কালো কচি মুখ, ক্ষারে-কাচা মোটা কাপড়, ছিটের-কামিজ-গায়ে ছেলেটির সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই। নিজেরই তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সমস্ত রাত্রিটা সেদিনও তাহার জাগিয়া কাটিয়া গেল। তৃতীয় প্রহরে আজও শেয়ালগুলা ডাকিল, তখনও সে জাগিয়া রহিয়াছে! ভাবিতেছে—কেমন করিয়া জানা যায়, মেয়েটির নাম চারু কিনা? কেমন করিয়া বলা যায়—দিদি, আমি পান্নু, তোমার ভাই পান্নু!

হঠাৎ বাহিরের লঘু-দ্রুত পদধ্বনি শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল। আজ দলের লোক চুরি করিতে বাহির হইয়াছিল, তাহারাই ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকখানা দ্বিগুণিত হতাশায় ভরিয়া উঠিল। আজ রাত্রে ইহারা চুরি করিয়াছে। তবে কালই এখান হইতে তাঁবু উঠিবে। ভোর হইতে না হইতেই এখান হইতে রওনা হইবে।

তাহার দিদি, তাহার দিদি চারু! তাহাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে সে? আর কখনও দেখা হইবে কি না সন্দেহ।

অনুমান তাহার মিথ্যা নয়, ভোর হইবার পূর্ব্বেই হা-ঘরের দল তাঁবু উঠাইয়া রওনা হইল। পান্নু বার বার পিছাইয়া পড়িতেছিল। দলের

লোক বিরক্ত হইল। বুধন জিজ্ঞাসা করিল—কেয়ারে বেটা? তোর ভবিষ্যৎ কি খারাপ মালুম হচ্ছে?

পান্নু একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ক্লান্তভাবেই বলিল—হাঁ।

বুধন তাহাকে একটা ভঁইষার পিঠে সওয়ার করিয়া দিল। দলের অন্য লোকে হাসিল, মেয়েরা টিটকারি দিল। কিন্তু পান্নু উদাস বিহ্বল।

প্রায় সমস্ত দিনটা হাঁটিয়া মিলিল একটা শহর। সেইখানে তাঁবু পড়িল। দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, হা'ঘরেদের ভিক্ষায় বা জিনিষ-পত্র বেচিবার জন্য বাহির হইবার আর সময় নাই। তবু অনেকে শহরটা দেখিবার জন্য—প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র, নিমক, মরচাই, তেল কিনিতে বাহির হইল।

শহর পান্নু অনেক দেখিয়াছে। তবু মনিহারীর দোকান, বড় বড় বাড়ী, বাগান দেখিতে ভাল লাগে। আজ কিন্তু তাহার সে সব ভাল লাগিল না। একটা চৌ-মাথার উপর তাহাদের দল দাঁড়াইয়াছিল। চৌ-মাথাটার চারিদিকে দোকান—এইখানেই প্রয়োজনীয় সব জিনিষ মিলিবে। দুই-চারিজন করিয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা এ দোকানে—ও দোকানে সওদা করিতে আরম্ভ করিল।

সামান্য কয়েকটা জিনিষ কিনিয়া পান্নু রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইল। সামনেই একটা টিনের চালা, বাঁধানো মেঝে; সেই মেঝের উপর বসিয়া নৌয়া অর্থাৎ নাপিত এই অপরাহ্ন বেলাতেও লোকের দাঁড়ি চাঁচিয়া দিতেছে। হঠাৎ তাহার চোখের উপর একটা লোকের চেহারা অন্য রকম হইয়া গেল। লোকটা বেশ বড় একজোড়া গোঁফ লইয়া বসিয়াছিল। 'নৌয়া'টা হাতের অস্ত্র দিয়া নিঃশেষে গোঁফগুলা চাঁচিয়া ফেলিয়া দিল। মনে হইল—সে লোকই এ নয়। এ আর কেউ! এ যেন যাদু!

তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। ফিরিবার পথে বারবার সে আপন দাড়ি-গোঁফে হাত বুলাইল। তখন এগুলা ছিল না। এগুলা চলিয়া গেলে—এ চেহারা তাহার যাদুর মত পাল্টাইয়া যাইবে।

তাঁবুতে ফিরিয়া জিনিষ-পত্রগুলি দিয়াই সে আবার বাহির হইয়া পড়িল—সকলের অলক্ষ্যে। একবার কোমরে হাত দিয়া দেখিল—তাহার গেঁজলেতে টিন-গোলাকার বস্তুগুলি ঠিক আছে। সে দ্রুতপদে আসিয়া শহরের মধ্যে ঢুকিল। কয়েকবার রাস্তা ভুল করিয়া অনেকটা ঘুরিয়া সে সেই টিনের চালাটা বাহির করিল। নৌয়াটা তখনও বসিয়া আছে। সে গেঁজলে হইতে বাহির করিল একটা গোল কঠিন বস্তু। সেটা আধুলি। আধুলিটা সে নাপিতটার সামনে রাখিয়া বলিল—হাঁ, দেও। বলিয়া সে দাড়ি-গোঁফে হাত বুলাইল—মাথার লম্বা বাবরী চুল দেখাইয়া দিল।

নাপিতটা প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল। কুৎসিৎ দর্শন—সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধ—গলায় লাল পলার মালা—দেখিবামাত্র হা-ঘরে বলিয়া চেনা যায়। সে চুল কাটিবে, দাড়ি-গোঁফ কামাইবে! কিন্তু আধুলীটা দেখিয়া সে তাহার মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া গেল। ভাবিল, তরুণ যাযাবর ছোকরাটির সাধ হইয়াছে শহরের বাবুদের দেখিয়া। সে হাসিয়া বলিল—একদম বাবু বনা দেগা। তারপর সে কাঁচি চালাইয়া দিল তাহার চুলে। তাহার কামান যখন শেষ হইল তখন আর বেশী বেলা নাই। নাপিতটা তাহার সম্মুখে ধরিল একখানা আয়না। আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া পান্নু অবাক হইয়া গেল। হা-ঘ'রে হারাইয়া গিয়াছে! এ কে? এ কে?

সেই ছোট-কাল, কচি-মুখের সঙ্গে এ-মুখের মিল যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায়! হ্যাঁ—পাওয়া যায়! কিন্তু বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে না পাইলে বুধন উৎকণ্ঠিত হইয়া খুঁজিতে বাহির হইবে, বুধনের স্ত্রী বাহির হইবে। সে আর দাঁড়াইল না। শহর হইতে বাহির হইয়া যে পথ ধরিয়া তাহারা আসিয়াছিল, সেই পথেই ফিরিল।

চারু, তাহার দিদি চারুর বাড়ীর মুখে চলিল। প্রথম খানিকটা সে উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিল। দ্রুতপদে, যথাসাধ্য দ্রুতপদে। যখন সে চারুর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল—তখনও রাত্রি আছে। সে দাওয়াটার উপরেই শুইয়া পড়িল।

তাহার ঘুম ভাঙিল চারুর কণ্ঠস্বরে—কে? কে? এ কে শুয়ে আছে?

পানু উঠিয়া বসিয়া—তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বহুদিন না-বলা—তাহার কাছে বড় মিঠা-লাগা বাঙ্গলায় টানিয়া টানিয়া বলিল—দিদি! হামি পানু।

নয়

—দিদি! হামি পানু।

স্থির দৃষ্টিতে চারু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—চিনতে পারছিস না? শঙ্কাতুর করুণ দৃষ্টি মেলিয়া চারুর মুখের দিকে চাহিল।—হামি পানু, তোহার সেই ছোট ভাই!

চারু এবার খানিকটা ঝুঁকিয়া তাহাকে দেখিতে আরম্ভ করিল।

পানুর মনে পড়িয়া গেল জমাদারের বেতের দাগের কথা। তৎক্ষণাৎ সে পিঠ বাঁকাইয়া দেখাইয়া বলিল—এই দেখ্ পিঠে সেই জমাদার মারিয়েছিল, বেত চালাইয়েছিল। দেখ, দাগ দেখ! বুঢ্যা নাকুদত্তকে গলা কাটিয়ে দিল। থানামে বাবাকে ধরিয়ে নিয়ে গেল, মায়কে নিয়ে গেল, তুকে নিয়ে গেল, হামাকে নিয়ে গেল। বাবাকে বাঁধলে জমাদার, বেত চালাইলে। তুকে মারলে দারোগা বাবু। হামি জমাদারকে মারলাম—

চারু এবার তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল—পানু। হ্যাঁ—তুই পানু! পানুই তো বটে আমার! কোথায় ছিলি ভাই? কোথা থেকে এলি? পানু! পানুই তো বটে আমার। ঝর-ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

পানুরও কান্না পাইতেছিল, কিন্তু কান্নার চেয়েও প্রবলতর আবেগে একটা গভীর উৎকণ্ঠায় তাহার বুকটা কেমন করিতেছিল; সে বলিল—দিদি—বাবা! হামাদের বাবা? পুলিশ—পুলিশ—পুলিশ বাবাকে ঝুলাইয়ে দিলে ফাঁসী কাঠে? বাবার ফাঁসী হইয়ে গেল? দিদি?

চারু কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল—না। বাবা বেঁচে আছে ভাই, মা আমাদের চলে গিয়েছে। মা নাই।

—মা নাই? মা মরিয়ে গেল? পুলিশ মাকে ফাঁসী দিলে?

—ছি! বারবার পুলিশ, ফাঁসী বলছিস্ কেন? মায়ের ফাঁসী হবে কেন—কিসের জন্যে! মায়ের অসুখ করেছিল। তোর জন্যে মায়ের সে কত দুঃখ! তুই কোথায় এতদিন ছিলি ভাই?

পানু বলিল—পুলিশকে ডরকে মারে দিদি, জঙ্গলমে, পাহাড়মে, এক মুল্লুকসে আওর এক মুল্লুকমে—

পানু বলিল—আপনার কথা।

চারু বলিল—বাপের কথা, মায়ের কথা, বড় ভাইয়ের কথা। পানু স্থির হইয়া বসিয়া শুনিল।

চারু সর্ব্বাগ্রে বলিল—নাকু দত্তের খুনী ধরা পড়ে নাই। কে যে খুন করিয়াছে সে তথ্য পুলিশ দেশ তোলপাড় করিয়া তদন্ত করিয়া আবিষ্কার করিতে পারে নাই। পানু যে সদরে গিয়া পুলিশ সাহেবের কাছে নালিশ জানাইয়াছিল তাহার ফলে সে কি কাণ্ড! বাপকে তাহার চালান দিল। ইন্‌স্‌পেক্টার আসিল, গোয়েন্দা পুলিশ আসিল। দিনের পর দিন ডাক পড়িত তাহাদের। বিশেষ করিয়া চারুর।

সে-সব কথা পানুকে বলিতে গিয়া সে বারবার শিহরিয়া উঠিল। তবে জমাদারের সাজা হইয়াছিল। তাহাকে কনেষ্টবল করিয়া অন্য থানায় বদলীর হুকুম দিয়াছিলেন পুলিশ সাহেব। দিন কতক সমস্ত গ্রামখানায় মানুষের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বড় বড় বাবুদের বাড়ী খানাতল্লাস হইয়া গেল। বাবুদের দু'জন ছেলেকেও চালান দিল পুলিশ। গণ্ডার হাড়ি, মুরশিদাবাদের দর্জ্জি, মাধব ময়রাও চালান গেল। তারপর একদা সকলকেই পুলিশ ছাড়িয়া দিল। বলিল, প্রমাণ ঠিক পাওয়া গেল না। কিন্তু তখন চারুর বাপের যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে।

চারু বলিল—ঘটিবাটি জমি জেরাত যা ছিল—পরানের ডাহাতে তা বেচে উকীল মোক্তারকে ঢেলে দিতে হ'ল সব। আমার শ্বশুররা বললে—ও বউ আর নোব না। সোয়ামী আমার মনের দুঃখে পাগল হয়ে গেল। পানু, সে এখন গায়ে ধুলো-কাদা মেখে বেড়ায়।

পানু সেদিন কথাটার মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। অবাক হইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

চারু বলিল—জ্ঞাতিতে সব পতিত করলে বাবাকে। বললে—ও কন্যে তোমার ঘরে থাকলে তোমার সঙ্গে আমরা চলব না। তুমি পতিত! বাবা চুপ করে থাকল। কোনও জবাব দিলে না। তারপর—। চারু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

ইহার পরের স্মৃতি বড় মর্ম্মান্তিক।

নিঃস্ব রিক্ত সর্ব্বস্বান্ত আত্মীয়-স্বজন-জ্ঞাতি-গ্রামবাসীদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত পানুর বাপের বাড়ীর চারিদিকে ক্ষুধার্ত্ত লোলুপ নেকড়ের দৃষ্টির মত মানুষের দৃষ্টি ফিরিতে লাগিল। হরিণীর মত চারু আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

রামমুণি বেনেনী, এককালে তরঙ্গময়ী স্বৈরিনী ছিল, বৃদ্ধ বয়সে সে গ্রামের রতনবাবুর দৌত্য বহন করিয়া লইয়া আসিল চারুর মায়ের কাছে,—রতনবাবু বলেছে—পঁচিশ টাকা দেবে। পাঠিয়ে দে চারুকে।

চারুর মা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—কি বলছ ঠাকুর ঝি? তুমি না চারুর পিসী?

—তাতেই তো বউ। মেয়েটার ভালোর জন্যেই বলছি। নইলে আমার আর কি বল?

চারুর মা বলিল—না-না-না। হতভাগীর কপালে যা ছিল ঘটেছে। কিন্তু আমি মা হ'য়ে পেটের ভাতের জন্য সে পারব না। তুমি ওসব কথা ব'ল না।

রামমুণি চারুর মায়ের মুখের দিকে চাহিল সাপের মত স্থির দৃষ্টিতে। তারপর বলিল—তা'হ'লে সত্যি বল?

—কি?

—নাকু দত্তের টাকা তোরাই পেয়েছিস্?

—কি বলছ দিদি?

—লোকে বলে, বিশ্বাস করি নাই। এইবার বুঝলাম। রামমুণি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

তারপর আসিল কৃষ্ণচন্দ্র স্বর্ণকার। স্বর্ণকার গহণা গড়ে; তাহার কারবার মেয়েদের সঙ্গে, কেহ মাসী, কেহ পিসী, কেহ দিদি, কেহ বউদিদি, কেহ খুড়ী। চারুর মাকে কৃষ্ণচন্দ্র বলিত খুড়ী। তাহাদের ঘরে সোনার গহণার রেওয়াজ নাই; গহণা তাহাদের সবই রূপার। সোনার গহণার মধ্যে নাকচাবী, কানের টাপ্। তাহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহাদের গলায় সরু বিছাহার, হাতে শাখাবাঁধা দেখা যায়। বড়লোক যাহারা তাহারা গলায় মোটা দড়িহার পরে। কৃষ্ণচন্দ্র নীল কাগজের একটি মোড়ক-হাতে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। —খুড়ী! খুড়ী কোথায় গো?

চারুর মা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহাদের বাড়ীর রূপার গহণাগুলি কৃষ্ণচন্দ্রের হাত দিয়াই বিক্রী করিয়াছে। সেই লইয়া কোন গণ্ডগোল বাধিল নাকি?

কেষ্ট আসিয়া হাসিয়া বলিল—ভাল আছ খুড়ী?

শঙ্কিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া চারুর মা জানাইয়াছিল—হাঁ ভাল আছি।

হাতের নীল কাগজের মোড়কটি খুলিয়া কেষ্ট বলিল—দেখ দেখি খুড়ী, জিনিষটা কেমন হ'ল? আগুনের মত দীপ্তি এবং বর্ণ বস্তুটার, গিনি সোনার বিছাহার একগাছি।

চারুর মা মুগ্ধ হইয়া গেল। অন্তরের অক্ষম কামনা লোভ হইয়া জাগিয়া উঠিল দুটি চোখে। সে কাঙালের মত বলিল—বড় সুন্দর হয়েছে বাবা।

কেষ্ট হারছড়া চারুর মায়ের হাতে তুলিয়া দিল—দেখ। তারপর বলিল—দাও চারুর গলায় পরিয়ে দাও, দেখি কেমন মানায়!

—না বাবা। পরের জিনিষ বড় লোকের 'সামিগৃগিরি', আমাদের গলায় তো উঠবার নয়। নাও।

—দাও না তুমি চারুর গলায় পরিয়ে। আমি বলছি। তারপর ফিস-ফিস করিয়া বলিল—যতীনবাবু দিয়েছে চারুকে।

যতীনবাবু ধনীর ছেলে, সৌখীন তরুণ, রাস্তা দিয়া সে যখন যায়—তখন আশপাশ ভরিয়া উঠে মিষ্ট পুষ্পসারের গন্ধে, আকাশের রৌদ্রের ছটা তাহার গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবীতে প্রতিফলিত হইয়া ঝলমল করে। পল্লীর মানুষগুলি, চিরজীবন যাহাদের একমাত্র কামনা মোটা ভাত আর মোটা কাপড়, অবাক বিস্ময়ে তাহার দিকে-চাহিয়া থাকে। সেই যতীন বাবু!

চারুর মা তবুও বলিল—না।

কেষ্ট অনেক অনুনয় করিল। চারুর মা তবুও সম্মত হইল না। ঘরের মধ্য হইতে চারু সব শুনিয়া ছিল। তাহার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল। যতীনবাবু! রাজাবাবু! সোনার হার! যে বস্তুটাকে অমূল্য দুর্লভ বলিয়া যতীনবাবুর দিকে চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে চিরদিন চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সে বস্তু ওই দারোগা আর জমাদার ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছে। শাস্তি তাহাদের হইয়াছে। পুলিশ সাহেব তাহাদের চাকরীতে নামাইয়া দিয়াছেন, অনেক কটু কথাও নাকি বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার তাহাতে কি? পাড়ার মেয়েরা তাহাকে দেখিয়া হাসে। তাহার শ্বশুর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, স্বামী পাগল হইয়া গিয়াছে। বাপ সর্ব্বস্বান্ত। ঘরের মধ্যে সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পানু নিরুদ্দেশ। গন্ধবেনের ছেলে হইয়া তাহার বড় ভাই পেটের জ্বালায় গ্রামেই লইয়াছে চাকরের কাজ। ময়লা কাপড় কাচে, ঘর ঝাঁট দেয়; বাবুদের জুতা পরিষ্কার করে। কিসের জন্য, কেন সে কেষ্টদাদার প্রস্তাব প্রত্যাখান করিবে? রাজাবাবু—যতীনবাবু? আগুনের মত রঙের গিনি

সোনার হার! সে খিড়কীর পথে ছুটিয়া আসিয়া একটা গলির মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল—কেষ্ট দাদা!

কেষ্ট ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া হাসিল।

চারু হাত পাতিয়া বলিল—দাও। দিয়ে যাও!

কেষ্ট গলিপথে আসিয়া হার ছড়াটি হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল—আমার ইচ্ছে ছিল নিজের হাতে তোর গলায় পরিয়ে দি। তা—। গলির এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া কেষ্ট বলিল—তা' কে কোথায় দেখবে। থাক আমার মনের সাধ মনেই থাক।

চারুর অন্তরে তখন একটা জোয়ার আসিয়াছে। যতীনবাবু, রাজাবাবু! যাহার গায়ের সৌরভে আশপাশ ভরিয়া যায় সে গন্ধ যাহার বুকের মধ্যে প্রবেশ করে—তাহার বুকটা তোলপাড় করিয়া উঠে! আগুনের বর্ণ সোনার হার দিয়াছে সে! তাহার মনে হইল অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রির পর্দাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে হঠাৎ পূর্ণচাঁদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। চাঁদের রাজ্যে থাক কলঙ্ক, তাহার জীবনের চারিদিক স্নিগ্ধ নীলাভ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কেষ্টচন্দ্রের কথার উত্তরে চারু লীলাভরে হাসিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—মরণ!

তারপর চারুর জীবনে সে এক বিচিত্র অধ্যায়।

রাজপুত্রের সঙ্গে আসিল মন্ত্রীপুত্র, সেনাপতি-পুত্র, কোটাল-পুত্র, সওদাগর-পুত্র, আরও কত জন।

চারুর-মা কেমন হইয়া গেল—বোকা, নির্বোধ। কন্যার কীর্ত্তিকলাপ চোখে দেখিয়াও একটা কথা বলিতে পারিল না। কন্যার উপার্জ্জন দেখিয়া সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। ধনী সহৃদয় আগন্তুককেও কোনদিন বলিতে মনে হইল না—আমার কাপড় ছিড়েছে বাবা; একখানা নতুন কাপড়—!

চারুর অনুপস্থিতিতে কোন দূতী বা দূত আসিয়া তাহার হাতে টাকা দিয়া

গেলে সে না বলিতেও পারিত না, আবার টাকা মেকী কি আসল সেও দেখিয়া লইতে তাহার বুদ্ধি হইত না। কেবলমাত্র কোন জনের নিকট হইতে আহার্য্য উপঢৌকন আসিলে সে খানিকটা সজীব হইয়া উঠিত। চারুকে না জানাইয়া খানিকটা অংশ সে তুলিয়া লইত। অন্ধকার ঘরে বসিয়া অথবা নির্জ্জন পুকুর ঘাটে সেগুলা গব-গব করিয়া পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়া যাইত।

চারুর বাপ কিন্তু ধীরে ধীরে ধাক্কাটা কাটাইয়া উঠিল। সে ঘর হইতে বাহির হইল! অত্যন্ত ধাম্মিকের বেশে বাহির হইল। ফোঁটা তিলক কাটিল, গলায় একটা ঝুলি ঝুলাইল; কন্যার উপার্জ্জনে আহার্য্যের উপাদেয়তায় এবং প্রাচুর্য্যে—সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চিন্ততায় চিক্কণ দেহে নির্ব্বিকার চিত্তে লোক সমাজে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল; মুখে অবিরাম ধ্বনি—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেই সে হাসিয়া বলিত —হরিবোল! হরিবোল! অনিত্য সংসার। এ সংসারে কেউ কারু নয়। আমিও আমার নই। ভাল—সব ভাল। হরিবোল! হরিবোল!

তারপর সহসা চারুর জীবনে আসিল আবার এক নূতন অধ্যায়। আবার একটা বিপর্য্যয়।

আয়নায় একদা আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া চারু নিজেই শিহরিয়া উঠিল। তাহার রূপ যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। কূলভরা জল, জল-ভরা পদ্মবনের শোভায় ঝলমল ভাদ্রের দিঘীর মত তাহার দেহে রূপ যেন আর ধরে না। বুকের ভিতরটা তাহার তোলপাড় করিয়া উঠিল।

চারু বলিল—সে কি দিন ভাই! সে কি বলব! মা তো হাবা হয়ে গিয়েছিল, বাবার মুখে শুধু বোল—হরিবোল! আমার মাথায় ভেঙে পড়ল বাজ! কি করব? কোলে কে আসবে, তাকে নিয়ে কি ক'রে পথে বের হব? মনে হ'ল বিষ খাই, গলায় দড়ি দি! তাও পারলাম না। রামমুণিকে

বললাম, কেষ্টদাদাকে বললাম—তারা বললে, ভয় কি? কাঁটা তুলে দোব। কেউ জানবে না। আমি তাও পারলাম না। আমার কোল-আলো-করা সাতরাজার ধন মাণিক—!

আজও চারু ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পানু অবাক হইয়া শুনিতেছিল। সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে সেদিন সে বুঝিতে পারে নাই। সে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

চোখ মুছিয়া চারু বলিল—সেইদিন এল এই মানুষটি! বললে—ভয় কি; আমি তোমাকে মাথায় ক'রে রাখব। বিদেশী মানুষ—এসেছিল চাকরী করতে ওই রাজাবাবুদের বাড়ী। রাজাবাবুর খাস খানসামা ছিল সে। আমি যেতাম—আসতাম—আমাকে ডাকতে আসত, আবার দিয়ে যেত চাকরের মত। কোন দিন একটা হাসি তামাসা পর্য্যন্ত করে নাই। সেদিন আমি মাটিতে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছি। রাজাবাবুর কাছ থেকে এসেছিল আমাকে ডাকতে, আমার কান্না দেখে বললে—তুমি কেঁদোনা।

আজও সে লোকটি দোকানের তক্তোপোষে বসিয়া তামাক টানিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল—ও সব কথা এখন থাক না কেন। পরে বলবার ঢের সময় পাবে। এখন হারানো ভাইকে পেলে—চান করাও ভাল ক'রে। একখানা সুগন্ধি সাবান ঘষো গায়ে। খেতে দাও।

চারু তাহার কথা গ্রাহ্য করিল না। সে বলিয়াই গেল। সেদিনের স্মৃতি তাহার জীবনের অক্ষয় সম্পদ।

পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রামের মানুষ তাহাকে পাপ বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছে, ঘৃণা করিয়াছে, বর্জ্জনের অভিনয় করিয়াছে, গোপনে আবার তাহাকেই লইয়া বিলাস করিয়াছে। যেদিন তাহাদের পাপ শুদ্ধ চারুর ঘাড়ে চাপিল, পাপের বোঝার ভারে চারু যেদিন ডুবিতে বসিল—সেদিন সমস্ত জানিয়া শুনিয়া এই লোকটি বলিল—তুমি কেঁদো না।

চারু বলিয়াছিল—যাও যাও, বিরক্ত করো না তুমি। আমি যাবনা, তোমার বাবুকে বলগে তুমি।

তবু লোকটি যায় নাই। বলিয়াছিল—তুমি কেঁদো না। তুমি যদি রাজী হও, আমি তোমাকে মাথায় ক'রে রাখব।

চারু অবাক হইয়া গিয়াছিল।

লোকটি বলিয়াছিল—তুমি যদি রাজী থাক—তবে বোষ্টম হয়ে—মালা চন্দন করে তোমাকে আমি বিয়ে করব। দেশান্তরে চলে যাব। বলব—আমারই ছেলে।

গলায় কলসী বাঁধিয়া যাহাকে দশজনে জলে ডুবাইয়া দিল—এই গলার ভরা-কলসীসমেত তাহাকে এই লোকটি মুহূর্ত্তে মাথায় করিয়া জল হইতে উদ্ধার করিল; তাহাকে বুক ভরিয়া দিল মুক্ত বাতাস, মুক্ত আকাশের তলায় রৌদ্রের আলোকচ্ছটা, উত্তাপের সঞ্জীবনী স্পর্শ, ঘাসে ভরা পৃথিবীর নরম বুকে চলিবার অধিকার। সে কথা কি না বলিয়া থাকা যায়?

চারু বলিয়াই চলিল।

দশ

—গাঁয়ে সে কি হৈ-হৈ কাণ্ড ভাই! সে কি মজলিশ! সে কি ছি-ছি! লোকে আমাদের দোরের সামনে দিয়ে যেত—চীৎকার ক'রে ব'লে যেত—'যাকে দশে করে ছি, তার জীবনে কাজ কি?' দারোগা বাবু,—

পানু চমকিয়া বলিল—সেই দারোগা—

—না। এ নতুন দারোগা। বাবাকে ডেকে শাসালে, যেন কোন বে-আইনী কাজ না হয়। থানার সামনেই বাড়ী, পুলিশ চিলের মত চোখ রেখে বসে রইল।

—কাহে? কেনে? পানু সভয়ে প্রশ্ন করিল।

চারুর সেই লোকটি হাসিল। চারুও একটু হাসিল। তারপর সে বলিয়া গেল—অকুণ্ঠিত ভাবে হাত নাড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। এ চারু —সে চারু নয়। সঙ্কুচিতা, ভয়ত্রস্তা হরিণীর মত মেয়েটি নয়; এ এক অসঙ্কুচিতা মুখরা বাঘিনীর মত মেয়ে, অসঙ্কোচে সমস্ত কথা সে ব্যক্ত করিল তার সহোদরের সম্মুখে সপ্রতিভ ভাবে। কথাটা পান্নুকে শুনাইতেই তার বাকী ছিল। নতুবা এ কথা সে তাহার এই বাঘিনীত্ব প্রাপ্তির দিন হইতেই সংসারকে এমনি ভাবে ঘোষণা করিয়া শুনাইয়া আসিয়াছে। সে পান্নুকে বুঝাইয়া দিল—সমাজে স্বামিহীনা, স্বামীপরিত্যক্তার সন্তানবতী হওয়ার মত পাপ-অপরাধ আর হয় না। সেই পাপ গোপনের জন্য, হতভাগিনীদের গর্ভে আবির্ভূত হয় যে সব সাত রাজার ধন মাণিক তাহাদের পরিত্যাগ করিতে হয় বিষপ্রয়োগে, তাহাদের হত্যা করিয়া—হতভাগিনীদের বত্রিশ নাড়ীর বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় আবর্জনার স্তূপে, নদীর জলে, পুঁতিয়া ফেলে মাটির তলায়। ভ্রূণহত্যা রাজার আইনে অন্যায়। সাজা হয়।

চারু হাসিল। বলিল—বাবা হয়েছিল ধর্মের ঢেঁকি—কপালে তেলক, নাকে রসকলি, গলায় কণ্ঠি, মুখে হরি—হরি। 'হরি হরি' বলতে বলতেই ফিরে এল বাড়ী। এসে চুপ ক'রে বসল। আগে বিড়-বিড় ক'রে বলত হরি—হরি। এবার চেঁচাতে লাগল। মা কাঁদতে লাগল। আমি আর থাকতে পারলাম না। নেমে চলে গেলাম থানায়।

চারু থানায় গিয়া প্রথম এই মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছিল। বলিয়াছিল—বাবাকে ডেকেছিলেন কেনে? দারোগা তাহাকে ধমক দিয়া পাপটার গুরুত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু চারু তাহাকে বাধা দিয়া উচ্চ কণ্ঠে সেই থানায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমার কোঁকে আছে আমার সাগর-ছেঁচা ধন, আকাশের চাঁদ, আমার জল-পিণ্ডির আধার। হ্যাঁ, আমার সন্তান হবে। আমার কোল আলো হবে, জীবন

সার্থক হবে। তাকে কেন আমি মারব? কিসের জন্যে সে-পাপ করব? তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোও।

দারোগা ভড়কাইয়া গিয়াছিল!

একটা কনেষ্টবল শুধু বলিয়াছিল—এই মাগী থাম্! সরম লাগছে না তোর?

—না-না-না! চারু বলিয়াছিল—সরম? সে হাসিয়া উঠিয়াছিল।—না—সরম আমার নাই। এ তুই বুঝবি না। দারোগার চাকর তুই—দারোগার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে, তার মধ্যে কথা বলতে তোর সরম হচ্ছে না? সে দারোগা যখন ছিল তখন, যখন তুই আমাকে ডাকতে যেতিস তখন তোর সরম লাগত না?

কনেষ্টবলটা পলাইয়া গিয়াছিল।

চারু হাসিয়াছিল। তারপর দারোগাকে বলিয়াছিল—শোন দারোগা বাবু, তুমি অবিশ্যি সে-হিসেবে ভাল লোক। তোমাকে সে দোষ দিতে আমি পারব না। কিন্তু শোন—তুমি আর আমার বাবাকে ডেকে এমন ক'রে শাসিয়ো না। ভয় নাই, আমার কোল-আলো-করা চাঁদ নিয়ে তোমাকে দেখিয়ে যাব। প্রণাম ক'রে যাব।

—বাড়ীতে ফিরলাম ভাই। বলিয়াই চারু স্তব্ধ হইয়া গেল। সে যেন মনশ্চক্ষে কি দেখিতেছিল। সে ছবি তাহার ভুলিবার নয়। জীবনে, সময় মানেনা—অসময় মানেনা এই ছবিটা তাহার চোখের সম্মুখে অকস্মাৎ আসিয়া দাঁড়ায়। কাজ করিতে করিতে হাত থামিয়া যায়, খাইতে খাইতে মুখ বন্ধ হয়; রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে ভাসিয়া উঠে, ঘুম ভাঙিয়া যায়। বাড়ীতে ফিরিয়া চারু দেখিয়াছিল—মা উঠানের উপর পড়িয়া আছে অসাড় নিস্পন্দ, কাদায় সর্বাঙ্গ মাখা, স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টি—শুধু মধ্যে মধ্যে ঠোঁটের দুইটা পাশ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া চীৎকার করিতেছে—হরি-হরি-হরি; হরিবোল। হরি! হরিবোল। হরি!

চারুর মা গিয়াছিল স্নানের ঘাটে।

সেখানে প্রতিবেশিনীরা তাহাকে প্রশ্নে, বিদ্রুপে, তিরস্কারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। বুদ্ধিভ্রংশা নির্বোধ চারুর মা প্রথমটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়াছিল। তারপর অকস্মাৎ একসময় যখন ব্যঙ্গ—বিদ্রূপ গভীর ভাবে তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া তুলিল—মর্ম্মস্থল বিদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতই তখন সে সচেতন হইয়া উঠিয়া সভয়ে পলাইয়া আসিয়াছিল। বাড়ীতে ঢুকিয়া উঠানের উপর সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বাড়ীর ঠিক সম্মুখেই রাস্তার ওপারেই থানা, থানার প্রাঙ্গন হইতে ভাসিয়া আসিতেছে চারুর উচ্চ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

—আমার কোঁকে আছে আমার সাগর ছেঁচা ধন, আকাশের চাঁদ, জল পিণ্ডির আধার!

চারুর মা বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া থর-থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

চারুর বাপ তারস্বরে হরিনাম করিতেছিল—সে চাপা গলায় বলিল—দারোগাবাবু আমাকে বললে, চারুর কাঁটা খসাবার যদি চেষ্টা করিস তবে গুষ্টিশুদ্ধ চালান দেব। বললে—বলিস তোর পরিবারকে—বেটিকে!

চারুর মার কোমর হইতে জলের ঘড়াটা হঠাৎ খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেও পড়িয়া গেল মাটির পুতুলের মত।

চারুর চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল। সে আক্ষেপ করিয়া বলিল—আঃ! সে কি যাতনা মায়ের। হাত পা ছোঁড়ে নাই, মুখে আঃ—উঃ করে নাই, তবু সে কি যাতনা—চোখের দৃষ্টিতে চাউনিতে—দেখেছি আমি। সে চাউনি মনে হয়—এখনও বুঝি মা চেয়ে রয়েছে। দু'দিন বেঁচে ছিল—আমি মাথার শিয়র থেকে নড়ি নাই। পান্নুর চোখ দিয়াও জল গড়াইয়া পড়িল। মায়ের ছবি আজ তাহার মনে স্পষ্ট। তার প্রতি অঙ্গটি মনে পড়িতেছে, প্রতি ভঙ্গিটি মনে পড়িতেছে; কত কথা মনে পড়িতেছে। তাহার মা মরিয়া গেছে!

মৃত্যু সে দেখিয়াছে দুইটা।

একটা নাকুদত্তের ছিন্ন-কণ্ঠ দেহ। অন্যটা দড়ি গলায় বাঁধিয়া ঝুলান রুকণী। তাহার মায়ের চেহারাও কি এমনি হইয়াছিল? উঃ সে কি ভয়ঙ্কর!

চারুই সান্ত্বনা দিয়া বলিল—কাঁদিস না ভাই, কাঁদিস না। কেঁদে কি করবি?

চারুর সেই লোকটি গভীর স্বরে ডাকিয়া উঠিল—গোবিন্দ, গোবিন্দ!

চারু তীব্রস্বরে বলিল—এমন ক'রে গোবিন্দ গোবিন্দ ক'র না তুমি!

লোকটি হাসিয়া বলিল—কেন? কি হ'ল?

—কি হ'ল? চারু স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—কি হ'ল? মনে মনে মানুষ যখন পাপের ফন্দি আঁটে তখনই ডাকে—গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরি-হরি! দুর্গা-দুর্গা! বুড়ো ষাট বছর বয়েস হেমবাবু অহরহ ডাকত—কালী! কালী! দুর্গা! দুর্গা! রাত্রে আমাকে ডাকত। তার সঙ্গী জ্ঞানো-বাবু হরিনাম করত—আমাকে ডাকত রাত্রে। চরণবাবু ওদের চেয়েও বুড়ো—তার ঘরেই সে রেখেছিল—মতি গোয়ালিনীকে।

তারপর সে হাসিয়া উঠিল। বলিল—বাবা, আমার বাবা! দিনরাত হরি-হরি-হরিবোল! যে সব বাবুরা আমার পায়ে গড়াগড়ি যেত, তাদের কাছে বকশিশ নিত। শেষকালে, শেষকালে বাবা কি করলে জানিস পানু?

চারুর বাপ সেই দিনই পলাইয়া গিয়াছিল।

গ্রামের লোক মৃতদেহ সৎকারে কেহই আসে নাই। চারুর বাপের কোনই চিন্তা ছিল না। সে কেবলই হরিনাম করিতেছিল। চারু ভাড়া করিয়া আনিল একখানা গাড়ী। আনিয়াছিল অবশ্য এই লোকটি। একজন ডোমের গাড়ী। সেই গাড়ীতে মৃতদেহটা চাপাইয়া চারু বাপকে বলিয়াছিল—যাও, এইবার যাও।

—আমি? হরিবোল! হরিবোল! আমি পারব না। হরিবোল! হরিবোল!

—সে কি? তুমি পারবে না তো যাব কি আমি?

—তাই যা। হরিবোল! হরিবোল! কে কার সংসারে। হরিবোল, তুই যা।

চারু আর কোন কথা বলে নাই। এই লোকটিকে সঙ্গে করিয়া সে গাড়ীর সঙ্গে গিয়া মৃতদেহটা নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া আর বাপকে দেখিতে পায় নাই। প্রথমটা ভাবিয়াছিল, বোধ হয় কোন নির্জ্জনে বসিয়া সে হরিনাম জপ করিতে গিয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যখন ফিরিল না—তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। কিন্তু খোঁজ কেই বা করিবে? সে নিজেই একবার পথে নামিয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইয়াছিল, কোথায় খোঁজ করিবে?

ঠিক সেই সময়েই এই লোকটি আসিয়া বলিয়াছিল—চাকরীতে আমি জবাব দিয়ে এলাম চারু।

—জবাব দিলে?

—আমি দিলাম না। বাবুই জবাব দিলেন। বললেন—তোমার বদনাম শুনেছিলাম, গ্রাহ্য করি নাই। আজ তুমি সদর রাস্তা দিয়ে ওই মেয়েটার মায়ের মড়া নিয়ে শ্মশানে গেলে? লজ্জা হ'লনা তোমার? এই নাও তোমার মাইনে। আমার বাড়ী থেকে চলে যাও।—চলে এলাম।

চারুও আর দ্বিধা করে নাই—সে সম্ভাষণ জানাইয়া তাহাকে সেই গোধূলিলগ্নে জীবনে আবাহন করিয়া বলিয়াছিল—এস!

বাড়ীর দুয়ারে তাহারা পা দিয়াছে, এমন সময় রাস্তা হইতে কে ডাকিল—কে? কারা?

চারু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিয়াছিল—কেন?

—চারু? শ্যামাদাসের মেয়ে?

—হ্যাঁ। কে তুমি?

—আমি নরোত্তমসিং।

নরোত্তমসিং? তাহাদের গন্ধবেনে সমাজের ধনী ব্যবসায়ী নরোত্তম? নরোত্তমই তাহাদের সমাজের সমাজপতি। কি চায় সে? শাসন করিতে আসিয়াছে? সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়াছিল—কি চাই?

নরোত্তম কাছে আসিয়া বলিল—তোমার বাবা আজ আমাকে এ বাড়ী বিক্রী করেছে।

—বিক্রী করেছে? চারু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

—হ্যাঁ। দুশো টাকা—রেজেষ্ট্রী আপিসে গুনে নিয়েছে। দলিল রেজেষ্ট্রী ক'রে দিয়েছে। এই তার রসিদ। বাড়ীতে সে আজই আমাকে দখল দিয়ে গিয়েছে।

—গিয়েছে? কোথায় গিয়েছে?

—সে জানি না। তবে গাঁ থেকে চলে গিয়েছে। বোধ হয় তীর্থ-ধর্ম্ম করতে যাবে।

চারুর মুখে আর কথা ফুটে নাই।

নরোত্তম বলিয়াছিল—আজ রাত্রে তুমি অবিশ্যি থাকতে পার। কিন্তু কাল সকালেই আমার বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে।

চারু কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—দাঁড়ান।—না—দাঁড়াবেনই বা কেনে? আসুন আমার সঙ্গে। বাড়ীর ভেতরেই আসুন। এস গো—এস। শেষে ডাকিয়াছিল—তাহার নবজীবনে বরণ করা এই মানুষটিকে।

বাড়ীর ভিতর আসিয়া আপনার তোরঙ্গটা লইয়া লোকটির মাথায় তুলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—চল!

নরোত্তমকে বলিয়াছিল—নেন আপনার বাড়ী, আজই এখুনই নেন। চল গো চল।

নরোত্তম অবাক হইয়া গিয়াছিল; তারপর বলিয়াছিল—আজই তো আমি যেতে বলি নাই। আজ তো থাকতেই বলছি।

—বলেছেন। কিন্তু আমি তো আপনার হুকুমের দাসী নই। আমি আজই যাব।

—কিন্তু জিনিষ-পত্র? ঘড়া-ঘটি—বাসন—হাঁড়ি-কুঁড়ি—বিছানা—

—ওসব আমার নয়। আমার এই তোরঙ্গটা আর—হ্যাঁ ভাল মনে করিয়ে দিয়েছেন—এই পুরু তোষক বিছানা আমি করিয়েছিলাম। ওটা নিতে হবে। বাকী যা সব থাকল। ইচ্ছে হয় ফেলে দেবেন। দয়া হয় রেখে দেবেন। দাদা আছে কাতরাদের কয়লা কুঠিতে—জানেন তো? আমাদের গাঁয়ের বাবুদের সঙ্গে খানসামার কাজ করতে গিয়েছে! সে এলে তাকেই দেবেন। না হয় তো—বাড়ী কিনেছেন, ওগুলো ফাউ হিসেবে নেবেন। চল গো চল।

বাক্স বিছানা মাথায় ক'রে দু'জনে—পথে এসে দাঁড়ালাম ভাই। অন্ধকার রাত। দুনিয়াতে কোথা যাব, কি করব কিছু ঠিক নাই। আমি বল্লাম চল। চলতো বটে। কিন্তু কোথা চল তার কিছু ঠিক নাই। শেষে ও বললে দাঁড়াও। একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে আনি।

গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহারা দুইজনে সেই অন্ধকার রাত্রে যাত্রা করিয়াছিল। চারু বলিল—সেই আঁধার রেতে মনে হ'ল যেন যমের বাড়ী চল্লাম। গাড়োয়ান গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। সে জানে, গাড়ী ভাড়া ক'রে লোকে ইষ্টিশানে যায়। সে—সেই পথেই গাড়ী ছেড়েছে। গরু দুটো ঠুক-ঠুক ক'রে চলছে। পথে জন-মনিষ্যির দেখা নাই, সাড়া নাই। শেষে গাড়ী যখন ইষ্টিশানে এল তখন রাত তিন পহর। গাড়োয়ান বললে—নাম। আমরা নামলাম! ইষ্টিশান দেখে মনে হ'ল বাঁচলাম। ভাড়ার ওপরে গাড়োয়ানটাকে আমি দু'আনা পয়সা বেশী দিয়েছিলাম জলখাবার জন্যে। সেই যেন পথ দেখিয়ে দিলে—ধরিয়ে দিলে।

চারু চুপ করিল।

—তারপর কত জায়গা ঘুরলাম! এখান, ওখান। আমার খোকা হ'ল।

রাজপুত্তুর মত খোকা! সেই খোকা আমার দেড় বছরের হয়ে মারা গেল। ছিলাম রামপুরহাটে। ঘর দোর করেছিলাম। সেখান থেকে এলাম এখানে।

আবার সে স্তব্ধ হইল। এ-স্তব্ধতা আর ভাঙিতে চায় না। দর-দর ধারে চারুর চোখ দিয়া শুধু জলই গড়াইতেছিল, এতটুকু শব্দ মুখ দিয়া ফুটিল না। তাহার সে খোকার জন্য এমন কান্নাই সে চিরদিন কাঁদিয়াছে, সেই প্রথম দিন হইতেই। এ বোধ তাহার জাগ্রত বুদ্ধি-বিচার করা বোধ নয়, সে বিলাপ করিয়া তাহার দুঃখ ঘোষণা করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।

বহুক্ষণ পর লোকটি বলিল—ওঠ। আর কেঁদো না। পানুকে ফিরে পেলে; ওকে যত্ন কর। কিছু খেতে দাও। তারপর নিজে হাতে সাবান মাখিয়ে ওকে চান করাও দেখি।

স্নান করিয়া পানুর মনে হইল—সে যেন নূতন মানুষ হইয়াছে। এ-যেন নূতন জীবন।

এগার

স্নান করিয়া মনে হইয়াছিল, সে নূতন মানুষ হইয়াছে। হা-ঘরের জীবন ঘুচিয়া আবার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। ঘটনাটা আজ হইতে দীর্ঘকাল পূর্ব্বের ঘটনা।

আজ পানুর বয়স প্রায় চল্লিশ। হা-ঘরেদের সংশ্রব হইতে পলাইয়া যখন আসিয়াছিল তখন সে সদ্য জোয়ান। বয়স তখন ষোল কি সতের। তেইশ-চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। ঘটনাগুলি তাহার মনে পড়িয়া গেল বলিলে ঠিক হইবে না। চোখের সম্মুখে যেন সব ছবির মত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া একটির পর একটি পর পর ভাসিয়া গেল।

হঠাৎ তাহার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। নূতন জীবন না ছাই। তুলনা করিয়া দেখিলে হা-ঘরের জীবন এর চেয়ে ভাল ছিল। অনেক ভাল। তাহাদের মধ্যে থাকিলে সে এ জীবনের অপেক্ষা বহুগুণে সুখী হইতে পারিত। জমিদারের প্রজা নয়, মহাজনের খাতক নয়,—জাত-জ্ঞাতের বালাই নাই, ঘর-দুয়ারের ঝঞ্ঝাট নাই, জমিজেরাত লইয়া মামলা নাই, সে জীবন এর চেয়ে অনেক ভাল। হাজার, লক্ষ গুণে ভাল। কতবার সে ভাবিয়াছে, এসব ছাড়িয়া আবার সে বাহির হইয়া পড়ে তাহাদের সন্ধানে। কিন্তু আশ্চর্য্য মমতা ঘরদুয়ার, জমিজেরাত এবং এই সব মানুষগুলির, যাহাদের কোনক্রমেই সে আপনার করিতে পারিল না, সে নিজেও যাহাদের আপনার হইতে পারিল না। যাহাদের অত্যাচারে অবিচারে সে জীবনে ঘর বাঁধিয়াও হা-ঘরের মত বারবার ঘর বদল করিয়াছে।

পানুর এই ঘর-দুয়ারই চতুর্থতম নীড়। ইহার পূর্ব্বে সে আর তিন জায়গায় ঘর পাতিয়াছিল। কিন্তু ওই গ্রামের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া অথবা জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া সে সব ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। ওই দিদির সঙ্গেই কি বনিল? তাও বনে নাই। সেও অবশ্য জীবনে কোন দিন কাহাকেও ক্ষমা করে নাই। কেন সে ক্ষমা করিবে? লোকে তাহার উপর অত্যাচার করিলে সে তাহার শোধ লইবে না কেন? মানুষ, জানোয়ার, এমন কি পাখীকেও সে কোন দিন ক্ষমা করে নাই। কত কাক যে তাহার বাঁটুলের আঘাতে লুটাইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন জিনিষ রৌদ্রে দিয়াছে, কাক আসিয়া তাহাতে মুখ দিল, একবার তাড়াইয়া দিল—দুইবার, তিনবারের বার পানু বাঁটুলের ধনুকটা লইয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে হানিল মাটির গুলি; কাকটা সঙ্গে সঙ্গে লুটাইয়া পড়িল। সে কাকটা মরিতেই কাক সম্প্রদায়ের স্বভাবধর্ম্ম অনুযায়ী ঝাক বাঁধিয়া কাকগুলা কলরব আরম্ভ করিল; পানুরও বাঁটুল ছুটিতে আরম্ভ করিল। একটার পর একটা করিয়া কাক মরিল।

কুকুর সে ভালবাসে। নিজের পোষা কুকুর তাহার আছে। কিন্তু অন্য কুকুর আসিয়া কোন কিছুতে মুখ দিলে তাহার রক্ষা নাই, সে তাহাকে দুর্দ্দান্ত প্রহার করে; নিষ্ঠুর কৌতুকে পিছনের পা দুইটা ধরিয়া বন-বন শব্দে পাক দিয়া ছাড়িয়া দেয়, হতভাগ্য জানোয়ারটা ছিটকাইয়া গিয়া পড়ে।

কিন্তু আজ তাহার এ কি হইল? এই বাছুরটাকে আঘাত করিয়া সমস্ত অন্তরাত্মা যেন হায়-হায় করিয়া উঠিল, তাহার বুকের মধ্যে যেন একটা ভূমিকম্পের কম্পন বহিয়া যাইতেছে।

শরৎকালের দুপুর বেলা।

পূজা চলিয়া গিয়াছে। আশ্বিনের শেষ। পৃথিবীর বুক গাঢ় সবুজ রঙে ভরিয়া উঠিয়াছে, আকাশ গাঢ় নীল। রৌদ্রের রঙ আতসী কাচের মত ঝলমল করিতেছে। গাছের পাতায় পাতায় সে প্রভার দীপ্তি, দূর্ব্বার অগ্রবিন্দুগুলি পর্য্যন্ত রৌদ্রচ্ছটায় সবুজ মণিকণার মত মনে হইতেছে। এই সবুজের নেশা পানুর বড় ভাল লাগে। তাহার মনে হইল সব যেন কালো কুৎসিৎ হইয়া গিয়াছে। বাছুরটা ততক্ষণে তাহার হাত চাটিয়া অনেকখানি যেন সাহস পাইয়াছে। সে পানুর মুখের দিকেই চাহিয়া আছে। তাহার কালো চোখটার উপর মধ্যদিনের সূর্য্য একটি বিন্দুর আকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্বলিতেছে।

পানু গভীর মমতার সহিত বাছুরটার পাঁজরাগুলির উপর হাত বুলাইয়া দিল। তারপর সে সযত্নে বাছুরটাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাছুরটা মাটির উপর পড়িয়া গেল। পিছনের একটা পা বোধহয় একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে।

পানু এবার বাছুরটাকে কোলে তুলিয়া দাওয়ার উপর শোয়াইয়া দিল। তারপর সে আনিল একটা বড় বাটি পরিপূর্ণ করিয়া ভাতের মাড়। তাহাতেও তাহার পরিতৃপ্তি হইল না। সে আর একটা বাটি ভরিয়া দুধ আনিয়া দুধে মাড়ে মিশাইয়া বাছুরটার মুখের কাছে ধরিল। বাছুরটা একবার তাহার

দিকে চাহিল, তারপর বাটির শূন্য বস্তুটা শুঁকিল ; একবার জিভ দিয়া লেহন করিয়া দেখিল, শেষে গ্রীষ্মকালের বালিতে যেমন করিয়া জল শুষিয়া লয়, জলের ভিজা দাগটুকু পর্য্যন্ত যেমন ভাবে মিলাইয়া যায় তেমনি ভাবেই বাটির দুধ-মেশানো মাড় খাইয়া শেষ করিয়া চাটিয়া মাড় ও দুধের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিল। বহুদিন বোধ হয় এমন করিয়া কোন সুস্বাদু পানীয় খাদ্য খাইতে পায় নাই। কে জানে, কেমন করিয়া নিঃশেষ করিয়া হতভাগ্য জীবটার মাতৃস্তন্য গৃহস্থেরা দোহন করিয়া লয়। সন্ধ্যা হইতে বাছুরটা বাঁধা থাকে—সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়, তৃষ্ণায় ক্ষুধায় বাছুরটা চেঁচায় ; দূরে বাঁধা থাকে তাহার মা ; স্তন্য ক্ষীরভারে তাহার স্তনভাণ্ডের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতে চায়—শিরাগুলো টন-টন করে—সেও স্নেহের বেদনায়, দৈহিক যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া শাবককে ডাকে, শাবকের ডাকের সাড়া দেয়। রাত্রি শেষ হয়, মানুষ আসিয়া বাছুরটাকে আনিয়া বারেকের জন্য মাতৃস্তন্য লেহন করিতে দেয়। মাতৃস্তন্য-ভাণ্ডে—উথলিয়া উঠে শুভ্র ফেনিল ক্ষীর-সমুদ্র, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বাছুরটাকে টানিয়া ধরে, তারপর সেই উচ্ছ্বসিত ফেনিল দুগ্ধ ধারার শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিয়া লয়। বাছুরটা ইহার পর নিঃশেষিত ক্ষীর মাতৃস্তনে মুখ দিয়া—আঘাতের পর আঘাত করে, যেন মাথা কুটিয়া মরে, কিন্তু এক বিন্দুও পায় না। আবার দিনের অগ্রগতির সঙ্গে মাতৃস্তনে দুধ জমিতে সুরু হয় ; মানুষ আবার শাবকটাকে সরাইয়া আনিয়া বাঁধে। অপরাহ্নে আবার একবার দোহন করিয়া লয়। তাহারই মায়ের দুধে মানুষের দেহ নধর হইয়া উঠিতেছে আর তাহার কচি লাবণ্য শুকাইয়া অস্থিপঞ্জর সার হইয়া গিয়াছে।

আঃ—এখনও বাছুরটা জিভ দিয়া আপনার মুখ ঠোঁট চাটিতেছে।

পানুও সেদিন এমনি ভাবে আপনার উচ্ছিষ্ট-মাখা হাতখানা বারবার চাটিয়াছিল।

সেদিন অর্থাৎ চারুর বাড়ীতে যেদিন সে প্রথম ফিরিয়াছিল সেইদিন। স্নান করিয়াছিল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া। দিদি একখানা সাবান দিয়াছিল। সাবান ঘষিয়া শরীর হইতে সে কি ক্লেদ বাহির হইয়াছিল।

দিদির সেই লোকটি—তাহার নাম দীনু, দীননাথ। দীননাথ হাসিয়া বলিয়াছিল—তেল মাখ হে। নইলে শরীর একেবারে চড়-চড় ক'রে ফেটে যাবে।

সাবান মাখা শেষ করিয়া তেল মাখিয়া আবার সে স্নান করিয়াছিল। সে যে তাহার মুক্তিস্নান। সভ্য সমাজের মধ্যে জন্মিয়া—তের-চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত সেই সমাজের মধ্যে মানুষ হইয়া তাহার সুখ-দুঃখের সঙ্গে বত্রিশ বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছিল, ঘর-বাড়ী, সংসার, ঘোমটা দেওয়া টুক-টুকে বউ; বারমাসে তের পার্ব্বণ, দুর্গা-কালী-কার্ত্তিক-ঠাকুর, যাত্রা-পাঁচালী-গান; বাংলা বুলি, ধানে ভরা ক্ষেত, মরাই ভরা খামার, পৈত্রিক বেনেতির দোকান—এই সব লইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের যে কল্পনা ওই চৌদ্দবৎসরের মধ্যেই [illegible] মূল দুর্ব্বার মত তাহার মনের ক্ষেত্রে জন্ম নিয়াছিল—সে কল্পনা—ওই যাযাবর জীবনের দীর্ঘ দুই বৎসরের প্রখর গ্রীষ্মেও মরিয়া যায় নাই। উপরের লতা জাল শুকাইয়া গিয়াছিল, রুকনী তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল, তবুও মনের ক্ষেত্রের গভীর তলদেশে তাহার মূলজাল ছিল অমর হইয়া। তাই যে মুহূর্ত্তে আবার সে ফিরিয়া আসিল তাহার দিদির ঘরে, [illegible]ালীয় সংসারে—সজল বর্ষার মত যাহার রূপ—সেই মুহূর্ত্তেই আবার ক্ষেত্রের উপর দেখা দিল দূর্ব্বা জালের সবুজ অঙ্কুর কণা। স্নান করিয়া সে বলিয়াছিল—বাঁচলম গো দিদি! আরে বাপরে, কি গর্দ্দা! আঃ—মন লিছে কি নতুন মানুষ হলম আমি।

তারপর তাহার দিদি তাহাকে খাইতে দিল। ভাত, ডাল, তরকারী,

অবল। তাহার মাংসাশী রসনা যেন অমৃতের আস্বাদ পাইল। সে সেদিন রাক্ষসের মত আহার করিয়াছিল।

চারু বলিয়াছিল,—আর খাস না পানু, অসুখ করবে।

দীনু ধমক দিয়াছিল—আঃ। না-না-খাও, তুমি পেট ভরে খাও।

লজ্জিত হইয়া পানু তাহার হাতখানা চাটিতে চাটিতে উঠিয়া গিয়াছিল। ওই বাছুরটা যেমন বারবার জিভ দিয়া মুখ চাটিতেছে, তেমনি করিয়াই সে হাত চাটিয়াছিল।

ধীরে ধীরে আবার তাহার মনের ক্ষেত্র সবুজ দূর্ব্বার আস্তরণের মত কত আশা আকাঙ্খার জটিল জালে ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটা এমন ভাবে জড়িত যে, একটাকে ধরিয়া টান দিলে সমস্ত লতার জালটাতেই টান পড়ে।

প্রথম টান সে অনুভব করিল কয়েক দিন পরেই। টান দিল, তাহার দিদি।

সে নিজেই দিদির সংসারের কতকগুলা কাজ গ্রহণ করিয়াছিল। বাড়ীতে দুইটা গরু ছিল,—পানু সেই দুইটার সেবা লইয়া পড়িল। ঘরের কাঠ কাটিত। ময়ূরাক্ষীর পার-ঘাটার উপর বাজার জায়গা, কাঠের গুঁড়ি কিনিতে হয়; মজুর লাগাইয়া সেই কাঠ খানা-খানা করিয়া লওয়ার রেওয়াজ। পানু বলিল—উ হামি করবে। কুলাঢ় দে দিদি!

একা সে প্রায় দেড়টা মজুরের উপযোগী কাঠ চেলা করিয়া ফেলিল।

দীনু লোকটি অদ্ভুৎ। সে বার বার বারণ করিল—আর থাক। আর থাক।

পানু নিজের শক্তি দেখাইয়া তাহাদের বিস্মিত করিয়া দিতে চায়, আপনার সকল শক্তি প্রয়োগে কাজ করিয়া অকৃত্রিম আত্মীয় হইতে চায়, সে হাসিয়া বলিল—না—না, পারব, হামি অনেক পারব। আরও পারব।

চারু বলিল—হ্যাঁ, পানু পারবে। দেখনা তুমি। শরীর দেখছ না!

পানুর দেহ গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিল।

পরের দিনই সে কুড়ুল কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া গেল। কাহাকেও কিছু বলিল না। ময়ূরাক্ষীর তট-ভূমিতে সুদীর্ঘ ঘন জঙ্গল, বড় বড় গাছ; সেই জঙ্গলে চলিয়া গেল। জঙ্গল দেখিয়া সেদিন মনে পড়িয়াছিল যাযাবর জীবনের বন্য আস্বাদের তৃপ্তি। রুকণীকে মনে পড়িয়াছিল। ওই রুকণীর স্মৃতিই সেদিন তাহাকে তাহার যাযাবর আত্মীয়দের বিরহবেদনাকে লাঘব করিয়া দিল। রুকণী নাই, সেখানে আর কি সুখ আছে? বুড়া কাঁদিতেছে, বুড়ী কাঁদিতেছে, তাহাদের জন্য তাহারও চোখে জল আসিল। কিন্তু বুড়াবুড়ী কয়দিন? তাহার পর? তাহার পর কোন্ সুখ সে সেখানে পাইত? সে জঙ্গলের একটা প্রাচীন গাছের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বুড়া হা-ঘরে—ওস্তাদ লোক—তাহাকে অনেক শিখাইয়াছিল; সেই শিক্ষা হইতে পানু জটিল লতাজালে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড বড় গাছটাকে দেখিয়াই বুঝিল—এইখানে থাকেন জঙ্গলকে দেও, বনের দেবতা।

সে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেওতাকে প্রণাম করিল। বুড়ার শিখানো মন্ত্র পড়িল। তারপর বলিল—হে দেওতা! হে বাপা! তুমি বুড়া-বুড়ীকে দয়া করিয়ো—তাহাদের দুঃখে তুমি দেখিয়ো, আমার জন্য রাত্রে যখন বুড়া-বুড়ীর চোখে নিদ আসিবে না, জাগিয়া দু'জনে কথা বলিবে আর কাঁদিবে—তখন তুমি ফুর-ফুর করিয়া বাতাস দিয়া তাহাদের চোখে নিদ আনিয়া দিয়ো। যখন তাহাদের অসুখ করিবে তখন হে জঙ্গলকে দেও, হে বাপা—তুমি চোখের সামনে তাহাদের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়ো শিকড়-জড়ি। কিম্বা সামনের মাটিতেই গাছ হইয়া থাকিয়ো—যেন তাহারা দাওয়াই পায়। আর হে জঙ্গলকে দেও,—হে বাপা, আমার কসুর তুমি মাফ্ করিয়ো বাপা। আমি দল হইতে পালাইয়াছি—রুকণী নাই, আমি পালাইয়া আসিয়াছি। আমি তো হা-ঘরে নই, আমি ঘর-সংসারী জাতের ছেলে আমি ঘর-সংসারে

আসিয়াছি তবুও আমি তোমাকে ভুলিব না। তোমার পূজা আমি করিব। তোমাকে পরণাম আমি করিব। আমার কসুর তুমি মাফ্ করিয়ো। আমার দিদির ঘর তোমার জঙ্গলের কাঠে ভরিয়া দিয়ো। তোমার লতার ফুল দিয়ো, আমি সাদী করিয়া আমার পিয়ারীর চুলে পরাইয়া দিব। তোমাকে পরণাম করছি বাপা।

তারপর সে অন্য একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখিয়া সেইটার উপরে উঠিয়া বড় একটা ডাল কাটিয়া ফেলিল। প্রকাণ্ড ডাল। সে ডাল বহিতে কয়েকখানা গাড়ীরই প্রয়োজন। পান্থ ডালটার খানিকটা অংশ কাটিয়া লইয়া কাঁধে বহিয়া বাড়ী ফিরিয়া ভুম করিয়া ফেলিল।

—এ কি? এ কোথেকে আনলে? জিজ্ঞাসা করিল দীনু।

—জঙ্গলসে। গামছা দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া পান্থ বলিল—থোড়া পানি।

চারু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—ওইটা তুই জঙ্গল থেকে কাঁধে ক'রে আনলি?

পান্থ অহঙ্কার করিয়া বলিল—হাঁ। আনলম। আওর বহুত কাঠ আছে দিদি—আমব। রোজ লিয়ে লিয়ে আসব। থোড়া পানি—জল দিদি।

জলের কথাটি চারু আমলেই আনিল না। বলিল—তোকে নিয়ে তো আমার বিপদ হ'ল পান্থ। জঙ্গল সরকারের। জঙ্গলে মহলদার আছে। ধ'রে যখন থানায় দেবে, তখন আমাদের নিয়ে টানাটানি করবে যে। এ তোমার হা-ঘরের দল নয় যে, এল—দু'দিন থাকল দুটো কাঠকুটো কাটলে—মহলদার কিছু বললে না। এ দেখলেই পুলিশে দেবে।

পান্থ পুলিশকে আর ভয় করে না। তবু তাহার মনে একটা সুপ্ত ভয় আছে। সে বিস্মিত এবং ঈষৎ আতঙ্কিত হইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দিদি বলিল—আমার সুসার ক'রে তোমার কাজ নাই। ওসব করলে ভাই আমার ঘরে তোমাকে ঠাঁই দিতে পারব না।

দীনু বলিল—আঃ কি বলছ? ওকে সে বুঝিয়ে দোব পরে। এখন বেচারা জল চাইছে—জল দাও।

পানু অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিল—দিদির কথায় সে একটু বেদনাও অনুভব করিল। মনে পড়িল হা-ঘরের দলের কথা।

চারু গজ-গজ করিতে করিতে একটা ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া বলিল—নে—হাত পাত।

দীনু বলিল—একটা কিছুতে ক'রে দাও না।

—কিছুতে ক'রে? আমার বাসনে ওকে খেতে দোব নাকি? ওর কি জাত আছে? হা-ঘরের দলে কি না খেয়েছে? মায়ের পেটের ভাই বলে—ওর দায়ে জাত-ধর্ম্ম সব জলাঞ্জলি দোব নাকি?

পানুর বুকে কথাটা তীরের মত গিয়া বিঁধিয়াছিল। দিদি বলিতেছে তাহার জাত নাই। তবে সে দিদির ভাই কি করিয়া হইবে? তবে সে কেন ফিরিল?

দীনু নিজে একটা টোল খাওয়া কলাই উঠিয়া যাওয়া ইষ্টিলের গেলাস আনিয়া দিয়া বলিল—পানু, এইটাতে তুমি জল খাবে।

চারু বলিল—খাবে, কিন্তু ওটা বাইরে রাখবে। আমাদের বাসনের সঙ্গে ঠেকাবে না।

জল খাইতে গিয়া পানুর চোখের জল গেলাসের জলের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

বারো

সেই ইষ্টিলের গেলাসটা আজও তাহার কাছে আছে। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রাখিয়া দিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকেই সে ঘৃণা করে, কিন্তু দিদির উপর ঘৃণা তাহার সব চেয়ে বেশী। না। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে ঘৃণা করে না। দিদির সেই মানুষটি, সেই দীনুকে সে ভালবাসে। আরও ভালবাসে সেই হা-ঘরেদের। সেই ওস্তাদ বুড়া, সেই বুড়ী আর রুকণী। আঃ, রুকণী যদি না মরিত তবে সে কখনই আবার ফিরিয়া এই স্বার্থপর বদমাইস মানুষগুলার মধ্যে আসিত না। কখনই না। রুকণী! রুকণী! তাহার রুকণী! রুকণীকে তো সেই নিজে মারিয়া ফেলিয়াছে। রুকণী তো তাহারই ছিল। সে তো তাহার পানুয়াকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসিত; একথা সে নিজেই তো সকলের চেয়ে বেশী জানে। রুকণীর দোষ, রুকণী একমাত্র তাহাকেই ভালবাসে নাই। অল্প খানিকটা ভালবাসা সে অন্যকে দিয়াছিল। পানু নিজে তাহার জীবনে বেশ করিয়া বুঝিয়াছে, রুকণীর মত অন্যকে অল্প খানিকটা ভালবাসা দিবার জন্য প্রাণ কতখানি ব্যাকুল হয়! সে নিজে এই বয়সে চার বার বিবাহ করিয়াছে, একটা মরিয়াছে, একটা পলাইয়াছে, এখনও দুইটা ঘরে রহিয়াছে। তবুও কত নারীর সঙ্গে সে হাস্য-পরিহাস করে, কতজনের সঙ্গে দুই-এক রাত্রি আনন্দ উপভোগ করিয়াছে। পরিবার দুইটার প্রায় চোখের সামনেই তো এসব করে সে! তবে? তবে কেন সে রুকণীর ওই ব্যবহারে এমন করিয়াছিল? এ কথাটা আজ তাহার হঠাৎ মনে হইল। অন্য সময়ে রুকণীর কথা মনে হইলেই মন তাহার উদাস হইত, সে কাঁদিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ত্রীদের সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিত। তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিত। স্ত্রীদের কেহ কাহারও সহিত হাসিয়া কথা বলিলে তখন দুর্দান্ত প্রহারে তাহাকে শাস্তি দিত। ঘরে বন্ধ করিয়াও রাখিত।

আজ ওই বাছুরটাকে আঘাত করিয়া তাহার এ কি হইল কে জানে, রুকণী-কথা মনে হইতেই তাহার মনে হইল ওই কথা! সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

রুকণী মরিয়াছে সে দুঃখ তাহার যাইবার নয়। কিন্তু তাহার দিদি যদি তাহাকে এমন কঠিন দুঃখ না দিত তবে সে এমন দুর্দ্দান্ত ক্রোধী হইত না। তাহার নিজের জীবনের চেহারাটা যেন এই মুহূর্ত্তে তাহার চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কত মানুষকে যে সে মারিয়াছে! চড় চাপড় মারার হিসাব নাই, লাঠির আঘাতে এত জনের রক্তপাত সে করিয়াছে তাহার হিসাব যেন স্পষ্ট হইয়া অঙ্কের যোগফলের মত পানুর চোখের সামনে ভাসিতেছে। প্রথমেই সে মারিয়াছিল—লাঠি মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল, দিদির ও দীমুর গুরুঠাকুরের। তাহার নিজেরও গুরুঠাকুর ছিল সে।

ওই জল খাওয়ার ঘটনা হইতেই ঘটনাটার উদ্ভব। দীমু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ভাঙা তোবড়ানো ইষ্টিলের গেলাসটা দিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার মনের দুঃখ গেল না। কেমন করিয়া সে তাহার জাত ফিরিয়া পাইতে পারে এই ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিল। জাত ফিরিয়া পাইলে সে তাহার দিদিকে ফিরিয়া পাইবে। দিদি তাহাকে ছুঁইলে স্নান করিবে না। পিঠে গায়ে হাত বুলাইয়া দিবে। তাহার মায়ের পেটের দিদিকে সে সত্য সত্য ফিরিয়া পাইবে!

কিছুক্ষণ বাড়ীর বাহিরে বসিয়া থাকিয়া সে গিয়াছিল বাজারে। দুপুর বেলা। বাজারে লোক-জন, বেচা-কেনা কম। একজন বুড়া-দোকানী সুর করিয়া কি পড়িতেছিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহার বাবাও সন্ধ্যা বেলায় এমনি করিয়া রামায়ণ পড়িত। দীর্ঘদিন হা-ঘরেদের দলে থাকিয়া অন্যান্য পুরাণ কাহিনী অনেক গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রামায়ণটা মনে আছে। হা-ঘরেদের দলে রামনাম আছে। সীয়ারাম সীয়ারাম ধ্বনি

তাহাদের মুখস্থ। সে দাঁড়াইল। দোকানীর সুরেলা কথাগুলির মধ্য হইতে রামনামটা কয়েক বার কানে আসিয়া ঢুকিল। মুদী পড়িতেছিল—

মনুষ্য গো-হত্যা আদি যত পাপ করে।
একবার রামনামে সর্ব্বপাপ হরে॥
মহাপাপী হইয়া যদি রামনাম কয়।
সংসার সমুদ্র তার বৎস-পদ হয়॥

পানু বসিল।

মুদী সুর করিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত কথার অর্থ না বুঝিলেও শুনিতে শুনিতে মনের মধ্যে অতীত কালের শোনা গল্প ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। মনে পড়িল, চোর রত্নাকর নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল, সে মানুষ মারিত। তারপর একদিন ছলনা করিয়া ব্রাহ্মণের বেশে তাহার কাছে আসিল নারদমুনি। ব্রহ্মাকে তাহার মনে পড়িল না। মুদী বারবার ব্রহ্মার নাম করিল—পানুর মনে মনে নামটা চেনা মনে হইল, কিন্তু সে যে কে, সঠিক ঠাওর করিতে পারিল না। কিন্তু নারদমুনিকে তাহার মনে আছে। যাত্রার দলে, পাঁচালীর দলে কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। ঢেঁকিতে চড়িয়া যায়, ঝগড়া বাধাইয়া বেড়ায়, একতারা লইয়া গান করে। পাকা চুল, পাকা দাড়ী নারদকে তাহার মনে আছে।

নারদমুনি রত্নাকরকে রাম-নাম দিয়াছিল। যে মহাপাপ রত্নাকর করিয়াছিল সেই পাপক্ষয়ের জন্য রামনাম দিয়াছিল। রত্নাকরের মনে কিন্তু কিছুতেই রাম-নাম আসে না। শেষে অনেক কষ্টে বলিল মরা। মরা মরা বলিতে বলিতে আসিল রাম রাম রাম রাম।

মুদীও পড়িল—

"মরা মরা বলিতে আইল রাম নাম।
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥
তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রাম নামে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়॥"

পান্নু পরম আশ্বাস পাইয়া বাঁচিল। সে রাম রাম সীতারাম জপ করিতে করিতে ময়ূরাক্ষীর নির্জ্জন তটভূমিতে গিয়া সে-দিন সমস্ত অপরাহ্ণ বেলাটা অবিরাম উচ্চ-কণ্ঠে চীৎকার করিয়াছিল—রাম রাম সীতারাম। তারপর সন্ধ্যায় সে ময়ূরাক্ষীতে আবার একবার স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিল।

চারু ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল—বলি আবার গিয়েছিলি কোথা?

দীনু আলো জ্বালাইয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছিল। সে হাসিয়া সস্নেহে বলিয়াছিল,—কি হে, গিয়েছিলে কোথা? আবার চান করলে যে?

চারু বলিল—করবে না! শরীরে ওর ডাহ' কত! কত অখাদ্যি কুখাদ্যি খেয়েছে—শরীর একেবারে গরম হয়ে আছে।

পান্নু ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল দীনুর কাছে।

চারু অহরহই গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত। সে ঘরের মধ্যে যাইতেই পান্নু মৃদুস্বরে দীনুকে বলিয়াছিল—আজ হামার সব পাপ গেল। বহুৎ বললম—রাম-রাম রাম-রাম—সীতারাম-সীতারাম-সীতারাম।

দীনু তাহার মুখের দিকে চাহিল।

পান্নু আবার বলিল—হামার জাত তো আমি পেলম। হামার পাপ তো গেল!

দীনু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছু ভাবিতেছিল।

পান্নু তাহার হাতের বইটার দিকে আঙুল দেখাইয়া প্রশ্ন করিল—রামায়ণ? বলিয়া সে অসঙ্কোচে বইটা লইয়া খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু কালো গুটি গুটি চিহ্নগুলার একটাকেও চিনিতে পারিল না।

দীনু বলিল—যাও, কাপড় ছাড়। তোমার জাতের ব্যবস্থা করছি।

পান্নু ও কথাটা বিশেষ বুঝিল না। কিন্তু বইখানার অক্ষরগুলা চিনিতে না পারিয়া অত্যন্ত বেদনাবোধ করিল। মনে পড়িল তাহার স্কুল জীবনের কথা। কত বই, কত ছবি, কত গল্প, কত ছড়া—বই খুলিয়া সে পড়িত।

অনেক গল্প অনেক ছড়া তাহার মনে আছে। কিন্তু আখরগুলা দিদির মত পর হইয়া গেল না কি?

পরদিন বাজারে গিয়া তাহার চোখে পড়িল একটা মনিহারীর দোকানে কতকগুলা রঙচঙে বই। বইগুলাকে চেনা মনে হইল। একটা বই লইয়া খুলিয়াই সে আনন্দে অধীর হইয়া গেল। রঙচঙে বইটার প্রথম পাতাতেই বড় বড় হইয়া বিচিত্র বর্ণে ফুটিয়া আছে—অ-আ-ই-ঈ। দেখিবামাত্র সে চিনিল। যেমন দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল তাহার দিদির মুখ, যেমন দেখিবামাত্র চিনিতে পারিবে তাহার বাপের মুখ—তাহার মরা মা যদি আজ ফিরিয়া আসে তবে তাহার মুখও যেমন দেখিবামাত্র সে চিনিতে পারিবে—তেমনি ভাবেই সে চিনিতে পারিল—অ-আ-ই-ঈ।

সে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল—কতনা দাম?

দোকানী বলিল—দু' আনা।

গেঁজলে খুলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে বইখানা কিনিয়া বাড়ী ফিরিল। সে-দিন দুপুর বেলায় আবার সে ময়ূরাক্ষীর নির্জ্জন তটভূমিতে তন্ময় হইয়া সে বইখানার মধ্যে ডুবিয়া গেল। একে একে সব মনে পড়িল। চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলাকে আয়ত্ত করিয়াছিল—দুই আড়াই বৎসরের অপরিচয়ে তাহার উপর সামান্যই বিস্মৃতির আবরণ পড়িয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সেগুলা কাটিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। তখন সে পড়িতেছিল—জল পড়ে, পাতা নড়ে।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় দীনু তাহাকে বলিল—পানু তোমার ব্যবস্থা করলাম হে। আমাদের গুরু গোঁসাই আসছেন, তুমি ভেক নাও; আমরাও বোষ্টম হয়েছি, তুমিও ভেক নাও। নিলেই সব গোল মিটে যাবে।

বোষ্টম? বোষ্টম? মনে পড়িল তিলক কাটিয়া মালা পরিয়া বাবাজীরা ভিক্ষা করিতে আসিত। মন্দিরা বাজাইয়া গান করিত। সে গানেরও খানিকটা মনে আছে।

হরিনামের গুনে গহন বনে ডাকলে নিতাই পার করে।

কয়েকদিন পরেই গুরুঠাকুর আসিলেন। পানুর মাথা মুঁড়া করিয়া দেওয়া হইল। গলায় মালা পরাইয়া দিল। তিলক ছাপ দিল কপালে। পানু বোষ্টম হইয়া গেল।

(খ)

পানুর দিদি তাহাকে স্পর্শ করিল। কিন্তু তবু খাইতে দিবার সময় খাইতে দিল পাতায়। পানুর উৎসাহ আনন্দ যেন নিভিয়া গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যা বেলা। দীনু তাহাকে বলিল—এস হে পানু, নদীর ধারে গুড়ের গাড়ী এসেছে দেখে আসি। পানু তাহার সঙ্গে গেল। পথে দীনু তাহাকে কত কথা বলিল; বলিল—ভিয়েনের কাজ শেখ। তারপরে নিজে দোকান কর, বিয়ে কর। ঘর সংসার হোক।

মানুষটির সঙ্গে পানকুর সেই বুড়া ওস্তাদের মিল আছে। সেও এই সব কথা বলিত। দীনুকে তাহার বড় ভাল লাগিল।

নদীর ধারে গুড়ের গাড়ী আসিয়াছে। দোকানীরা ভিড় করিয়া ঘেরিয়া বসিয়াছে। এখন গুড় কিনিয়া রাখিবে। গোটা বৎসর এই গুড় হইতে খুড়কী পাটালী তৈয়ারী করিয়া বেচিবে। দীনুও কিনিয়া ফেলিল কয়েকটা টিন।

পানুকে বলিল—ওহে, একটা কাজ যে ভারী ভুল হয়ে গেল। ভার বইবার বাঁকটা আনলে তুমি দুটো টিন নিতে, আমি একটা নিতাম। যাও একটা টিন বাড়ীতে রেখে তুমি বাঁকটা নিয়ে এসো।

পানু বাড়ীতে ফিরিয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। তাহার দিদিকে ওই গুরুঠাকুরটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছে। দিদি ছাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না। পানুকে দেখিয়াই গুরুঠাকুর চারুকে ছাড়িয়া দিল! চারু তাড়াতাড়ি একটা ঘরের মধ্যে

ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু পানুর মাথায় তখন রক্ত চড়িয়া গিয়াছে। সে কাঁধের টিনটা নামাইয়া একটা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। গুরুঠাকুর তখন নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। 'হরিবোল' বলিয়া উপরের দিকে চোখ তুলিয়া কেবলই নাচিতেছে। সেদিন পানু বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু আজ সে বুঝে, গুরুঠাকুর অপরাধটা ঢাকিবার জন্য 'দশা'র ভাণ করিয়াছিল। নাচিতে নাচিতে গুরু আসিয়া পানুকেই জড়াইয়া ধরিল। পানু দুর্দ্দান্ত ক্রোধে এক ঝটকায় গুরুকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর ঘরের দাওয়ার উপর রক্ষিত বাঁকটাকে লইয়া মাথায় বসাইয়া দিল। গুরু মাথাটা সরাইয়া লইয়াছিল, অন্যথায় ন্যাড়া মাথাটা হয় তো ডিমের খোলার মত ফাটিয়া যাইত। বাঁকের আঘাতটা মাথার একপাশে পড়িল ঠিক কানের উপর। কানটা সঙ্গে সঙ্গে ছিড়িয়া কাটিয়া রক্তে গুরুর বুক পিঠ ভাসিয়া গেল।

চারু ইহারই মধ্যে কখন আসিয়া আবার দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়াছিল, পানু লক্ষ্য করে নাই, সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—ওরে কি 'মানসুরে' (মানুষমারা) খুনেকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিরে। ওগো আমার কি হবে গো?—ও গো বাবা গো!—

পানু অবাক হইয়া গেল।

তের

নিষ্ঠুর স্বার্থপর দুনিয়া। পানুর দিদি সেই দিনই পানুকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। সেদিন পানু অবাক হইয়া গিয়াছিল, মনে মনে কঠিন আঘাত পাইয়াছিল কিন্তু ইদানীং সে-কথা মনে হইলে পানু হাসে। দীনু প্রাণ দিয়া ভাল বাসিলে কি হইবে—তাহার দিদি গুরুঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সেদিন না বুঝিলেও ক্রমশ সে বুঝিয়াছে, জানিয়াছে—এক ধারার গুরুঠাকুর আছে যাহাদের গুরুগিরির পদ্ধতিই এই। নিজেরা ভগবান

সাজিয়া লীলা করে। তাহার দিদি নিজের জীবনের পাপস্খালনের জন্য মৃত্যুর পর সদ্গতির আশায় গুরুর পায়ে নিজেকে এমনি ভাবে বিলাইয়া দিয়াছিল। পানুও কথাটা জানিত। চারু সেদিন নিজেকে যে গুরুর কবল হইতে ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল—সেটা শুধু প্রকাশ্য দিবালোক এবং উন্মুক্ত স্থানটার জন্য।

শুধু কি গুরু? গোটা দুনিয়ায় যাহারাই সুযোগ পাইয়াছে—তাহারাই এমনি ভাবে ঠাকুর সাজিয়া বসিয়া আছে। কত ঠাকুরই যে পানু দেখিল।

জমিদার-ভূস্বামী, মা-বাপ—ওই এক ঠাকুর। খাজনা দাও, চাঁদা দাও, খাজনা বাকী পড়িলে সুদ দাও, না দিলে ঠ্যাঙানী খাও। এ ছাড়া তোমার বাগানের সব চেয়ে ভাল ফলটি তাকে দাও, পুকুরের বড় মাছটি দাও, ইহার উপর গুরুঠাকুরদের মত বাঁকা নজরও আছে!

ব্রাহ্মণেরাও ঠাকুর। পানু তো দেখিল—পানুর চেয়ে জাতে বড়, ধনে বড়, মানে বড়, যেখানে যত লোক আছে সবাই পানুর কাছে ঠাকুর সাজিয়া পূজার দাবী করে। বৈদ্যরাও ঠাকুর, কায়স্থেরাও তাহাদের কাছে ঠাকুর সাজিতে চায়। মহাজন তো সেরা ঠাকুর। সুদ আদায় করিতে আসিয়া ঘরের সেরা জিনিষটি পূজার ফাউ লইয়া যায়!

পানু সমস্ত জীবন ধরিয়া ঠাকুরগুলাকে কালা পাহাড়ের মত ভাঙিয়া চুরিয়া নিকুচি করিয়া দিতে চাহিয়াছে। অনেক ঠাকুরকে সে ঠ্যাঙাইয়াছে, অপদস্থ করিয়াছে, অমান্য করিয়াছে। সে-বিষয়ে খুব বেশী ক্ষোভ তাহার নাই, কেবল একটা ক্ষোভ—সেই দারোগা এবং সেই জমাদার ঠাকুরকে আর পাইল না। লোক দুইটা বাঁচিয়া আছে কিনা—এবং বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের ঠিকানাই বা কি—এই দুইটা সংবাদ না পাইয়া পানু ঠিক করিয়াছে—সে যমপুরীতে তাহাদের সঙ্গে দেখা করিবে। যখনই তাহাদের কথা মনে হয়, পানুর চেহারা হইয়া উঠে হিংস্র জানোয়ারের মত! চোখ দুইটা জ্বলে। মুখের চেহারা ভয়ানক, হাত-পায়ের, বুকের গুলগুলা ফুলিয়া কঠিন

হইয়া উঠে পাথরের মত। তখন কোন একটা কিছুর উপর তাহার আক্রোশ না ঝাড়া পর্য্যন্ত সে স্থির শান্ত হয় না! কোন জানোয়ার তখন সামনে আসিলে আর রক্ষা থাকে না। পানুর এমন চেহারা দেখিলে তাহার স্ত্রীগুলি তখন সরিয়া পড়ে। কাহাকেও না পাইলে পানু দুর্দ্দান্ত আক্রোশে কোদাল লইয়া মাটি কোপায়। এমন সময় সামনে পড়িয়া তাহার ওই দিদি, ওই চারুই কি কম নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে? ওই চারুও শেষে তাহার কাছে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। অথচ, সেদিন চারু তাহাকে কুকুরের মত খেদাইয়া দিয়াছিল। কুকুরের মত।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

চারু মাথা খুঁড়িয়া সে এক কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল।—এখুনি বার কর। ওকে এখুনি বার কর বাড়ী থেকে। নইলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

গুরুঠাকুরের অর্দ্ধছিন্ন কান হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল।

দীনু বলিল—পানু ভাই, এ বাড়ীতে তোমার আর জায়গা হবে না।

পানু তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার বুকে একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষ, ভীষণ আক্রোশ। যেমন আক্রোশ লইয়া সে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল অন্ধকার রাত্রে—সাহেবের কাছে নালিশ জানাইতে। শুধু আসিবার সময় তুলিয়া লইল কুড়ুলখানা।

কনকনে শীতের রাত্রি। পানু লোকালয় ছাড়িয়া আসিয়া বসিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর তটভূমিতে। ধূ-ধূ করা বালুচর, ওপারে ঘন জঙ্গল, আকাশে ছিল আধখানারও কিছু বেশী আকারের চাঁদ। খানিকটা রাত্রি হইতেই শীতের ময়ূরাক্ষীর ছিলছিলে জলের ধারা হইতে কুয়াশা উঠিতে আরম্ভ হইল। রাত্রি দুপুরের সময় ভিজা বালির বুক হইতেও কুয়াশা জাগিল। বালুচরের উপর এখানে ওখানে শরের ও কাশের ঝোঁপ, পাতাগুলা পাকিয়া হলুদ হইয়া আসিয়াছে, মাথায় দুলিতেছে শাদা ফুল। মধ্যে মধ্যে শেয়ালগুলা ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। পানুর এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। জনহীন

প্রান্তরে তাহার ভয় নাই, নির্জ্জন সুবিস্তীর্ণ বালুচরের বুকের কুয়াশা ও আকাশের চাঁদের আলোর কোন আবেদন তাহার মনের কাছে নাই। ঘন শীতের তীক্ষ্ণতাও তাহার গায়ে তেমন বিঁধিতেছিল না, দীর্ঘ দিনের যাযাবর জীবনে এসবকে সে জয় করিয়াছে। সমগ্রভাবে এই পারিপার্শ্বিক কেবল তাহাকে বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছিল সেই যাযাবর সম্প্রদায়ের জন্য। মনে পড়িতেছিল বুধনকে, মনে পড়িতেছিল সেই বুড়ীকে। কেন? কেন সে তাহাদের ত্যাগ করিয়া আসিল? তাহারা তাহাকে এমন করিয়া খেদাইয়া দিতে পারিত না। মনে বারবার ইচ্ছা হইতেছিল, সে এই রাত্রে এখনি আবার তাহাদের সন্ধানে যাত্রা সুরু করে। পথে পথে বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু প্রতিবারই পরক্ষণেই মন বলিয়াছিল,—না—না—না। কোন্ মায়া—কিসের মায়া, সে সেদিনও বুঝে নাই আজও বুঝে না। শুধু সেদিন মনে হইয়াছিল গ্রামখানি বড় ভাল। কেমন ঘর দুয়ার, কত আরাম, কত জিনিষ এখানে আছে। মানুষেরা জামা-কাপড় পরিয়া কত সুন্দর দেখায়! এখানে এমনি ঘর সে বাঁধিবে, জিনিষ-পত্রে ঘর ভরিয়া তুলিবে, এমনি ভাল পরিষ্কার কাপড় পরা টুকটুকে একটি মেয়েকে লইয়া ঘর করিবে। জামা-কাপড় পরিয়া এমনি ভদ্র মানুষ হইবে। আজ মনে হয়, সে-দিন যে সে যায় নাই, ভাল কাজই করিয়াছিল। আজ চারিপাশে সে একটা রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। বাগান, পুকুর, জমি-জমা, দুই দুইটা স্ত্রী, গরু, বাছুর কত সম্পদ তাহার! দুনিয়াতে কাহাকেও সে ভ্রূক্ষেপ করেনা। কাহাকেও না।

সমস্তই তাহার উপর গাছের দেবতার দয়া।

সেই রাত্রে কি করিবে মনস্থির করিতে না পারিয়া সে গিয়াছিল বৃক্ষ-দেবতার কাছে। কিছুদিন আগে জঙ্গলে গিয়া যে দেওতাকে সে আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই স্থানের উদ্দেশ্যে। দেওতার কাছে সে বলিতে চাহিয়াছিল,

হে বাবা, হে দেবতা, তুমি বলিয়া দাও আমি কি করিব? যদি বুধনের কাছে যাইতে বল তবে স্বপ্নে বলিয়া দাও তাহাদের পাত্তা। কোথায় কতদূরে তাহারা এই শীতের রাত্রে তাঁবু ফেলিয়াছে বলিয়া দাও।

কনকনে ঠাণ্ডা ময়ূরাক্ষীর জল। সেই জল পার হইয়া পানু বনের প্রবেশ মুখেই শুনিল একটা অদ্ভুৎ শব্দ। ক্যাঁ-ক্যাঁ করিয়া কোন একটা জানোয়ার চেঁচাইতেছে। শব্দটা শুনিবামাত্র সে বুঝিল, কোন শক্তিমান জানোয়ার অপর কোন দুর্ব্বলকে ধরিয়াছে। জানোয়ারের আওয়াজ সে চেনে। শুধু চেনে নয়, হা-ঘরেদের কাছে থাকিয়া সে বহু জানোয়ারের ডাক নকলও করিতে পারে। কিন্তু মরণ যখন চাপিয়া ধরে তখন সব জানোয়ারের চীৎকারই এক রকম। মানুষ মরণকালে গোঙায়, সে গোঙানী পর্য্যন্ত ঠিক এই রকম।

পানুর চোখের উপর সব ভাসিতেছে।

ঘন জঙ্গলের ভিতরে জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে চিতাবাঘের গায়ের গুলের মত। জঙ্গলের ভিতর দিয়া সন্তর্পণে সে আগাইয়া চলিয়াছিল। হাতের কুড়ুলটার মুঠা যেন লোহার মুঠা!

জানোয়ারটার মরণ চীৎকার ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

হঠাৎ পানু থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখেই সেই বৃক্ষ দেওতা। দেওতাকে প্রণাম করিয়া চুপি চুপি সে বলিল—কোথায় বাপা! কোথায় গরীবের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া দাও! দেখাইয়া দাও!

দেওতা মিথ্যা নয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখাইয়া দিলেন। জানোয়ারটা হঠাৎ আবার তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। বোধ করি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া শেষ চেষ্টা, শেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল।

নিকটেই। খুব কাছে।

দ্রুতপদে পানু আগাইয়া গেল।

হাঁ। এই যে। এইখানে। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মাটির ভিতর হইতে শব্দ উঠিতেছে। তবে? হাঁ ঠিক বুঝিয়াছে পানু! সাপ! গর্ত্তের

মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া জানোয়ারটাকে ধরিয়াছে। বড় সাপ! পাহাড়ে চিতি! অন্যথায় এত বড় জানোয়ারকে ধরিবে কি করিয়া? অন্ধকারের মধ্যে পান্নুর চোখ জ্বল-জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল। সয়তান। ওই গুরুঠাকুর? হাঁ ওই গুরুঠাকুর। সয়তানের মুখ বাহিরে থাকিলে রক্ষা ছিল না। সয়তান পাক মারিয়া তাহাকে বেড়িয়া ধরিয়া পিষিয়া ফেলিত। সয়তানের এখন মুখ বাহির করিবারও উপায় নাই। আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা হইয়াছে।

পান্নু বেশ ঠাওর করিয়া দেখিল কোনখানে অজগরটা মুখ ঢুকাইয়াছে। হাঁ—এই যে। পাশে দাঁড়াইয়া পান্নু টাঙ্গিখানা দুই হাতে বাগাইয়া ধরিল। তারপর মাথার উপরে তুলিয়া দেহের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া কোপ বসাইয়া দিল। সবল জোয়ান পান্নু—তাহার উপর অস্ত্রখানা ধারালো। এক কোপে সাপটা দুখানা হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হইতে লেজের দিকটা কিল-বিল করিয়া বাঁকিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। সে আক্ষেপ যেমন তেমন নয়। যেন একটা ঝড়ের ওলোট-পালোট। পান্নু আনন্দে নাচিতে লাগিল। সয়তানকে সে বধ করিয়াছে। সয়তানকে সে বধ করিয়াছে।

(গ)

ওই সয়তানকে মারার জন্যেই বৃক্ষ দেওতা তাহাকে তাহার মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

সাপটার ছিন্ন দেহখানার আক্ষেপ শুদ্ধ হইবার পর সাপটাকে দেখিতে দেখিতে পান্নুর খেয়াল হইল, পাহাড়ে চিতিটা খুব বড় না হইলেও ছোট নয়। চর্ব্বি অনেকখানি আছে। হা-ঘরের দলে থাকিতে সাপ মারিয়া চর্ব্বি বাহির করিতে শিখিয়াছিল। ভঁইষার দুধ হইতে ঘিউ তৈয়ারী করিয়া সেই ঘিওয়ের সঙ্গে চর্ব্বির ভেজাল দিতে হা-ঘরেদের ওস্তাদী হাত। পাহাড়ে চিতির—ধামন সাপের মাংসও খায় তাহারা। আঃ, আজ যদি তাহার ভঁইষাটা

থাকিত তবে এই চর্ব্বিটা লইয়া বহুৎ মুনাফা করিতে পারিত। কম সে কম তিন-চার টাকা।

সে তাহার জীবনে পূর্ব্বে এ অন্যায় করে নাই। কিন্তু আজ উপায় থাকিলে করিত।

হঠাৎ তাহার মনে হইল—সে যদি একটা ভঁইষা কেনে, তবে কেমন হয়? ময়ূরাক্ষীর ধারে অফুরন্ত ঘাস। ঘাস খাইয়া ভঁইষাটা এই মোটা হইয়া উঠিবে, প্রচুর দুধ দিবে। সে দুধ বেচিবে, ঘিউ করিবে—বেচিবে। মুনাফা হইবে। তাহার উপর এই জঙ্গলে গাছের দেওতা তাহার উপর সদয়, তিনি তাহাকে এমনি করিয়া সন্ধান দিবেন—এই সব চর্ব্বিওয়ালা সয়তানের; সে তাহাদের মারিয়া চর্ব্বি বাহির করিয়া লইবে গভীর জঙ্গলে। তারপর ঘিউয়ের সঙ্গে মিশাইয়া বিক্রী করিবে। দুনা মুনাফা হইবে। ভঁইষাটার বাচ্চাটা বড় হইবে, সেটাকে বেচিয়া দিবে। তাহাতে মুনাফা হইবে। আবার একটা কি দুইটা ভঁইষা কিনিবে। দুইটা—চারটা—আটটা—দশটা—এক পাল ভঁইষা।

পান্নু পথ দেখিতে পাইল। দেওতা তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। আপন গেঁজলেটা সে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। টাকাগুলি বাহির করিয়া সাজাইল। গুনিয়া দেখিল। কয়েক মাস দীনুর কাছে থাকিয়া সংখ্যা-বিজ্ঞান আবার তাহার মনে পড়িয়া গেছে। একশো পর্য্যন্ত সে বেশ গুনিতে পারে।

পঞ্চান্ন টাকা।

এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে জানোয়ারের হাট। পান্নু এই পথে যাতায়াত করিবার সময় কয়েক বারই দেখিয়াছে। পঞ্চাশ টাকায় বেশ একটা ভঁইষার গাই মিলিবে।

কয়েক দিন পরেই পান্নু ময়ূরাক্ষীর চরের শরবনের শর কাটিয়া গাছের ডাল কাটিয়া একটা চালা তুলিয়া ফেলিল। চালার একপাশে সবৎসা একটা

মহিষ—অন্য পাশে সে বাসা গাড়িল। তাহার জীবনের সে দিন মনে আছে। মাথায় দুধের হাঁড়ি লইয়া বাজারে চাকুর ঘরের সামনে দিয়া হাঁকিয়া যাইত —দুধ—দুধ লিবে। কয়েক দিন জমাইয়া ঘিয়ের ভাঁড় লইয়া যাইত—ঘিউ —ঘিউ লিবে। ভঁইষা ঘিউ।

চৌদ্দ

পানু ভঁইষাটার নাম রাখিয়াছিল—লছমী। সত্যসত্যই লছমী পানুর ভাগ্যে লক্ষ্মী হইয়া আসিয়াছিল। লছমী বোধ হয় কোন গরীবের ঘরে প্রতিপালিত হইয়াছিল; হাড় পাঁজরা বাহির করা মহিষটাকে কেহই পছন্দ করে নাই। পানু পছন্দ করিল। দামেও কম হইল—তাহার পানু মহিষ চিনিত, সে দেখিয়াই বুঝিল—মহিষটাকে বুড়ী দেখাইলেও সে বুড়ী নয়। বয়স কম। লছমীর কোলে একটা মাদী বাছুর। লছমীকে কিনিয়া আনিয়া ময়ূরাক্ষীর চরে ঘর বাঁধিল। সকালে উঠিয়াই লছমীকে লইয়া বাহির হইত। ফিরিত সন্ধ্যায়। চরভূমির নরম ঘাস খাইয়া লছমী ইচ্ছামত বিচরণ করিত।

প্রথম লছমী দুধ দিত চার সের। দ্বিতীয় মাসে পাঁচ সেরে উঠিল। ফাল্গুন চৈত্রে লছমী চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া রোমন্থন করিত—আর পানু তাহার মোটা আঙুল দিয়া নরম বাট টানিয়া দুধ দোহন করিত। একবারে একদোহনে সাতসের দুধ লছমী ঢালিয়া দিত। সেই দুধ পানু বাজারে বেচিয়া আসিত। অবিক্রীত দুধ মথিয়া মাখন তুলিয়া ঘি তৈয়ারী করিত। নিজে পান করিত। দুপহরে ময়ূরাক্ষীর জলে লছমীকে বসাইয়া পরম যত্নে তাহার দেহের কাদা ক্লেদ ধুইয়া মুছিয়া স্নান করাইয়া দিত। তারপর মাখাইয়া দিত নারিকেলের তেল। হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ হইতে তেল গড়াইয়া পড়িত, রোদের ছটা লাগিয়া চকচক করিত। বৈকালেও গরু-মহিষ দুহিবার

রীতি আছে, সকলে দোহনও করে, কিন্তু পানু কোনদিন লছমীকে বৈকালে দোহন করিত না। ও ভাগটা ছিল মণ্ডলীর। মণ্ডলী তাহাকে দিবে মঙ্গল —কল্যাণ।

কল্পনা তাহার মিথ্যা হয় নাই। লছমী বাঁচিয়াছিল দশ-এগারো বছর। মণ্ডলীর পরে আরও চারিটা সন্তান সে দিয়া গিয়াছে, দুইটা মরদ বাছুর—দুইটা বেটী। লছমীর দুধে ঘিয়ে সে অনেক পয়সা পাইয়াছে। মণ্ডলীও তাহার মঙ্গল করিয়াছে। মণ্ডলী যখন তরুণী হইয়া উঠিল—তখন সে তো তাঁর প্রেমেই পড়িয়াছিল। মণ্ডলীর গলা ধরিয়া বসিয়া থাকিত, তাহার চুমা খাইত।

দীনু তাহার কাছে নিত্য আসিত। সেই তাহাকে উপদেশ দিয়া পথ ধরাইয়া দিয়াছে। সেই বলিয়াছিল—তুমি লক্ষ্মীমান পুরুষ পানু। কিন্তু ঘর নইলে লক্ষ্মী বাস করবেন কোথায়? তুমি ঘর কর।

ঘর! ঘর। ঘরেই সে জন্মিয়াছে, ঘরেই সে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাটাইয়াছে। ওই ঘরের টানেই সে হা-ঘরেদের ছাড়িয়া আসিয়াছে।

পানু মহাউৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল—হ্যাঁ, ঘর করব। ঘর। ঘর! কয়েক মাসের মধ্যেই পানুর বাংলা বুলি আবার বেশ রপ্ত হইয়া আসিয়াছে। চৈত্রমাস। ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে বেশ ঝির-ঝিরে হাওয়া বহিতেছিল—সন্ধ্যার পর শুক্লপক্ষের চতুর্থী কি পঞ্চমীর চাঁদ ঠিক সম্মুখে পশ্চিম আকাশে; জ্যোৎস্নাটা পানুর চালার সামনেই আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোতেই পানু দেখাইল—এইখানে এমনিভাবে সে ঘর করিবে।

দীনু হাসিয়া বলিল—তারপর বর্ষায় যখন বান আসবে?

হাঁ। বর্ষা—বন্যা। কথাটা তাহার মনে হয় নাই। তবে? তবে কোথায় ঘর করিবে সে? সে দীনুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তবে?

দীনু বলিল—উঁচু জায়গা দেখে—গাঁয়ের ও মাথায় ঘর কর।

পরদিনই পানু গ্রামের ওপাশে জায়গা দেখিয়া পছন্দ করিল। পছন্দ হইল যখন তখন আর অপেক্ষা কিসের? বাজারের দোকান হইতে কোদাল,

টামনা, শাবল কিনিয়া সে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। লছমী-মঙলীকে বলিল—যা—চরিয়া আয়। বেশী দূর যাস না যেন! খবরদার।"

লছমী-মঙলীকে ছাড়িয়া দিয়া সে মাটী কোপাইয়া ফেলিল। টিন ভর্ত্তি জল আনিয়া মাটির উপরে ঢালিয়া দিল। কাল ভিজিয়া নরম হইলে আবার জল দিয়া কাদা করিয়া দেওয়াল দিতে আরম্ভ করিবে। ব্যাস—দুই কুঠারী ঘর। একটায় সে থাকিবে—অপরটায় থাকিবে লছমী ও মঙলী। ব্যাস!

ঠিক এই সময়েই ঠাকুরের দূত আসিয়া হাজির হইল। জমিদারের পেয়াদা। ইহারই মধ্যে স্থানীয় কাছারীতে সংবাদ চলিয়া গিয়াছে। গম্ভীরভাবে লোকটা এই দিকেই আসিতেছিল। পানু দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারে নাই। লোকটার সঙ্গে তাহার পরিচয়ও আছে। ময়ূরাক্ষীর চরে ওই চালাটার জন্য একবার সে আসিয়া খাজনা দাবী করিয়াছিল—পানু একটা টাকা বিনা আপত্তিতেই তাহাকে দিয়াছিল। আরও দুই চারিবার আসিয়া দুধ লইয়াও গিয়াছে। সেও পানু দিয়াছে। পানু অবশ্য জানিত না যে ময়ূরাক্ষীর এই স্থানটা বেহার ও বাঙলাদেশের সীমারেখা, ওটা কোন জমিদারেরই জমিদারীর এলাকাভুক্ত নয়। লোকটা পানুর পড়িয়া পাওয়া চৌদ্দ আনার স্থলে—একটা টাকাই লইয়া গিয়াছে।

আজ সে আসিয়া খপ করিয়া পানুর হাত চাপিয়া ধরিল—চল কাছারীতে।

পানু প্রথমটা চমকিয়া উঠিল। তারপর বলিল—কাহে?

—কাহে? এখানে মাটি কুপিয়ে ঘর বানাবি, তোর বাবার জায়গা?

পানু বলিল—আমি খাজনা দোব।

—আরে খাজনা দিবি! খাজনার কথা কিসের? বিনা হুকুমে মাটিতে কোপ মারলি কেন তুই?

—কেন, দোষ কি হ'ল? জায়গা তো পড়েই আছে।

—হাঁ—হাঁ—বিলকুল তামাম দুনিয়া পড়ে আছে। পড়ে আছে বলে তু যা খুসী করবি? চল কাছারীতে। লোকটা একটি হেঁচকা টান মারিয়া বসিল। পানু ইহাতেও কিছু বলে নাই। বলিল—চল—চল তোমার কাছারীতেই চল।

—আগে পেয়াদার রোজ দে। পেয়াদার রোজ!

—সেটা কি?

—আমার পাওনা। তুকে ডাকতে এসেছি—তার মজুরী দে।

—কত?

—আট আনা।

আট আনাও পানু দিয়াছিল। তাহার সঞ্চয় সম্বল সব তাহার সঙ্গেই কোমরের গেঁজলেতে থাকে। পেয়াদা এবার নরম হইয়া বলিল—চল, তুকে সুবিধে ক'রে দোব।

কাছারীর নায়েব তাহাকে দেখিবমাত্র বলিল—বস বেটা, ওইখানে বস। কার হুকুমে মাটি কুপিয়েছিস তুই?

পানু বলিল—খাজনা দোব আমি।

—আগে নিকাল পাঁচ টাকা জরিমানা, বিনা হুকুমে মাটি কুপিয়েছিস, তার জন্যে।

—পাঁচ টাকা?

—হাঁ—হাঁ।

পানুর কাছে পাঁচটা টাকার অনেক মূল্য। লছমী সাতসের দুধ দেয়, সাতসের দুধের দাম এখানে সাত আনা পয়সা। সাত আনার মধ্যে দুই আনা তিন আনা তাহার নিজের খাইতে খরচ হয়। দৈনিক চার আনা হিসাবে কুড়ি দিনে পাঁচটা টাকা সে পায়। সে নিতান্ত অপরাধীর মতই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গর্জ্জন করিয়া উঠিল পেয়াদাটা—নিকাল—নিকালরে! বলিয়া সে

নায়েবকে বলিল—ভারী হারামী শালা। গেঁজলেতে এক গেঁজলে টাকা হুজুর।

নায়েব বলিল—বাঁধ বেটাকে। ওই খামের সঙ্গে বাঁধ।

'খামের সঙ্গে বাঁধ!' মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল—থানার খামে আবদ্ধ তাহার বাপের ছবি। খামের সঙ্গে আবদ্ধ তাহার বাপ পশুর মত চীৎকার করিয়া খামের গায়ে মাথা ঠুকিবার চেষ্টা করিতেছে। অদ্ভুৎ চোখের দৃষ্টি! চোখ দুইটা যেন দুইটা রক্তের ঢেলার মত ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিবে। জমাদার নীরবে তাহার পিঠে বেতের পর বেত চালাইতেছে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তটিতেই ঠাকুরের দূতটি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—নিকাল—

পরের কথা তাহার মুখেই থাকিয়া গেল। পানু তখন কালাপাহাড় হইয়া উঠিয়াছে। উন্মত্ত শক্তি প্রয়োগে সে তাহার গালে কষাইয়া দিল প্রচণ্ড এক চড়। চড় খাইয়া পেয়াদাটা বাপ বলিয়া পানুকে ছাড়িয়া দিয়া টলিতে আরম্ভ করিল। পানু তখন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার বসাইয়া দিল লোকটাকে এক কিল। লোকটা এবার নির্ঘাৎ মাটির উপর পড়িয়া গেল। নায়েব তখন উঠিয়া পড়িয়াছে। বারান্দা হইতে সে ঘরের দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল কিন্তু মুখে চীৎকার করিতে থামে নাই, বলিতেছিল—ধর—ধর—।

পানু চারিদিক চাহিয়া দেখিল—ধরিবার লোক কেহ নাই। লোকের মধ্যে একটা নীচু জাতীয় নন্দী ছিল—সেও পিছু হটিতেছে। পানুর সাহস বাড়িয়া গেল। শুধু সাহস নয়—পৈশাচিক উল্লাসও সঙ্গে-সঙ্গে জাগিয়া উঠিল। সে লাফ দিয়া গিয়া ধরিল নায়েবকে। লোকটার নধর চেহারার সঙ্গে গুরুঠাকুরের মিল আছে। নায়েব লোকটি কিন্তু চতুর। পানু তাহাকে ধরিবামাত্র সে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা হইতে এবং সামনের দিকে অর্থাৎ মুখে চোখে বুকে পেটে মার খাওয়ার হাত হইতে

বাঁচিবার চেষ্টা করিল। পানুর কিন্তু পিঠ—পিঠই সই—ক্ষাত্র রণনীতি সে জানেও না—বরং পিঠ দেখিয়া কিল মারিবার জন্যই প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। নায়েবের পিঠের উপর চাপিয়া বসিয়া চালাইতে আরম্ভ করিল কিলের পর কিল। লোকটার পিঠও অত্যন্ত নরম। কিল মারিয়া আরাম আছে। কিন্তু সাধ মিটিবার পূর্ব্বেই পানুকে উঠিতে হইল। ওদিক নন্দীটা চীৎকার করিতেছে।

—মেরে ফেললে গো! মেরে ফেললে! কিল মেরে ফাটিয়ে দিলে গো!

পানু বুঝিল এই বার লোক জমিবে। সে নায়েবের পিঠ হইতে উঠিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সে ময়ূরাক্ষীর তটভূমিতে আসিয়া উঠিল। তারপর মুখে ডাকিতে আরম্ভ করিল মহিষের ডাক। বুকে মনে সে বলিতেছে—লছমী—মঙলী! লছমী—মঙলী। মুখে ডাকিতেছে—আঁ—আঁ—আঁ! অবিকল মহিষের আওয়াজ। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই—ওদিকের কতকগুলা শরবনের অন্তরাল হইতে সাড়া আসিল—আঁ—আঁ—আঁ! ঠিক পানুর ডাকের প্রতিধ্বনি। পানুর ডাকের মধ্যে যে ব্যগ্র আকুলতা—লছমীর ডাকের মধ্যেও সেই আকুলতা। এ যেন ডাকিতেছে—লছমী—মঙলী—ওরে—ওরে ছুটিয়া আয়—ছুটিয়া আয়। লছমীও ছুটিয়া আসিতেছে—আর যে ডাকে সাড়া দিতেছে তাহাতে বলিতেছে—যাই—যাই—যাই!

পানু কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইয়াছে। নায়েব এখানকার মালিক। ঠাকুর। ঠাকুরকে সে ঠ্যাঙাইয়াছে—এইবার ঠাকুর ক্ষেপিয়া উঠিবে। আর ওই ঠাকুরের প্রসাদভোজী অনেক। দারোগার সেপাই আছে। নায়েবের আরও অনেক পাইক নন্দী আছে। দারোগার উপরে সাহেব আছে—নায়েবের উপরে জমিদার ঠাকুর আছে। এখানে আর নয়। সে ময়ূরাক্ষীর চরভূমি ধরিয়া ওই ডাক ডাকিতে ডাকিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। লছমীও ছুটিল—তাহার পিছনে মঙলী।

বহুক্ষণ ছুটিয়া সে যখন থামিল—তখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। আকাশের চাঁদ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাহার ঘাম ঝরিতেছিল। বুকটা উঠিতেছিল, পড়িতেছিল কামারের হাপরের মত। সে বালির উপর বসিল। লছমী মগুলীও ক্লান্ত হইয়াছিল—তাহারাও বসিল। অনেকক্ষণ পর উঠিয়া ময়ূরাক্ষীর জলে স্নান করিয়া—চরভূমির উপর লছমীর ঠিক পাশেই শুইয়া পড়িল।

ক্লান্ত শরীর। মন উদ্‌ভ্রান্ত। কোথায় যাইবে? কোন্‌খানে কোন্ রাজ্যে সে গিয়া শান্তিতে সুখে থাকিতে পাইবে?

হে দেওতা, দেখাইয়া দাও সেই দেশ! যেখানে এমন করিয়া দারোগা জমাদারে বেত মারিয়া পিঠের চামড়ায় দাগ কাটিয়া দেয় না—যেখানে নায়েবের পেয়াদা আসিয়া কাছারীতে ধরিয়া লইয়া নায়েবের হুকুমে সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে চায় না, সেই দেশ দেখাইয়া দাও। সে কোন পাপ, কোন অন্যায় করিবে না। সে কেবল একখানা ঘর গড়িয়া—লছমী এবং মগুলীকে লইয়া থাকিবে। লছমীর দুধ বেচিয়া দুধ হইতে ঘি তৈয়ারী করিয়া বেচিবে। দুধ ঘি বেচিয়া টাকা হইলে—সে শুধু একটুকরা জমি কিনিবে। ন্যায্য দামে দিয়া এক টুকরা জমি। জমি টুকরাটা চষিয়া সে ফসল বুনিবে। সে ফসল হইতে তোমার ভোগ দিবে, নিজে খাইবে। যাহার নাই—সে চাহিলে দিবে। এ সব দিয়াও যদি থাকে—তবে সেই উদ্‌বৃত্তটা বেচিবে।

হে দেওতা, যদি তুমি দয়া কর—মুখ তুলিয়া চাও—তবে সে সাদীও করিবে। বেশ একটি শক্ত সমর্থ মেয়েকে বিয়া করিবে। সে তাহার সঙ্গে খাটিবে। তাহাকে সে শাড়ী কিনিয়া দিবে—শাঁখা, পলার মালা—তাও কিনিয়া দিবে। তাহার কোলে আসিবে বেশ মোটাসোটা ছেলে। 'ওঁয়া—ওঁয়া' শব্দে কাঁদিবে। লছমীর দুধ খাইবে। ততদিনে মগুলীরও বাচ্চা হইবে। মগুলীর দুধই সে খাইবে। লছমীর দুধ তাহার—শুধু তাহার। লছমীর দুধের ভাগ সে কাহাকেও দিবে না।

হঠাৎ সে উঠিয়া বসিল।

বেড় ক্ষুধা পাইয়াছে। পেট অনেকক্ষণ হইতেই জ্বলিতেছে। লছমীর ধ তাহার—লছমীর দুধের ভাগ কাহাকেও দিবে না—এই কথা মনে করিতে গিয়া ক্ষুধার সুধার কথা মনে পড়িয়াছে। লছমীর দুধ আছে। ক্ষুধার জন্য ভয় কি? লছমীকে গুঁতা দিয়া উঠাইয়া—সে মঙলীকে দুধ খাইতে ঠেলিয়া দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মঙলীর মুখের দুই পাশ গড়াইয়া দুধ ঝরিয়া পড়িল। পানু এবার মঙলীকে ঠেলিয়া দিয়া নিজেই লছমীর বাঁটে মুখ দিয়া শিশুর মত স্তন পান করিতে আরম্ভ করিল। দেহ যেন জুড়াইয়া গেল। তারপর সে কি অগাধ ঘুম! সকালে যখন ঘুম ভাঙিল, তখন দেখিল এক অপরিচিত আবেষ্টনী, পরিচিত শুধু ময়ূরাক্ষী। কিন্তু একি চমৎকার দেশ! আহা-হা! চোখ যেন জুড়াইয়া যায়! ময়ূরাক্ষী এখানে বিপুল বিস্তৃত। সম্মুখেই খানিকটা আগে—এই বিপুল বিস্তৃত ধূসর বালুচরের মধ্যে সবুজ একটা দ্বীপ। ময়ূরাক্ষী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দ্বীপটার দুই দিকে বহিয়া গিয়াছে। পানুর মন বলিয়া উঠিল—পাইয়াছি, এই তো জায়গা। দুই দিকে নদী, মধ্যে দ্বীপ—মানুষ নাই—জন নাই, মানুষ-জন যখন নাই তখন দারোগা নাই, জমাদার নাই, নায়েব নাই, পেয়াদা নাই—আছে মাটি যেখানে সে ঘর তুলিয়া বাস করিতে পারিবে; আছে ঘাস—যে-ঘাস খাইয়া তাহার লছমী মঙলী পরিতৃপ্তি-ভরে রোমন্থন করিবে। হাড়ি ভরিয়া দুধ দিবে। আঃ, দেওতা—বাপা তাহার উপর দয়া করিয়াছে। হে বাপা, তোমাকে নম—গড় করি তোমাকে।

হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল লছমী।

পরক্ষণেই সেও চঞ্চল হইয়া উঠিল—এ কি? মহিষ ডাকিতেছে কোথায়? হ্যাঁ মহিষই তো। চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার নজরে পড়িল দ্বীপটার উপরেই এক পাল মহিষ চরিতেছে। সে লছমীকে লইয়া আগাইয়া চলিল।

দ্বীপে উঠিয়াই দেখিল—একপাল মহিষ। একটা মহিষের পিঠে চাপিয়া বসিয়া আছে একটা মেয়ে। এই লম্বা মেয়েটা—আর তেমনি কি আঁট স্যাঁট দেহ। মেয়েটার বাহন মহিষটা মুখ তুলিয়া উগ্রদৃষ্টিতে লছমীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছে আর ডাকিতেছে—আঁ-আঁ-আঁ! পানু দেখিয়াই বুঝিল, ভঁইষাটা মর্দ্দানা। সে বলিতেছে—কে? কে? কে?

হেলিয়া দুলিয়া সে আগাইয়া আসিতেছে। মাথাটা নীচু করিয়াছে। লড়াই করিতে চায়। পানু কিন্তু ব্যস্ত হইল না। কি হইবে সে জানে। মহিষটা আসিয়া লছমীকে যেই জেনানা বলিয়া চিনিবে অমনি অন্যডাক ডাকিতে শুরু করিবে। শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া লছমীর মুখ শুঁকিবে।

মেয়েটা তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া আছে।

পনেরো

মেয়েটা কালা এবং বোবা।

বয়স চৌদ্দ-পনেরো, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট সবল সুস্থ দেহ। নাম যশোদা। নাম সে বলিতে পারে নাই—পানু শুনিয়াছিল—মেয়েটির বাপের কাছে। হ্যাঁ, বাপই। গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু গোয়ালার বাড়ীর পোষ্য যশোদা—কিন্তু গোয়ালাটিরই নীচ জাতীয়া প্রণয়িনীর গর্ভজাতা কন্যা। মা মরিয়া গেছে, যশোদা খায়দায়—মহিষের সেবা করে। যশোদাই পানুর প্রথম স্ত্রী।

যশোদা কালা-বোবা কিন্তু ইঙ্গিতময়ী। ইঙ্গিতে এমন প্রখর মুখরতা পানু দেখে নাই। আজও দেখে নাই।

পানুর লছমী স্বজাতীয়-স্বজাতীয়াদের দেখিয়া মুখ তুলিয়া ডাক দিতেছিল। যশোদার মহিষের পালও ডাক দিতেছিল। সহসা ছুটিয়া আসিল একটা প্রকাণ্ড মহিষ। মুখ তুলিয়া ডাক দিতে দিতে সে আসিয়া লছমীর অদূরে দাঁড়াইল।

পান্থ লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিল। মহিষটা আরও খানিকটা কাছে আসিতেই হাসিয়া লাঠিটা নামাইল। মরদ মহিষ! লছমী তাহার জেনানা। কোনও ভয় নাই। এখনি ভাব হইয়া যাইবে।

ওদিক হইতে যশোদাও ব্যাপারটা দেখিয়াছিল। সেও শঙ্কিত হইয়া তাহার বাহন মহিষটার উপর হইতে লাফ দিয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। হাতের লাঠিটা উদ্যত। সেও ব্যাপারটা দেখিয়া লাঠিটা নামাইয়া—ফিক করিয়া হাসিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই গম্ভীর হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্তিমিত বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চকিতে এমনভাবে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত ঘাড়টি নাড়িল যে—এক মুহূর্ত্তে তাহার বক্তব্য সুরে অর্থে স্পষ্ট হইয়া উঠিল—কে তুমি?

পান্থ বলিল—আমি পান্থ।

আবার সে ঘাড় নাড়িল—তেমনি চকিত জিজ্ঞাসা-চিহ্নের ভঙ্গিতে ফুটাইয়া তুলিল—কে? ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

—পান্থ। এখানকার আদমী নই আমি।

মেয়েটি এবার কানে হাত দিল—তারপর না'র ভঙ্গিতে হাত নাড়িল। পান্থ মুহূর্ত্তে বুঝিল—মেয়েটি কালা। কিন্তু কথা বলে না কেন?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাত দিয়া—হাত নাড়িল—না—। এবার পান্থ ঠিক বুঝিল না। মেয়েটি এবার 'আঁউ—আঁউ' করিয়া শুধু রব করিয়া উঠিল। বারবার হাত নাড়িল—সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়াও বুঝাইল—না—না। চোখের দৃষ্টি তাহার হইয়া উঠিল সকরুণ। পান্থর বুঝিতে আর কষ্ট হইল না—বিলম্ব হইল না। বুঝিল সে বোবা—সে কালা। তাহারও দৃষ্টি সকরুণ হইয়া উঠিল।

সে চীৎকার করিয়া বলিল—সে পান্থ। সে বিদেশী।

হাতখানি সুদীর্ঘ প্রসারণে প্রসারিত করিয়া বুঝাইতে চাহিল—বহুদূরে তাহার বাড়ী।

যশোদা একটা গাছতলায় বসিয়া—হাসিমুখে হাতের ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল—এস—এইখানে এস।

পাশের জায়গাটুকু হাত দিয়া পরিষ্কার করিয়া—হাতের তালু দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল—বস—এইখানে বস। পান্নু বলিল।

পান্নু উচ্চকণ্ঠে বলিল—গাঁও কত দূর?

যশোদা এমনভাবে চাহিল যে পান্নু মুহূর্ত্তে বুঝিল—সে শুনিতে পায় নাই। সে আরও উচ্চকণ্ঠে বলিল—গাঁও? গাঁও? তারপর নিজের পেটে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল—ভুখ! খিধে! খিধে! আহার্য্যের সন্ধানে সে গ্রামে যাইবে।

যশোদা উঠিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

পান্নু বিস্মিত হইল—শঙ্কিতও হইল—বোবা কালা মেয়েটা পলাইল কেন? তাহার কথার কোন কদর্থ করে নাই তো?

যশোদা অল্পক্ষণ পরেই ফিরিল। হাতে তাহার গামছায় বাঁধা একটা পোঁটলা। পোঁটলাটা খুলিয়া পান্নুর সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া বারবার সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িল।—খাও—পান্নু—তুমি খাও।

যশোদার মরদ মহিষটা তখন পান্নুর লছমীর গলার নীচেটা চাটিতেছে।

পান্নু ওই গ্রামেই বাসা বাঁধিল।

গোয়ালা প্রথমটা সন্দিগ্ধ চোখে দেখিয়াছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার সে ভাব পাল্টাইয়া গেল। আরও কয়েকদিন পর সে পান্নুকে বলিল—যশোদাকে তুমি বিয়ে করবে?

পান্নু এতটা প্রত্যাশা করে নাই। সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।—হাঁ! হাঁ! হাঁ!

পান্নুর জাতি পরিচয় গোপ মহাশয় আগেই লইয়াছিল—সে যশোদাকে তিলককণ্ঠি পরাইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পান্নুর সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিল।

পান্নু সেদিন বুঝিতে পারে নাই কিন্তু আজ সে বুঝিতে পারে—ঘোষ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাহার পরিচিত জমিদার, নায়েব, গুরু, দারোগা, জমাদার

প্রভৃতির মত সাক্ষাৎ ঠাকুর না হইলেও ঠাকুরের মালভূত তাই। তাহার কথা মনে হইলেই পানু জিভটা তালুতে ঠেকাইয়া স্নেহাত্মক তারিফ জানাইয়া—ক্যা—ক্যা শব্দ করিয়া উঠে। তারপর আপন মনেই বলে—উঃ—!

সেদিন কিন্তু পানু ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রায় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। মাসখানেকের পরিচয়ে ঘোষ যখন তাহার হাতে যশোদাকে তুলিয়া দিল—নিজের গোয়াল বাড়ীতে একখানা ঘর দিল, তখন তাহার মনে হইল—ঘোষ তাঁহাকে যাহা দিল—ইহাকেই তো অর্দ্ধেক রাজত্ব সমেত রাজকন্যা বলে। পানু বিগলিতচিত্ত হইয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ভোরে উঠিয়া পানু ঘোষের মহিষের পাল লইয়া চরে চরাইতে যায়, পালের সঙ্গে যায় লছমী। যশোদা গোয়াল সাফ করে; গোয়াল সাফ করিয়া আহার্য্য লইয়া চরে যায়, সেই সঙ্গে লইয়া যায় বাছুরগুলিকে—লছমীর বেটী মঙলীও যায়। ঘোষের লোক যায় বালতী হাতে। দুধ দুইয়া লইয়া আসে। পানুও লছমীর দুধ দুইয়া লয়। ঘোষই লছমীর দুধ কিনিয়া লয়—তিন পয়সা সের। পয়সা নগদ দেয় না, দেয় সেই দামের চাল দু'আনা সের। যশোদা বাড়ী আসিয়া রান্না করে, পানু প্রচুর অন্ন পেট ভরিয়া খায়; রাত্রে যশোদাকে লইয়া তাহার প্রমত্ত নিশিযাপন। গ্রীষ্মের রাত্রে ঘর হইতে যশোদাকে লইয়া সে ময়ূরাক্ষীর বালির উপর গিয়া শয্যা রচনা করে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে বালুচরের উপর দুইজনে ছুটিয়া বেড়ায়—হাসে, নাচে, পানু গান গায়—যশোদা ভাষাহীন সুর, বৈচিত্র্যহীন উল্লাস চীৎকারে পানুর গানের সঙ্গে গান করিতে চায়; গ্রীষ্মের ময়ূরাক্ষীর এক হাঁটু জলে কখনও লাফাইয়া পড়ে—এ পানুর পক্ষে রাজত্ব নয় তো কি? তাহার কল্পনার ঘর পাইয়াছে, বউ পাইয়াছে—যে বউ রুক্মিণীর মত অনেকটা উচ্ছলা-বর্ব্বরা—আবার যে পল্লীর মেয়েগুলির মত বেশ পরিপাটি করিয়া কাপড় পরে, নিত্য-স্নানে যে পরিচ্ছন্ন, পায়ে যে আলতা পরে, মাথায় চুলগুলি যে তাহার দিদির

মত করিয়া বাঁধিতে জানে, চমৎকার সুস্বাদু ব্যঞ্জন রাঁধে, রুক্মিণীর মত উচ্ছলা হইয়াও সে লোকের সম্মুখে লজ্জায় নম্র হইয়া ঘোমটা দেয়, একান্তভাবে আনুগত্য স্বীকার করে। পেট ভরিয়া অন্নের সংস্থান হইয়াছে। ঘোষেদের সংসারের মধ্যে আত্মীয়তার সন্ধান পাইয়াছে। সে আর কি চাহিবে?

বারবার সে বৃক্ষদেবতাকে প্রণাম জানাইয়া বলিত—হে বাবা, হে দেওতা, হাজার বার তোমাকে গড় করি। যাহা চাহিয়াছিলাম—তাই তুমি আমাকে দিয়াছ।

পুরাণো স্মৃতিকে ঝালাইয়া আজকাল সে পুরাণো দেব-দেবীগুলিকে নূতন করিয়া চিনিয়াছে। তাহাদেরও ভক্তি করে—প্রণাম করে। দুর্গা-কালী-শিব-কৃষ্ণ-রাধা-কার্ত্তিক সব আবার মনে পড়িয়াছে। সব চেয়ে তাহার ভাল লাগিয়াছে—কালীকে। তাহার পর রাধাকৃষ্ণ। সে তাহাদেরও প্রণাম করে, বলে—হে ঠাকুর—নম। তোমাদিগে নম।

প্রাণপণে সে চেষ্টা করে ঘোষেদের সংসারের মানুষগুলির সকল আদেশ পালন করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে, তাহাদের দানের প্রতিদান দিতে তাহাদিগকে আর গভীরভাবে আপনার করিয়া পাইতে। ঘোষকে সে বলিত ঘোষবাবা। ঘোষবাবার মত ভাল লোক তাহার জীবনে সে দেখে নাই।

হঠাৎ তাহার নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে—গভীর আশ্বাসে আঘাত দিল যশোদা। সে একদিন ঘোষের বাড়ী হইতে চাল আনিয়া অত্যন্ত অসন্তোষ জানাইয়া ভাঁউ-ভাঁউ করিতে আরম্ভ করিল। পানু কিছু ঠাওর করিতে পারিল না। সে মুখে বলিল এবং ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল—কি? কি?

যশোদা এবার দুধের মাপের সেরটা আনিয়া চালটা মাপিয়া দেখাইয়া দিল—দুই সেরে চাল অনেকটা কম।

পানু সবিস্ময়ে যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যশোদা আবার উঠিয়া একটা হাড়ির ভিতর হইতে ছয়টা পয়সা আনিয়া পানুর সম্মুখে রাখিল এবং পয়সাটার পাশেই একসের চাল মাপিয়া ঢালিয়া দিল। তারপর আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল—গ্রামের ভিতরের দিকে। তারপর সে একসের দুধ মাপিয়া—তাহার পাশে রাখিল পাঁচটা পয়সা। আবার আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল—নদীর ওপারের দিকে।

পানু ব্যাপারটার আভাস পাইল। বলিল—কে বললে?

যশোদা আঁউ-আঁউ করিয়া আঙুল দেখাইল—গ্রামের দিকে।

পানু বুঝিল—গ্রামের কেহ যশোদাকে বলিয়াছে—চালের সের ছ'পয়সা। দুধের সের পাঁচ পয়সা। কিন্তু সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল—ইঙ্গিতে বুঝাইল—না-না। ঘোষবাবা তেমন লোক নয়। আর সে লোককে আদমী বলে না।

যশোদা এবার তাহার সর্ব্বাঙ্গ দোলাইয়া পানুর মুখের কাছে দুইহাত নাড়িয়া দিল। তাহার সে ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিল অদ্ভুত এক ঝঙ্কারময়ী রূপ! পানু মুগ্ধ হইয়া না হাসিয়া পারিল না। যশোদা এবার তাহার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। পানুকে উঠিতে হইল।

গাঁয়ের ওপাড়ায় সদগোপদের বাড়ী।

সদগোপ কর্ত্তা তাহাকে বলিল—চালের সের ছ'পয়সা। কাঁচি মাপে অবিশ্যি। তা' কাঁচি মাপেই তো চাল দেয় ঘোষ।

সদগোপ কর্ত্তা কাঁচি এবং পাকি—অর্থাৎ ষাট ও আশী তোলার ওজনের মাপের পার্থক্য পানুকে মাপিয়া দেখাইয়া দিল। তারপর বলিল—দুধ ওপারের বাজারে কাঁচি পাঁচ পয়সা, পাকি ছ'পয়সা সের। নিজে গিয়ে দেখে এস বিশ্বাস না হয়।

তারপর সে বলিল—তোমরা যে দুজনায় খাটছ, কি দেয় তোমাদিগে? দেয় কিছু? দুটো লোক রাখতে হ'লে মাইনে কত লাগত' জান? ঘোষবাবা, ঘোষবাবা। ঘোষবাবা তোমার বেশ!

পান্থ হাঁ করিয়া সদগোপ কর্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেহখানা বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া যশোদার অঙ্গভঙ্গি করার আর বিরাম ছিল না। চোখের দৃষ্টিতে, ভ্রূয়ের কুঞ্চনে, কপালের রেখায়, পান্থকে সে অজস্র তিরস্কার করিয়া চলিয়াছিল।

পান্থর ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। ঘোষবাবার উপর, না সদগোপ কর্তার উপর, না যশোদার উপর ক্রোধে সে ঠাওর করিতে পারিল না। কিন্তু সম্মুখে ঝঙ্কারময়ী যশোদা তাহার সহজলভ্যা, সে তাহাকেই ধরিয়া দুম-দাম শব্দে প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল। বোবা যশোদার পশুর মত আর্তনাদে স্থানটা বিরক্তিজনকভাবে করুণ হইয়া উঠিল। সদগোপ কর্তা হাঁ-হাঁ করিয়া আগাইয়া আসিল। পান্থ যশোদাকে ছাড়িয়া দিয়া হন-হন করিয়া চলিয়া গেল। গেল সে নদীর ও-পারের বাজারে।

বাজারে দুধের দর সত্যই পাঁচ পয়সা। চালের দরও ছ'পয়সা। সদগোপ কর্তা মিথ্যা বলে নাই।

পান্থ ফিরিবার পথে নদীর ধারে আসিয়া একটা গাছতলায় বসিল। মন কিছুতেই গ্রামে ফিরিতে চাহিতেছিল না। ঘোষবাবা! তাহার ঘোষবাবা তাহাকে এমনিভাবে ঠকাইয়াছে?

সেদিন রাত্রে যশোদার সে কি অভিমান! ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল!

পরের দিনই আবার তাহার জীবনে দুর্ভোগ ঘনাইয়া আসিল।

সকালেই সে ঘোষবাবাকে বলিয়া দিল—লছমীর দুধ সে বেচিবে না। চাল সে তাহার কাছে কিনিবে না। বিনা বেতনে সে মহিষ চরাইবে না, যশোদাও গোয়াল পরিষ্কার করিবে না।

পান্থ চলিয়া আসিতেছিল।

ঘোষবাবা ডাকিল—এই শোন্!

কণ্ঠস্বর শুনিয়া পান্থ চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘোষবাবার একি চেহারা!

বারেন্দ্রদেশের গয়লারা এদেশের শক্তিমানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। দুধ-ঘিয়ের প্রাচুর্য্যে দেহ পুষ্ট, মহিষ লইয়া প্রান্তরে প্রান্তরে ফিরিয়া মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ ঘোষবাবা এককালে এ অঞ্চলে পালোয়ান বলিয়া খ্যাত ছিল। সেই ঘোষবাবা ক্রোধে ফুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পানু ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সে দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল —খুন ক'রে ফেলব।

পানুও ভয় পাইবার মানুষ নয়; সে বলিল—বেইমান, তু বেইমান!

ঘোষ বলিল—বেটা বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে!

পানু বলিল—আভি যায়েগা হাম। বহুদিন পরে হিন্দী কথা বলিয়া ফেলিল সে।

পানু হন-হন করিয়া আসিয়া যশোদাকে চীৎকার করিয়া বলিল—চল্, এখান থেকে চল্! থাকব না এখানে! নিয়ে আয় লছমীকে মঙলীকে।

পিছন হইতে তাহার ঘাড়ে ধরিয়া ঘোষ বলিল—একারে বেটা, একা। ঘোষ সমস্ত আমার! তোর ঘোষ বললে কে? আর যশোদাও যাবে না। ও যাবে কোথা!

কঠিন শক্তিশালী মুষ্টি। পানুর মত জোয়ানও সে মুষ্টির কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। ঘোষবাবা তাহাকে আছাড় দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। তারপর তাহার পিঠের উপর বসিয়া নিষ্ঠুর নির্ম্মম প্রহারে তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া দিল পালোয়ানী প্রহার! পানু জর্জ্জর কাতর দেহে পড়িয়া রহিল। আশ্চর্য্যের কথা, যশোদা একটা কথাও বলিল না!

ঘোষবাবা ইহাতেই নিরস্ত হইল না। প্রকাণ্ড লাঠিখানা ধরিয়া পানুকে বলিল—ওঠ বেটা ওঠ! ওঠ! নইলে খুন ক'রে ফেলব।

পানুকে উঠিতে হইল।

ঘোষ বলিল—চল।

কথা না-শুনিয়া পানুর উপায় ছিল না। পানু চলিল। ময়ূরাক্ষী পার

করিয়া ঘোষ লাঠি দিয়া মুক্ত পৃথিবীর দিকে নির্দেশ দিয়া বলিল—চলে যা। যদি গাঁয়ে ঢুকিস—তবে তোকে খুন করে ফেলব।

পালোয়ানী প্রহারে চোয়াল ছাড়িয়া যায়—হাতের গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়, সেই প্রহার হানিয়া ছিল ঘোষ। পান্থ টলিতে টলিতে খানিকটা গিয়া শুইয়া পড়িল। ঘোষ হাসিতে হাসিতে ফিরিল।

পান্থ যন্ত্রণায় অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে। মনের মধ্যে তাহার গভীর আক্রোশ! মর্ম্মান্তিক দুঃখ! প্রহারের প্রতিশোধ সে লইতে পারে নাই। তাহার লছমী তাহার মণ্ডলীকে কাড়িয়া লইয়াছে। যশোদা,—সর্ব্বাপেক্ষা আক্রোশ তাহার যশোদার উপর! রুকণী হইলে—ঘোষের পিছন হইতে কোন একটা অস্ত্রাঘাতে তাহাকে খুন করিয়া ফেলিত। যশোদা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল শুধু। একটা ক্ষীণতম চীৎকারও করে নাই।

সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল আর এক দিনের কথা। যেদিন থানার জমাদার তাহাকে মারিয়াছিল। কিন্তু প্রহার-জর্জ্জরিত দেহেও সে সেদিন বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল মনের আবেগে। আজ কয়েকবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে। ক্ষুধায় পেট খাক হইয়া গেল, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে; আঃ—তাহার লছমী মা যদি এ সময় থাকিত তবে সে শিশুর মত তাহার স্তন পান করিত। আশে-পাশে সরীসৃপ চলা-ফেরা করিতেছে—গুল্মগুলার মধ্যে। আক্রমণ করিলে আজ পান্থর আত্ম-রক্ষা করিবারও শক্তি নাই। সে আজ মরিবে! আকাশভরা তারার দিকে অর্দ্ধনিমীলিত আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলিয়া সে পড়িয়া রহিল। চেতনা তাহার তলাইয়া যাইতেছে—মনে হইতেছে সে যেন কিসের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে!

হঠাৎ কিসে তাহাকে যেন নাড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে কানের মধ্যে একটা সুরযুক্ত আঁউ-আঁউ শব্দ আসিয়া প্রবেশ করিল। দূরে কোথায় যশোদা চীৎকার করিতেছে। সে চোখ মেলিয়া চাহিল; দেখিল—তাহার মুখের উপর যশোদার মুখ। আঁউ-আঁউ করিয়া ডাকিতেছে। সে এবার ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিয়া হাঁ করিল। ইঙ্গিতে যশোদাকে বুঝাইল—জল। জল।

যশোদা তাহার মুখে ঢালিয়া দিল দুধ।

বার দুই তিন পরই সে চিনিল—এ তাহার লছমীর দুধ! স্বাদ যে তার চেনা।

কিছুক্ষণ পর সে সুস্থ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। যশোদা তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিল। তারপর পানুর গলা ধরিয়া তার সে কি কান্না! পানু তাহার গায়ে বারবার হাত বুলাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পর যশোদা নিজেই চোখ মুছিয়া আঁউ-আঁউ করিয়া দূরে দিগন্তের দিকে আঙুল দেখাইল। উঠিয়া গিয়া তাড়াইয়া আনিল লছমী ও মঙলীকে। মঙলীর পিছে বস্তাবন্দী রাজ্যের জিনিষ। পানুকে ধরিয়া সে উঠাইয়া দিল—লছমীর পিঠে। পানু বুঝিল—গভীর রাত্রে যশোদা লছমী মঙলী ও ঘরের জিনিষ-পত্র লইয়া আসিয়াছে। চলিতে চলিতে সে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইল। গ্রামের দিকে—ঘোষের ঘর লক্ষ্য করিয়া বারবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সে যেন নাচিতেছিল। পানু লছমীর পিঠে চড়িয়া চলিতেছিল। মনের মধ্যে কিন্তু একটা গভীর আক্রোশ! ঘোষবাবার প্রহারের শোধ সে লইতে পারিল না।

শোধ সে লইয়াছিল।

মাসখানেক পরে একদা রাত্রে দশ মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া সে ঘোষবাবার ধানের মরাইয়ে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল।

উঃ—সে কি আগুন! সে কি চীৎকার! ধানগুলা ফুটিয়া খই হইয়া গিয়াছিল। ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া নদীর মাঝখানের চরে দাঁড়াইয়া পানু

ন্ড দেখিয়াছিল। সঙ্গে তাহার যশোদাও ছিল। যশোদা নাচিয়াছিল—
র আনন্দে।

আগুন নিভিয়া আসিতেই যশোদাকে সঙ্গে লইয়া সে অন্ধকারের মধ্যে
য়া গিয়াছিল।

ষোল

যশোদার সেদিনের নাচন আজও পানুর মনে আছে।

পানুও নাচিয়াছিল। যশোদাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া নাচিয়াছিল।
দন তাহার মনে হইয়াছিল—যশোদা তাহাকে যত ভালবাসে এত
বাসা কোন মেয়ে কোন মরদকে বাসে নাই। যার জন্যে তাহার বাপ—
ঘোষের ঘরের আগুন দেখিয়া এমন করিয়া নাচিল। এ নাচ রুকনী
চতে পারিত? দুনিয়ায় আর কোন মেয়ে এ নাচ নাচিতে পারে বলিয়া
আজও বিশ্বাস করে না।

ঘোষ যে যশোদার বাপ—এ-কথা ও অঞ্চলে কাহারও না-জানা ছিল না।
ষও কথাটা লুকাইত না; ঘোষ নিজেই পানুকে বলিয়াছিল—আমার
ও। ওর মা ছিল আমার আশনাইয়ের মানুষ। তুইও বোষ্টম—ওর
কও আমি বোষ্টম ক'রে দিয়েছিলাম। তুই আমার জামাই।

পানু তাহাকে ঘোষবাবা বলিত সেই অধিকারে। ঘো কোনদিন
পত্তি করে নাই। যশোদাকেও সে যথেষ্ট স্নেহ করিত। যশোদা বলিয়া
নোদিন ডাকিত না; বলিত—যশোবেটী। ঘোষবাবা যশোবেটী বলিয়া
হাঁকিলে যশোদা ছুটিয়া আসিত অত্যন্ত আদরের পোষা কুকুরের মত।
বাহির করিয়া হাসিয়া আসিয়া দাঁড়াইত। সেই যশোদা রাত্রে লছমী
মণ্ডলীকে লইয়া ঘোষবাবার বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিল—তাহাতেও
তত আশ্চর্য্য হয় নাই। কিন্তু ঘোষবাবার ঘরে সে যখন প্রতিশোধে

আগুন লাগাইয়া দিল এবং সেই আগুন দেখিয়া যশোদা যখন উন্মত্ত আনন্দে নাচিল—তখন পান্নু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

আজ কিন্তু পান্নু আর আশ্চর্য্য হয় না। যশোদা তাহাকে ভালবাসিত—কিন্তু সেদিন যশোদা তাহাকে ভালবাসার জন্ত এমন করিয়া নাচে নাই। যশোদা জানিত—পান্নু তাহার; পান্নুর টাকা-কড়ি—পান্নুর রোজকার—পান্নুর লছমী, মুঙলীও তাহার—তাই পান্নুকে যখন ঘোষবাবা নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল—তখন যশোদা রাত্রে লছমী, মঙলীকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল তাহার কাছে। যশোদা বোবা কালা হইলেও বেশ বুঝিত যে, পান্নু-না থাকিলে লছমী-মঙলীর উপরেও তাহার কোন অধিকার থাকিবে না। পান্নুর ঘরে তাহার যে অধিকার—ঘোষবাবার ঘরে তাহার এক আধলা অধিকারও যশোদার নাই, এ-কথা যশোদা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই তাহার আক্রোশ। সেই আক্রোশেই সে সেদিন নাচিয়াছিল। দুনিয়া—তামাম দুনিয়াতেই ওই এক ব্যাপার। নিজের ছাড়া কেউ কারও নয়। যশোদাও ঘোষবাবার মত তাহাকে চুষিয়া খাইতে চাহিয়াছিল।

প্রায় বৎসর খানেক পর যশোদা নিজেই তাহাকে কথাটা বুঝাইয়া দিয়াছিল।

সময়টা তখন বর্ষা। পান্নু তখন যশোদাকে লইয়া ঘোষবাবার গাঁ হইতে বিশ ক্রোশ তফাতে আসিয়া বাস করিতেছিল। ঘর একখানা করিয়াছে। পাশে একটা গোয়াল। লছমীর তখন নূতন একটা বাচ্চা হইয়াছে। মঙলী বেশ বড় হইয়াছে—মাথায় শিঙ দুইটা গোলালো কালো পাথরের নুড়ির মত বাহির হইয়াছে। লছমীর দুধ নাই। পান্নু ভাবিয়া চিন্তিয়া রোজগারের জন্ত একটা বেগুনী-ফুলুরী-বাতাসা-মুড়কীর দোকান করিয়াছিল।

নাকু দত্তের দোকানের ও-পাশে ছিল মাধব ময়রার বাড়ী। বাল্যকালে সে মাধবের বাড়ী গিয়া বসিয়া থাকিত। ভিয়ান অর্থাৎ মিষ্টান্ন তৈয়ারী দেখিতে বড় ভাল লাগিত তাহার। কড়ায় চিনির পাক টক-বগ করিয়া

ঃটিত—সেই রস গোল হাতায় তুলিয়া কাঠি দিয়া ফেটাইলে ঘন সাদা হইয়া উঠিত আর মাধব কাঠির কৌশলে কাটিয়া কাটিয়া খেজুরের চ্যাটাইয়ের উপর াতাসা ফেলিত—মোমবাতির টোপার মত। সে মাধবকে সাহায্য করিত। া-ঘরের দল হইতে পলাইয়া আসিয়া দিদি চারুর বাড়ীতে পানু এই বাতাসা- দমা এবং অন্য মিষ্টির দোকান দেখিয়াছিল। সে খাবারের দোকানই করিল।

ময়ূরাক্ষীর কূল ছাড়িয়া সে আসিয়াছিল কোপাই নদীর ধারে। পার াটার উপরে ঘর বাঁধিয়াছিল। পাশে একটা সাঁওতালদের বস্তী। ামুখে নদী। নদীর ধারে ধারে এক হাঁটু উঁচু সবুজ ঘাস। কয়েকদিন একটা াছতলায় থাকিয়া—খোঁজ-খবর লইয়া সে এবার সর্ব্বাগ্রে জমিদারকে দশটা াকা দিয়া অনুমতি জোগাড় করিল, তবে আরম্ভ করিল ঘর। সে মাটি কাপাইল—যশোদা মাথায় হাড়ি করিয়া জল আনিল। কাদা হইলে দুইজনে তাহারা কাদার উপর নাচিত। সে দেওয়াল দিল—যশোদা মাটি তুলিয়া দিল। কত কথাই যে মনে পড়িতেছে! কত খুটিনাটি! যশোদা কি পরিশ্রমই না করিত। ঘর-দুয়ার হইতে গোয়াল পরিষ্কার, লছমী মঙলীর সেবা, কাঠ- কুটা সংগ্রহ, পানুর ভিয়ানের সময় তাহাকে সাহায্য করিয়া ফিরিত সে াকীর মত। ইহার উপর যশোদার ছিল ছোট একখানি ক্ষেত। সাঁওতালদের াড়ী হইতে শাক-সব্জীর বীজ সংগ্রহ করিয়া সেই ক্ষেতে ফসল ফলাইত। াড়ীর পাশেই ছোট্ট এক টুকরা জমি। পানুর প্রথম প্রথম ভাল লাগিত া, কিন্তু যখন ফসলে শীষ দেখা দিল—লতাগুলি ফুলে ফলে ভরিয়া উঠিল— তখন সেও মাতিয়া গেল যশোদার সঙ্গে। পানুর দেহখানা তখন অসুরের মত াক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় সে যদি ঘোষবাবুর সঙ্গে লড়িত তবে ক হারিত সে কথা বলা শক্ত।

সামনে বর্ষা পাইয়া পানু মাটি কোপাইয়া গোবর আবর্জ্জনা মিশাইয়া ক্ষেতখানাকে দ্বিগুণ বাড়াইয়া ফেলিল। যশোদা তাহাতে শাকের বীজ

ছড়াইয়া—কুমড়া—লাউয়ের বীজ পুঁতিল। কিন্তু তাহাতেও পানুর তৃপ্তি হইল না! সাঁওতালদের বাড়ীর পাশে বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা জমিতে ভুট্টার গাছ বাহির হইয়াছে। তাহার সাধ হইল—এমনি বিস্তীর্ণ জমিতে ফসল লাগাইয়া পৃথিবীর খাঁ-খাঁ করা বুক সবুজ করিয়া দিবে। তাহাতে ফুটিবে ফুল—তাহাতে ধরিবে ফল। চিন্তা করিয়াও পানুর নাচিতে ইচ্ছা করে।

সেদিন বর্ষা নামিয়াছিল। বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় জল নামিল। আকাশের বুকের মেঘ যেন মাটির বুকে নামিয়া আসিতে চাহিতেছে। মেঘের রঙ সন্তান-সম্ভবা কালো মেয়ের মুখের মত। কালো রঙ ফ্যাকাসে হইলে যেমন হয় তেমনি। চারিপাশ বৃষ্টির ধারায় ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। ক্ষেত ঢাকিয়াছে—গ্রাম ঢাকিয়াছে—নদীর ধারের জঙ্গল ঢাকিয়াছে—নদীর ঢালু পথ—নদীর বুক—সব কে যেন একখানা চাদর আড়াল দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছে। ঝাপসা! সব ঝাপসা!

পানু বাতাসা কাটা শেষ করিয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল।

আঁউ-আঁউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল যশোদা! সে ছুটিয়া গেল। দেখিল—জলের নালা বাহিয়া নদী হইতে একটা মাছ উঠিয়া আসিয়াছে। যশোদা সেটাকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেছে না। হা-ঘরেদের কাছে সে সাপ ধরা শিখিয়াছিল। খপ্ করিয়া পানু মাছটার মাথা চাপিয়া ধরিল। হাততালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল যশোদা। আবার সে চেঁচাইয়া উঠিল—আঁউ-আঁউ! তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পানু দেখিল—তাহার পিছনে আরও একটা মাছ! সেটাকে ধরিতে গিয়া সে আবিষ্কার করিল—সারিবন্দী মাছ উঠিয়া আসিতেছে। তাহার একটা নেশা ধরিয়া গেল।

যশোদাকে ইসারা করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—ঘর-দুয়ার রহিয়াছে—তুই থাক। আমি মাছ ধরিয়া আনি।

যশোদা আঁউ-আঁউ করিয়া উঠিল।

যশোদার ওই এক দোষ। কথা সে সব সময় বুঝতে পারে না। তাহার

মন যে-দিকে ছুটিয়া চলে—তাহার উল্টা কথা হইলে সে-কথা তাহার মাথায় কিছুতেই ঢুকিবে না। যশোদার হাত ধরিয়া সে তাহাকে দাওয়ার উপর বসাইয়া দিল; ইসারা করিয়া বুঝাইয়া দিল—লছমী মণ্ডলীকে ঘরে বাঁধিতে বলিল। তারপর সে বাহির হইল মাছের সন্ধানে। বাপরে বাপ! কত মাছ! কত! সারি সারি চলিয়াছে উজানে। মাছগুলার ওই এক খেয়াল। বর্ষার আরম্ভে উজান বাহিয়া চলিবে। যেন উহারা ঠিক বুঝিতে পারে—এইবার বর্ষা নামিয়াছে, পুকুর খাল বিল ভরিয়া উঠিয়াছে—নদীর উজানে নালা বাহিয়া তাহারা সেখানে বেড়াইতে চলে। আবার আশ্বিন মাসে বৃষ্টি নামিলেই মাছগুলা স্রোতের টানের মুখে পুকুর খাল বিল হইতে বাহির হইয়া ছুটিবে। ঠিক বুঝিয়াছে—বর্ষা ফুরাইয়া আসিতেছে। ক্রমে এইবার খাল বিল পুকুরের সঙ্গে নদী নালার যোগ কাটিয়া যাইবে, পুকুর খাল বিল মরিয়া আসিবে; তখন স্রোতের টানের মুখ নদীতে পড়িয়া যাইবে; ছোট নদী হইতে বড় নদীতে, বড় নদী হইতে সমুদ্রে। পান্নু মাছ ধরিয়া হাতের বালতীটা প্রায় ভরিয়া ফেলিল। ওদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছু দেখা যায় না। সে বাড়ী ফিরিল। বাড়ী অন্ধকার। আলো জ্বালা হয় নাই।

সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—যশো—যশো!

হঠাৎ নজরে পড়িল—গোয়াল-ঘরে আলোর আভাস। গোয়ালের ঝাঁপ ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—লছমী শাবক প্রসব করিতেছে। আলো হাতে যশোদা দাঁড়াইয়া আছে। অদ্ভুত দৃষ্টি তাহার চোখে।

লছমীর বাচ্চা হইতেছে—পান্নুও খুসী হইল। এবার লছমী যেমন মোটা সোটা হইয়াছে তাহাতে সে এবার দুধ ঢালিয়া দিবে। অন্ধকারে আসিয়াই সে বালতীটা রাখিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল কাপড় গামছার জন্য। সামনেই পড়িয়া আছে—বাতাসা কাটা খেজুরের চ্যাটাইটা। চ্যাটাইটায় পা না দিয়া উপায় নাই। জলে ভিজিয়া শীত করিতেছে। সে চ্যাটাইটার

উপর পা দিতে দ্বিধা করিল না। সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করিল—একটা ঠাণ্ডা মসৃণ গোল দড়ি এক মুহূর্ত্তে তাহার পায়ে জড়াইয়া গেল। গাঢ় অন্ধকার। চোখে কিছু দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল না যে—সে সাপের মাথায় পা দিয়াছে, সাপটা লেজ দিয়া তাহার পায়ে পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে। সে একবিন্দু চঞ্চল হইল না। বাঁচিয়া সে গিয়াছে; মাথাটাই পায়ের তলায় চাপা পড়িয়াছে—নহিলে এতক্ষণ কাঁটার মত দাঁত বসিয়া যাইত কখন। কিন্তু সাপের লেজের পাকও বড় কম সাংঘাতিক নয়। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কষিয়া ধরিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসাড় করিয়া ফেলিবে। পায়ের চাপ শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে সয়তান মরণ কামড় বসাইয়া দিয়া শোধ লইবে। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—যশো!

আবার ডাকিল—যশো!

এদিকে সাপটা পাক কষিতেছে। সেও দুরন্ত চাপে পা দিয়া দলিতে আরম্ভ করিল, পায়ের তলায় চাপাপড়া খেজুরের চ্যাটাইয়ের অংশটাকে।

পায়ের শিরাগুলা টন-টন করিতেছে। প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ডাকিল—যশো—যশো! পাঙ্গু শুনিল, তাহার ডাক ডাকাতের হাঁকের মত বর্ষণ-সিক্ত নদীর আঁকে-বাঁকে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছে! কিন্তু যশোদার কোন সাড়া নাই। বোবা কালা যশোদা বিহ্বল হইয়া দেখিতেছে লছমীর সন্তান-প্রসব।

—যশো—যশো—যশো! সঙ্গে সঙ্গে চাপ মারিল—পিষিল—কঠিন দলনে। হঠাৎ পাশের দেওয়ালে হাত দিতেই সে পাইল একটা লোহার বড় গজাল। গজালটাকেই টানিয়া তুলিয়া—সেটার তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগ দিয়া সাপটার বেড়গুলাকে কাটিতে আরম্ভ করিল। কাটিয়াও ফেলিল। পায়ের বেড় কাটিয়া সে লাফ দিয়া সরিয়া আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তারপর সে গেল গোয়াল-ঘরে। আলো হাতে লইয়া যশোদা তখনও দাঁড়াইয়া আছে। লছমী একটা শাবক প্রসব করিতেছে! পাঙ্গুকে দেখাইয়া যশোদা আঁউ-

ক্যাঁউ করিয়া উঠিল। লছমীর বাচ্চাটাকে দেখাইল—আর সে হাত দিল নিজের গর্ভের উপর। কিন্তু সেদিকে আকৃষ্ট হইবার মত মনের অবস্থা তখন পান্নুর ছিল না। সে তাহার হাত হইতে আলোটা ছিনাইয়া লইয়া ঘরে আসিয়া দেখিল—সাপটার মাথার দিকটা তখনও নড়িতেছে। হাত দেড়েক লম্বা একটা গোখুরা! সে শিহরিয়া উঠিল।

ঠিক এই কারণেই, যশোদা কানে শোনে না—বিপদে ডাকিলে তাহার সাড়া মেলে না—এই জন্যই পান্নু মনে মনে ভাবিয়া চিন্তিয়া আবার একটা বিবাহ করিয়া বসিল। এ মেয়েটি পান্নুর সমবয়সী—হয়তো বা দুই-এক বৎসরের বড়ই হইবে।

পান্নুর অবস্থা স্বচ্ছল। তাহার উপর মেয়েটা নাকি কিছুদিন পূর্ব্বে কোন একজনের সঙ্গে দেশান্তরী হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিছুদিন আগে রুগ্ন দেহ লইয়া গ্রামে ফিরিয়াছে। আত্মীয়-স্বজনে ঘরে লয় নাই। ভিক্ষা করিয়াই মেয়েটা ফিরিতেছিল। পান্নু তাহাকে বলিল—আমাকে বিয়ে করিস তো তোকে খেতে পরতে দোব।

মেয়েটা গ্রামান্তরে ভিক্ষার পথে পান্নুর দোকান দেখিয়াছে; সে বলিল—তোমার সেই বোবা বউটা?

—সেও থাকবে। তুইও থাকবি।

মেয়েটা চুপ করিয়া রহিল।

পান্নু বলিল—তবে মরগা তুই। তোকে বিয়ে করব, খেতে দোব, পরতে দোব—শুধু কানে কথা শুনবি—মুখে কথা বলবি—কাজকর্ম্ম করবি সেই জন্যে। নইলে ভাগ্—! তুই তো ভাগাড়ের মড়ি!

মেয়েটা খানিকটা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—বেশ। কিন্তু তাড়িয়ে দিলে আমি যাব না। আজন্ম খেতে পরতে দিতে হবে। ভদ্দনোকের কাছে বল তুমি সেই কথা।

পান্নু বলিল—আলবৎ। চল্ কার কাছে যেতে হবে। ওই

তাহার বিবাহ। ভদ্রলোকের কাছে বলিয়া পানু তাহাকে লইয়া ঘরে আসিল।

যশোদা আঁউ-আঁউ করিয়া প্রশ্ন করিল—কে? ও কে?

পানু তাহাকে ব্যাপারটা বুঝাইতে চেষ্টা করিল।

যশোদা যেন পাথরের পুতুল হইয়া গেল। সে সমস্ত দিন কিছু খাইল না। পানু তাহাকে কত ডাকিল—সাড়া দিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রে পানুর হঠাৎ শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল।

নূতন বউটা গোঙাইতেছে। পানু ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ঘরের মধ্যে নিশ্বাস লওয়া যায় না। সে বিছানার পাশ খুঁজিয়া দেখিতে চাহিল যশোদাকে। যশোদা নাই। সে কোন মতে আসিয়া দরজা খুলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিল, বাহির হইতে দরজা বন্ধ। খড়ের ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে, উপরে লাল আগুনের ছটা। ঘরে আগুন লাগিয়াছে। ধোঁয়ায় শ্বাসস্থলী ফাটিয়া যাইবে। প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগে সে দরজাটা টানিল। সে টানে পলকা কাঠের দরজার জোড়াটা ছাড়িয়া গেল। পানু এবার হিড়-হিড় করিয়া নূতন বউটাকে টানিয়া আনিয়া বাহিরে ফেলিল। যশোদাকে সে খুঁজিতে চেষ্টা করিল না। সে বেশ বুঝিয়াছে—ঘরের মধ্যে খড়ের ধোঁয়া এবং ধোঁয়ার উপরে লাল আগুনের ছটা দেখিয়াই সে বুঝিয়াছে—ঘোষবাবার ঘরে আগুন দিয়া সে যেমন আক্রোশ মিটাইয়াছিল, যশোদাও তেমনি তাহার ঘরে আগুন দিয়া আক্রোশ মিটাইয়া পলাইয়া গিয়াছে। ঘরের বাহির হইতে শিকল দেওয়াটাই তাহার বড় প্রমাণ। ঘরটা গুমিয়া গুমিয়া পুড়িতেছে। বর্ষার বর্ষণসিক্ত চালের খড় দাউ-দাউ করিয়া জ্বলে নাই। যশোদা পলাইয়াছে। সে ছুটিয়া গেল গোয়াল-ঘরের দিকে। না—লছমী মণ্ডলী আছে। সে শীতল স্নিগ্ধ বাতাসে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। নূতন বউটা এখনও মরার মত পড়িয়া আছে। উঃ, সেদিনের কথা আজও পানুর মনে আছে।

তিন দিন পরে যশোদার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল।

একটা মেলায়—রথের মেলায়—তাহাকে পাওয়া গিয়াছিল—একটা মৃত ভ্রূণ প্রসব করিয়া যশোদা মরিয়া পড়িয়াছিল রক্তাক্ত কলেবরে।

থানার কনেষ্টবল আসিয়াছিল তাহার কাছে।

তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কনেষ্টবলটা বলিল—লাসটা তাহার দেখা দরকার।

সে গিয়াছিল।—হ্যাঁ যশোদা; আমার পরিবারই বটে। তিনদিন আগে আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল।

দারোগা বলিল—চরিত্র খারাপ ছিল, না?

পান্থর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

দারোগা বলিল—আমরা যা খবর পেয়েছি, [illegible] মেয়েটাকে পরশু থেকে জন চারেক বদমাসের সঙ্গে দেখা গিয়াছিল। খুব [illegible] খেয়েছিল—হল্লা করেছিল। তারপর আজ সকালে দেখা যাচ্ছে এই [illegible]—মরে প'ড়ে আছে। মেয়েটি সন্তানবতী ছিল—ডাক্তার বলছেন—সম্ভবতঃ অতিমাত্রায় পাশবিক অত্যাচারে—।

পান্থ সেই ভ্রূণটাকে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দুইহাতে তুলিয়া লইয়া দেখিয়া নামাইয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

দুনিয়া ভোর মানুষের এক ব্যাপার—এক খেলা চলিতে [illegible] সব নিজে, সব নিজে। নিজের জন্যই মানুষ খেলা খেলিতেছে। দা[illegible]—জমিদার—গুরু—দিদি—নায়েব—ঘোষবাবা—যশোদা—সবারই ওই এক খেলা। তবে হ্যাঁ, ভেল্কীর খেলা!

সতেরো

ফিরিবার সময় সমস্ত পথটা সে ঐ কথাই ভাবিয়াছিল। সে-দিনও তাহার জীবনের আগাগোড়া কাহিনী মনে মনে উত্তপ্ত কড়াইয়ের ফুটন্ত গুড়ের মত

আলোড়িত হইয়াছিল—নীচের জিনিষ উথলিয়া—ফুলিয়া—উপরে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

দুনিয়ার সব ফাঁকি—সব মেকী! ঝুট—ঝুট—সব ঝুট! মিথ্যা—বাজে। ভালবাসা—মমতা—দয়া মায়া বিলকুল ঝুট্। ধর্ম্ম পুণ্য—মিথ্যা বাজে। সব ওই ভেল্কীর খেলা। ও সবগুলা এক একটা ভেল্কী। ওই ভেল্কী লাগাইয়া মানুষ আপন আপন কাজ হাঁসিল করিয়া লয়।

দারোগা—জমাদার খুনের সুবিধা পাইয়া ভেল্কী লাগাইয়া দিল।—তদন্তের ভেল্কী। ভেল্কী লাগাইয়া চারুকে লইয়া যে আকাঙ্ক্ষা ছিল—পূরণ করিয়া লইল।

চারু তাহাকে ভাই বলিয়া স্নেহের ভেল্কী লাগাইয়া তাহার সংসারের কাজ হাঁসিল করিয়া লইত।

জমিদারের পেয়াদা—গোমস্তা অধিকারের ভেল্কী লাগাইয়া তাহার টাকার গেঁজেলটা কাড়িয়া লইতে চাহিয়াছিল। ওরে বাবা—জমি তোর বটে—সে কথা পানু মানে, কিন্তু জমি তো লোকে ভোগ করিবে বলিয়াই তুই রাখিয়াছিস! গোমস্তা—পেয়াদা রাখিয়া সেরেস্তার দোকান খুলিয়া রাখিয়াছিস! তবে? পানু তো খাজনা দিতে নারাজ ছিল না। আসলে তুয়কীটা হইল—গোমস্তা-পেয়াদার ভেল্কী। ওঃ, কতকগুলা গদাগদ কিল যে পানু বসাইয়া দিয়া আসিয়াছে—এই পানুর তৃপ্তি! শুরু! আঃ—হা—হা। এতবড় ভেল্কীদার আর পানু দেখে নাই। ধরা পড়িয়া গুরুটা নাচিতে শুরু করিয়া দিয়াছিল। পানুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। বহুৎ আচ্ছা ভেল্কী!

ঘোষবাবার ভেল্কীটা কিন্তু জবরদস্ত ভেল্কী।

যশোদার ভেল্কী আজ সে দেখিল। ওঃ, কি মিঠা মিহি ভেল্কী! কেয়াবাৎ ভেল্কী! যশোদার জীবনের আগাগোড়াই যে এমনি ধারার ভেল্কী, সে পানু কোন দিন ভাবিতে পারে নাই। আঃ—যশোদার ভেল্কীটা যদি না ভাঙিয়া

যাইত! আহা—হা রে! যশোয়া—যশোদিয়া, যশিয়া—যশোমতিয়া, যশি—যশো—কত নামেই সে যে তাহাকে ডাকিত!

আজও যশোদাকে মনে পড়িলে পানুর চোখে জল আসে।

বাড়ী ফিরিবার পথে—ওই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন উদ্‌ভ্রান্ত যে—তাহার পথ পর্য্যন্ত ভুল হইয়া গিয়াছিল। কোপাই নদীর ঘাটে আসিয়া তাহার সে খেয়াল হইল। নদী কোপাইই বটে। কিন্তু এ ঘাটটা তো তাহার বাড়ীর পথের ঘাট নয়। কই—ওপারে উঁচু ডাঙ্গার উপর তাহার দোকানখানা কই? দোকানের পিছনে সাঁওতালদের পাড়াটা কই? ওঃ—এটা যে চিত্তরায় ঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে। মাঠের পথের এই বিপদ! চিত্তরার ঘাটেই নদী পার হইয়া অনেকটা ঘুরিয়া তবে সে আপনার বাড়ীর এলাকায় আসিয়া পৌঁছিল। দূর হইতে তাহার বাড়ীটা দেখা যাইতেছিল। বাড়ীর একটা পাশের দিক—যে দিকটা যশোদা করিয়াছিল—সজী ক্ষেত। সজীক্ষেতের সবুজ গাছগুলি দূর হইতেই নজরে পড়িতেছিল।

হন-হন করিয়া পানু আসিয়া ক্ষেতের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াইল; তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বাড়ীর সামনের দিকে আসিল।

ওঃ, দোসরা বউটা পিছন ফিরিয়া বসিয়া খাইতেছে। খুব জমাইয়া খাওয়াটা আরম্ভ করিয়াছে। পানু আসিয়াছে—সে খেয়াল পর্য্যন্ত নাই। পানু গিয়া পিছনে দাঁড়াইল। ও হোঃ! এক বাটী দুধ—আট দশখানা বাতাসা—খানিকটা ময়দা-গোলা; ওরে বাপরে!

পানু দাওয়ার উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বউটা চমকিয়া উঠিল—মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে হইয়া গেল। পানু বলিল—লে—লে—খেয়ে লে। খেয়ে লে।

বউটার তবু হাত নড়ে না।

পানু আবার বলিল—খা—খা। লে খা। বলিয়া সে ঘরের ভিতর ঢুকিল। তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে। ঢক-ঢক করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া সে বাহিরে আসিল—দেখিল—বউটা এখনও তেমনিভাবে বসিয়া আছে।

আরে—! পানু ধমক দিল। লে—লে—খেয়ে লে।

বউটা এবার দুধের বাটিটা মুখে তুলিয়া ধরিল। কিন্তু থর-থর করিয়া তাহার হাত কাঁপিতেছে। পানু হাসিল। খাওয়া শেষ করিয়া বাটিটা মাটিতে নামাইবা মাত্র পানু উঠিয়া গিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিল। আয়! এইবার আয়!

মেয়েটা চীৎকার করিয়া উঠিল।

পানু অন্যহাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল—ক্যাক ক'রে টিপে মেরে দেব যদি চিল্লাবি।

মেয়েটা চুপ হইয়া গেল। আতঙ্কে বিস্ফারিত বড় বড় চোখ দুইটা হইতে জলের ধারা গড়াইয়া পড়া কিন্তু বন্ধ হইল না।

ভেল্কী! এও ভেল্কী!

বহুৎ মিঠা আর মিহি ভেল্কী কিন্তু। মেয়েটা রোগা হইলেও—দেখিতে ভাল। এও এক ভেল্কী! পানু মেয়েটার চুল ছাড়িয়া দিল।—যাও।

মেয়েটা ভয়ে এমন অভিভূত হইয়া গিয়াছিল যে পানু চুলের মুঠি ছাড়িয়া দেওয়া সত্ত্বেও নড়িতে পারিল না।

পানু আবার বলিল—যাও।

মেয়েটা এবার সকাতরে বলিল—আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

পানু হাসিতে আরম্ভ করিল।

মেয়েটা তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।—তোমার পায়ে পড়ি।

পানু কপালে ঠেলা দিয়া তাহার মুখখানাকে চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল। মেয়েটার চোখ দিয়া জলের ধারার বিরাম নাই। মেয়েটা বলিল—আর আমি চুরি ক'রে খাব না।

পান্নুর রাগ বাড়িয়া গেল। তাহার খেয়াল হইয়া গেল—'চুন্নী' মেয়েটা চুরি করিয়া খাইয়াছে। সে এবার দুম দাম শব্দে গোটা কয়েক কিল তাহার পিঠে বসাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল। মেয়েটা তবু তাহার পা ছাড়িল না।—আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না, না খেয়ে আমি মরে যাব।

ওই এক ভেল্কী। সকলের বড় ভেল্কী। পেট! ওই পেটই সব চেয়ে বড় ভেল্কী!

পান্নু মেয়েটাকে আর কিছু বলিল না। কথাটা মেয়েটা মিথ্যা বলে নাই। যে-রকম হাড়-পাঁজরা বাহির হইয়া আছে—তাহাতে ওর মরিয়া যাওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়।

আরও আশ্চর্য্যের কথা—পান্নু পরদিন হইতে নিজেই মেয়েটার জন্য দুধের বরাদ্দ করিয়া দিল। মেয়েটার মুখখানা দেখিয়া কেমন মায়া হয়। ডবডবে চোখ দুইটাতে ভেল্কী আছে।

ওঃ, সে যে কি ভেল্কী, রাজিয়ার চোখের যে কি ভেল্কী—সে ভাবিয়া পান্নুর আজও চমক লাগে। মেয়েটার নাম রাজি। রাজবালা বা রাজলক্ষ্মী কি রাজরানী সে পান্নু আজও জিজ্ঞাসা করে নাই। প্রথম দিনই তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কি নাম তোর?

সে বলিয়াছিল—রাজু।

পান্নু বলিয়াছিল—রাজু? রাজু?

—হ্যাঁ।

প্রথম-প্রথম সে তাহাকে 'রাজি' বলিয়াই ডাকিত। রাজির দেহ দুর্ব্বল—সে বেশী খাটিতে পারিত না। এবং সে জন্য তাহার ভয়ের কাতরী ছিল অত্যন্ত। তাই পান্নু তাহাকে কিছু বলিতে পারিত না। কিন্তু রাজির আর একটা গুণ ছিল। রাজি বড় বাহার জানে। ঘর-দুয়ার গুলিকে সে এমনভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া ঝকমকে করিয়া তুলিল—চারিদিকে এমন একটা বাহার

তৈয়ারী করিয়া তুলিল যে পান্নুর সেটা ভাল লাগিল। বর্ষার সময় রাজি ঘরের দাওয়ার পাশে কতকগুলা গাঁদা দোপাটির চারা লাগাইল। কার্ত্তিকের প্রথমে তাহাতে ফুল ধরিল।

দাওয়ার উপর রাজি বাহার করিয়া দোকান সাজাইয়া দিল। ইঁটের থাক দিয়া তক্তা পাতিয়া সিঁড়ির মতন করিয়া তাহার উপর সে বাতাসা-কদমা-মুড়ি-মুড়কীর দোকান সাজাইয়া দিল। পান্নুর সেটা ভাল লাগিল। সে আদর করিয়া বলিল—বহুৎ আচ্ছারে রাজি!

রাজি তাহার দিকে ডবডবে চোখ দুটি তুলিয়া হাসিল।

আশ্চর্য্যের কথা—পান্নু আজ রাজির চোখে যে ভেল্কী দেখিল—সে ভেল্কী কখনও দেখে নাই। শুধু রাজির চোখেই নয়, রাজির মুখেও ওই ভেল্কীর ছটা খেলিতেছে। মুখখানা বেশ পুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজির রঙ ফরসা। ফরসা রঙে রাজির গালে লালচে আভা। খোলা হাত-দুখানা নরম সুডৌল হইয়া উঠিয়াছে। পান্নু আগাইয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। রাজি তাহার মুখের দিকে চাহিল—চাহিয়াই কিন্তু সে আজ নির্ভয়ে আপনার হাত টানিয়া লইয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

পান্নু সেইদিন ডাকিয়াছিল—রাজিয়া!

রাজিয়া উত্তর দেয় নাই। ভেল্কীদারনীরা ঠিক জানিতে পারে—ভেল্কী লাগিয়াছে কিনা! ইহার পর হইতে রাজিয়া দূরে দূরে থাকিতে আরম্ভ করিল। আশ্চর্য্য ভেল্কী! পান্নুর জোর জবরদস্তী কোথায় যেন উপিয়া গেল! দূর হইতে রাজিয়া ডবডবে চোখের ভেল্কী-মাখা দৃষ্টি তুলিয়া পান্নুর দিকে চায়। সন্ধ্যা হইতে আলাদা ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া শোয়। পান্নু ডাকিলে সাড়াও দেয় না। পান্নু কিন্তু প্রাণপণে ভেল্কী হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু একদিন ভেল্কী পান্নুর রক্তে আগুন ধরাইয়া দিল।

পান্নু কোন কাজে গাঁয়ে গিয়াছিল। ফিরিল যখন তখন অনেক বেলা হইয়াছে। দাওয়ার উপর বাহিরে রাজি ছিল না। দরজাতেও তালা

ঝুলিতেছিল। কোথায় গেল রাজি? দাওয়ার উপর বসিয়া আছে, এমন সময় রাজি স্নান করিয়া ফিরিল। ভিজা কাপড়ে রাজির নূতন পরিপুষ্ট দেহখানির অকুণ্ঠিত রূপ পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে। ভিজা কাপড়ে রাজিকে পানু একদিনও দেখে নাই। পানু জল খাইয়া লছমী মণ্ডলী এবং নূতন বাছুরটাকে লইয়া যাইত নদীর ধারে, সেই সময়টি ছিল রাজুর স্নানের নির্দ্দিষ্ট সময়।

পানুর রক্তের আগুন চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে সেই দৃষ্টি লইয়া রাজির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। রাজি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু আর বিদ্রোহ করিতে সাহস করিল না। রাজিয়ার ডবডবে চোখের সে ভেল্কী-মাখা দৃষ্টি আজও আছে। রাজিয়া তাহার ঘরেই রহিয়াছে। সে-ই এখন গৃহিণী। তাহার মত প্রচণ্ড মার খাইতে আর কেহ পারে না। সন্তান-সন্ততি রাজিয়ার নাই। রাজিয়ার মত চোরও কেহ নাই। রাজিয়া চোর। টাকা পয়সা চুরি করিয়া সে বেশ মোটা রকমের সঞ্চয় করিয়াছে। যশোদার মত পানুর সব সে চায় নাই, তাহার ভেল্কীর গ্রাস এতখানি নয়; রাজিয়া ভেল্কী লাগাইয়া আপনার ভাগ বুঝিয়া লয়। ইদানীং একদিন পানু তাহার পিঠের চামড়া সাঁড়াশী দিয়া ধরিয়া পাক দিয়া যন্ত্রণা দিয়াও রাজিয়ার সঞ্চয়ের স্থান বাহির করিতে পারে নাই। রাজিয়া কিন্তু অদ্ভুত। সে চেঁচায় না। যন্ত্রণায় তাহার চোখ দিয়া জল গড়ায় আর ডবডবে চোখ দুইটা পলক-হীনভাবে মেলিয়া বসিয়া থাকে।

সে আমলে অর্থাৎ পানুকে যখন তাহার ভেল্কীতে সে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল ও পাগল করিয়া রাখিয়াছিল—তখন সে প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু আদায় করিয়া লইত। পানু তাহার কাছে আসিলেই সে হেলিয়া দুলিয়া বলিত, আজ কিন্তু আমার একটি জিনিষ চাই।

রাজিয়ার অদ্ভুত যাদু! পানু কিছুতেই তখন সচেতন হইতে পারিত না। রাজিয়াও তাহার দাবী আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও ধরা দিত না। তখন

এ কথাগুলি মনে হইত না। এখন মনে হয়। আজ বেশী করিয়া মনে হইতেছে। ভেল্কীদারনী রাজিয়ার ক্ষমতাকে সে তারিফ করে। তাহার দাবী পূরণ না করিয়া পান্নু শক্তি-প্রয়োগে রাজিয়াকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিলে—রাজিয়া ধরা দিত, মরার মত। ওই চোখ সে এমন করিয়া চাহিত যে—পান্নু তৎক্ষণাৎ হার মানিত। হাসিয়া আদর করিয়া দাবীর অধিক দিয়া তবে নিজে সে খুসী হইত।

রাজিয়ার বুদ্ধিরও সে তারিফ করে।

যশোদা তাহাকে ক্ষেতের নেশা ধরাইয়াছিল। সে পরের বৎসর ডাঙা কোপাইয়া সাঁওতালদের মত ভুট্টা চাষের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

রাজিয়া তাহাকে বলিল—ভুট্টা লাগিয়ে কি হবে? ধান চাষ কর।

—ধান চাষ? পান্নুর মস্তিষ্কে কল্পনা আছে—কিন্তু প্রদীপের সলিতার মত তাহার প্রান্তে অগ্নিশিখা সংযোগে জ্বালাইয়া দিতে হয়। মুহূর্ত্তে পান্নুর দৃষ্টি গিয়া পড়িল—চষা-খোঁড়া তকতকে ধানক্ষেতের উপর। সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। বর্ষার সময়ের ছবি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—সবুজ কাঁচা ধানে ভরা ক্ষেত, তারপর বর্ষার শেষে ধানের গাছে শীষ জাগিয়া উঠে। সদ্য বাহির হওয়া শীষের মধুর গন্ধের স্মৃতি তাহার মনে পড়িল। তারপর পাকা ধানের ক্ষেত। সোণার বরণ ধান। ধান মাড়াই হয়। মরাইয়ে উঠে। খামার আলো করিয়া থাকে। ঘোষবাবার ক্ষেত-খামারের কথা মনে পড়িল। সেই চাষী যে তাকে ঘোষবাবার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়াছিল—তাহার খামারের কথা মনে পড়িল। পান্নু লাফাইয়া উঠিল—হ্যাঁ, সে ধান চাষই করিবে।

হাসিয়া রাজিয়া বলিল—জমি কেন, তারপর গরু কেন—হাল কর। তুমি চাষ করবে—আমি তোমার দোকান করব।

ধানের জমি কিনিবার জন্য পান্নু ক্ষেপিয়া উঠিল। জমি মিলিল। দু'শো টাকা দিয়া পাঁচ বিঘা নদীর ধারের জমি কিনিল সে এক চাষীর কাছে।

পাঁচ বিঘা জমির জন্য এক জোড়া হেলে বলদ কেনা যায় না। পান্নুর

বুঝিতে কিনিতে কোন বাধা ছিল না। রাজিই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল—মুখে মুখে হিসাব দেখাইয়া দিল। অগত্যা জমিটা চাষের ব্যবস্থা হইল—হাল কিনিয়া। অর্থাৎ ভাড়া লইয়া চাষী তাহার জমি চষিয়া দিয়া গেল, পান্নু নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনমজুর লইয়া জমিটা আবাদ করিয়া ফেলিল। পান্নু চাষের পদ্ধতি খুঁটি-নাটি ভাল জানিত না—কিন্তু পরিশ্রম করিল অসুরের মত।

রাজিয়া মাঠেই তাহার জন্য খাবার লইয়া আসিত।

প্রকাণ্ড বড় বাটিতে রাশিকৃত মুড়ি, লছমীর দুধ, বাতাসার গুঁড়া। পান্নু পেট ভরিয়া খাইত। আবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ছোট চুপড়ী ভরিয়া মাছ ধরিয়া বাড়ী ফিরিত। রাজিয়া আদর করিয়া তাহার গায়ের কাদা ধুইয়া—তেল মাখাইয়া দিত। স্নান করিয়া ফিরিলে থালার উপর ঢালিয়া দিত গরম ভাত—মাছ—তরকারী—ডাল।

চাষ শেষ হইলেও—পান্নুর জমির নেশা গেল না। জমির ধারে গিয়া বসিয়া থাকিত। প্রতিদিন লক্ষ্য করিত—গাছগুলি কেমন বাড়িতেছে; প্রথম প্রথম সে বিঘত মাপিয়া দেখিত। চাষীদের কাছে জানিয়া আসিত চাষের জন্য কখন কি করিতে হইবে। ডাক সংক্রান্তির অর্থাৎ আশ্বিনের সংক্রান্তির দিন চাষীরা মাঠে আলে দাঁড়াইয়া ধানকে ডাকে—ধান ফুলাও—ধান ফুলাও! অর্থাৎ শস্য-পূর্ণ ধান্য-শীর্ষ বাহির হও। পান্নু সেদিন ডাক দিয়া গলা ফাটাইয়া ফেলিল।

ধানের শীষ বাহির হইল—ধান পাকিল। পান্নু পাকা ধান কাটিয়া ঘরে আনিল। ধান মাড়িয়া ঘরের দাওয়ায় রাখিয়া—তাহার সামনে বসিয়া রহিল—খেলনার রাশির সম্মুখে রুগ্ন শিশুর মত। খেলিবার সাধ্য নাই—কিন্তু প্রাপ্তিতে তাহার প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। রাজিয়ার হাসি-ঠাট্টার বিরাম ছিল না। সে কিন্তু তাহার ভালই লাগিল। আগামীবার আরও জমি কিনিবার কল্পনা করিল। আরও অনেক জমি সে কিনিবে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই হঠাৎ তাহার সমস্ত কল্পনার মেলা একটা ঝড়ে যেন লণ্ড ভণ্ড হইয়া গেল।

একদিন আদালতের কর্ম্মচারী-পেয়াদা আসিয়া তাহার জমির বুকে একটা লাল পতাকা পুঁতিয়া দিল। পানু অবাক হইয়া গেল।

যাহার কাছে সে জমি কিনিয়াছিল—সে ঋণ করিয়াছিল। তাহার ঋণের দায়ে মহাজন নালিশ করিয়া জমি নীলাম করিয়াছে।

পানু সমস্ত দিন গুম হইয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যায় সে গেল বিক্রেতা চাষীর কাছে।

—আমার টাকা ফিরে দে।

চাষী হাসিল।

পানু গর্জ্জন করিয়া উঠিল—আমার টাকা দে।

—আদালত। আদালত আছে—সেখানে যা।

পানু লোকটাকে দুই হাতে আলগোছে তুলিয়া মাটির উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া বলিল—ফেল টাকা!

লোকটার চীৎকারে পাড়ার লোক আসিয়া জমিল। সকলে মিলিয়া ধরিয়া পানুকে বেশ ঘা কতক দিয়া খেদাইয়া দিল। পানু বাড়ী ফিরিল—শিশুর মত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে। প্রহারের বেদনায় নয়; সে আর কত ঠকিবে? সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার মর্ম্মান্তিক অভিযোগ—দুরোগা—জমাদার—কনেষ্টবল—গুরুঠাকুর—চারুদিদি—ঘোগবাবা—যশোদা—এই চাষীটা—সবার বঞ্চনার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়া—উর্দ্ধমুখে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া—প্রান্তরটা ভরাইয়া দিল।

রাজিয়া তাহাকে বুদ্ধি দিল—মহাজনের কাছে যাও। টাকাটা দিয়ে জমি ফিরে নাও।

—না—না—না। বাঁধ তল্পী-তল্পা, বাঁধ। এ মুলুকেই আমি থাকব না।

রাজি অবাক হইয়া গেল।—তৈরী ঘর দোর।

পানু বলিল—ফের ঘর গড়ে লিব।—চল। ই বেইমানের মুলুকে থাকব না—আমি থাকব না।

আঠারো

কোপাই নদীর পারঘাটা হইতে উঠিয়া সে এখানে আসিয়াছে।

ছোট একখানি গ্রাম। পাশেই মাইল দুয়ের মধ্যে একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম—প্রায় ছোটখাটো শহর। জেলাটার সদর হইতে একটা পাকা শড়ক আরও কতকগুলা জেলার ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়া মিশিয়াছে বাদশাহী শড়কের সঙ্গে। এ অঞ্চলের লোকে বলে বাদশাহী শড়ক—আসলে সেটা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। সেই শড়ক হইতে আর একটা পাকা রাস্তা বাহির হইয়া ছোট গ্রামখানির ভিতর দিয়া অন্তদিকে গিয়াছে। চৌ-রাস্তার মোড়ে একটা প্রকাণ্ড মজা দীঘি। স্থানটা জনশূন্য, আশে পাশে কোন বসতি নাই। গ্রামখানিও চৌরাস্তার মোড় হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে। চৌরাস্তার ধারে একটা বটগাছের ছায়ায় অনেকগুলি পথিক এবং মালবাহী গাড়ী বিশ্রাম করিতেছিল। পানুও তাহার দলবল লইয়া সেইখানে বিশ্রামের জন্য বসিয়া গেল।

রাজিয়ার কিন্তু বহুৎ বুদ্ধি। মাথা তাহার ভারী সাফ। বৈকালে পানু দেখিল রাজিয়া সেই গাছতলাতেই ব্যবসা ফাঁদিয়া ফেলিয়াছে। রান্নার জন্য যে উনানটা পানু পাতিয়াছিল সেইটাকেই আকারে বেশ খানিকটা বড় করিয়া কাদা লেপিয়া বেগুনী ফুলুরী তৈয়ারী করিয়া ফেলিল। বাঁধা দোকান—পাতা সংসার তুলিয়া লইয়া আসিয়াছে, সবই ছিল তাহাদের সঙ্গে—কড়াই, তেল, বেসম, লঙ্কা, নুন, পেঁয়াজ, এমন কি হিং পর্য্যন্ত। কিন্তু বাহাদুরী রাজুর, কিসের মধ্যে কি ছিল—সে যেন তাহার একটুখানি খুঁজিয়াই হিংয়ের পুরিয়াটা সমেত বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। কয়েক খাঁক বেগুনী কড়া হইতে নামাইতেই দোকান তাহার জমিয়া উঠিল। অপরাহ্ণের দিকে আরও অনেক গাড়ী আসিয়া জমিয়াছিল—তাহারা সব রাজিয়ার দোকান ঘিরিয়া বসিল। সন্ধ্যানাগাদ টাকা চারেকের বেগুনী ফুলুরী বেচিয়া সে-দিনের মত দোকান সামলাইয়া বলিল—এই খানেই দোকান কর।

পরের দিন রাজুবালাই গ্রামের ভিতর গিয়া একখানা ঘর ভাড়া করিল—সংসার পাতিল। অপরাহ্নে আবার কড়াই বেসম ইত্যাদি লইয়া গাছতলায় গিয়া বসিল। সেদিনও সে চার টাকার উপর বেগুনী ফুলুরী বেচিয়া বাড়ী ফিরিল। পরদিন সকাল হইতে বঙ্কিমু গ্রামখানায় গিয়া লছমীর দুধ বেচিয়া আসিল। দুধের নিত্য জোগান দিবার ঘর পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া আসিল। সেই খোঁজ করিল ওই মজা দীঘিটার মালিক কে এবং পানুকে সেই সঙ্গে লইয়া মালিকের কাছে গিয়া দীঘিটার পাড়ে কয়েক বিঘা জায়গা বন্দোবস্ত করিয়া লইল।

তাহার পরদিন হইতে লছমী, মঙলী, লছমীর নূতন বাচ্চাটা মজা দীঘির ঘাস খাইয়া ফিরিত, রাজিয়া গাছতলায় দোকান করিত, পানু মাটি কোপাইয়া কাদা করিয়া ঘর তুলিত। তাহার সেই ছোট ঘরখানি হইতে আজ তাহার টিনে ছাওয়া মাটির কোঠা হইয়াছে, গোটা দীঘিটাই আজ তাহার; মজা দীঘি ভাঙিয়া পাঁচ বিঘা উৎকৃষ্ট ধানের জমি হইয়াছে, দীঘিটার একপাড়ে তরীর বাগান, অন্য তিনটা পাড়ে ফলের বাগান গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু রাজিয়া নাই। এ সবই কিন্তু রাজিয়ার পরামর্শ। নূতন ঘরে দোকান পাতিয়া রাজিয়া প্রত্যেকদিন এক-একটি নূতন পরামর্শ দিত।

ঘর হইবার পর দোকান পাতিয়া প্রথম সে বলিল—বাকী জমিটা বেড়া দিয়ে সেখানকার মত তরকারীর ক্ষেত কর।

পানু উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে এই চায়। ভীমের মত শক্তিশালী দেহ তাহার, বসিয়া বসিয়া দোকান করিয়া ভাল থাকে না। সে বেড়া বাঁধিতে আরম্ভ করিল। রাজু অবসর সময়ে দড়ি জোগাইয়া দিল। পানু মাটি কোপাইতে আরম্ভ করিলে সেই বারণ করিল। বলিল—জল পড়ুক, তারপর দু'খানা লাঙল ভাড়া ক'রে চাষ দিয়ে নাও; তারপর আবার জল হ'লে—তখন বরং কোপাবে।

সেই তাহাকে আবর্জ্জনা পচাইয়া সার তৈয়ারী করিতে শিখাইল।

তরীর ক্ষেতে গাছ গজাইয়া উঠিবার প[র এক]দিন সেই বলিল—এবারে-বরং আর একটা পাড় বন্দোবস্ত ক'রে নাও।

তারপর একদিন বলিল—গোটা পুকুরটাই বন্দোবস্ত ক'রে নিতে হবে, বুঝলে! মজা পুকুরের তলাতে ধানের জমি হবে খুব ভাল।

একদিন বলিল—পুকুরের ভেতরে জমি, পাড়ের ওপর বাগান, আম-কাঁঠালের গাছ পুঁততে হবে। সে গল্প করিত—ক্ষেতের ধান আসিবে, তখন খামারের প্রয়োজন হইবে। বাড়ীর সামনে পাকা শড়কের ওপাশে পতিত ডাঙ্গাটার কতকখানি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে। ওখানে হইবে খামার। আম-কাঁঠালের বাগানে গাছে ফল হইবে। পুকুরটার তলায় ঠিক মাঝখানে খানিকটা জলা রাখিলে ওখানে মাছ পাওয়া যাইবে।

বলিল—পেটের বাছা, বাড়ীর গাছা, পুকুরের মাছা—এই তো ভর্ত্তি সংসার।

পানু মুগ্ধ হইয়া গেল। রাজিয়া তাহাকে প্রায় পাখীর মত পোষ মানাইয়া ফেলিল। রাজিয়া যাহা বলিল—পানু তাই শুনিল। শুধু তো রাজিয়ার বুদ্ধিই ভাল নয়—রাজিয়া যে দেখিতেও ভারী 'খুবসুরত' হইয়া উঠিয়াছে। রুকণীর চেহারায় একটা নেশা ছিল, যশোদার চেহারায় নেশা ছিল না। যশোদা ছিল অদ্ভুত জোয়ানী, কিন্তু রাজিয়ার মধ্যে সে সব আছে। রুকণীর চোখ দুইটা ছিল ছোট—চাহনী ছিল তীরের ফলার মত সরু ধারালো, দেহখানা ছিল ছিপ-ছিপে—সে খিল-খিল করিয়া হাসিত—চলিত যেন নাচিয়া নাচিয়া—দেখিয়া নেশা না ধরিয়া পারিত না। যশোদার দেহখানা ছিল ভরাট দেহ। যশোদা চলিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন দোল খাইত। রাজিয়ার চোখ দুইটা বড়, তাহার চাহনী যেন আয়নার মত; সূর্য্যের ছটা পড়িলে আয়না যেমন ঝকমক করিয়া উঠে, পানুর চোখ রাজিয়ার বড় বড় চোখ দুইটার উপর পড়িলে—সে চোখও তেমনি ঝকমক করিয়া উঠিত। রাজিয়ার দেহ ভরিয়া উঠিয়াছে যশোদার মতই কিন্তু রাজিয়া মাথায় অনেকটা লম্বা। সে যখন চলে

—তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দোলও খায় আবার মনে হয় ধীর চালে নাচিয়াও সে চলিয়াছে। সে খিল-খিল করিয়া হাসে না—মুখ টিপিয়া হাসে—সে হাসিতে সুর না থাক—ইসারার নেশা আছে। রাজিয়ার নেশায় সে প্রায় মশগুল হইয়া গেল। রাজিয়া কিন্তু সয়তানী!

সয়তানী রাজিয়া।

বৎসর খানেক পর রাজিয়া একদিন তাহাকে বলিল—একটা কাজ কর তুমি।

—কি?

—আর একটা বিয়ে কর।

—বিয়ে? পানু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

—হ্যাঁ। একা আমি আর পারছি না।

পানু তাহার মু··র দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজিয়া তাহাকে হিসাব দিল—একা কি আমি অত কাজ পারি? সকাল থেকে ঘরের কাজ, তারপর দুধ জোগান দিতে যেতে হয় শহরে, তারপর রান্নাবান্না—ঘরকন্না—ভিয়েন—দোকান—লছমী-মণ্ডলীর সেবা—তোমার সেবা।

রাজিয়া সে একটা ফিরিস্তি দিয়া গেল। বড় কাজ হইতে একেবারে তুচ্ছ খুটিনাটির কাজ পর্য্যন্ত।

পানু বলিল—ভাগ। একটা ঝি রাখ।

—উঁহু। ঝিয়ে তোমার দুধ দিতে গেলে চুরি করবে।

—হুঁ।

—তারপর ভিয়েন রান্নাবান্না তোমার ঝিয়ে করবে না কি?

পানু তবু বলিল—না—না। দুধ দিতে আমি যাব।

রাজিয়া পরদিনই একটা মেয়েকে আনিয়া দেখাইল। বেশ ডাগর মেয়ে। নষ্ট যুবতী।

পান্নুর এবার নেশা ধরিল।

দিন কয়েকের মধ্যেই রাজিয়া উদ্যোগ আয়োজন করিয়া পান্নুর মালা-
নের ব্যবস্থা করিল। পান্নু রাজিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া
ল। তাহার বারবার মনে পড়িল—সে যেদিন রাজিয়াকে লইয়া আসে
দিন যশোদা পলাইয়া গিয়াছিল। আর রাজিয়া নিজে তাহার আবার
াহ দিল। সে বার বার রাজিয়াকে বলিল—ও তোর সেবা করবে।

রাজিয়া হাসিল। যত্ন করিয়া বিছানা করিয়া দু'জনকে শুইতে দিল।
দিন পান্নু সকালে উঠিয়া দেখিল—রাজিয়া নাই।

সে একেবারে পাগল হইয়া গেল। রাজিয়া পলাইয়াছে ওই নূতন বউটার
ইয়ের সঙ্গে। নূতন বউটার ভাই যাত্রার দলে নাচ-গানের মাষ্টার।
কটা চমৎকার বাঁশী বাজায়। সংসারে আছে অন্ধ বাপ আর এই বোনটি।
্যকালে বোনটার একবার বিবাহ হইয়াছিল—বিধবা হইয়া সে বাপ-
য়ের পোষ্য হইয়াই ছিল। রাজিয়ার সঙ্গে বউটার ভাইয়ের প্রীতি গাঢ়
া উঠিলে সে রাজিয়াকে বিবাহের প্রস্তাব জানায়। রাজিয়া বলিয়াছিল—
একবার বিকেলে আমাদের ওদিকে যেয়ো।

সে তাহাকে ভীষণ-মূর্ত্তি পান্নুকে দেখাইয়াছিল—পরদিন বলিয়াছিল—
খছ তো? তোমাকেও মেরে ফেলবে, আমাকেও মেরে ফেলবে। ফাঁসিকে
য় করে না।

লোকটি তখন দেশত্যাগের প্রস্তাব জানাইয়াছিল।

রাজিয়া দুদিন ভাবিয়া বলিয়াছিল—যেতে পারি; তোমার বুনের সঙ্গে
ওর পত্র (চলিত বৈষ্ণব প্রথায় হয় বিবাহ) করে দাও। ও আমাকে
য়ে খেতে দিয়েছে—বাঁচিয়েছে। আমাকে ভালও বাসে। ওর ঘর
ও দিয়ে আমি যেতে পারব না।

যাত্রার দলের ড্যান্সিং মাষ্টারের কোন আপত্তি হয় নাই। বোনটার
া গতিরও প্রয়োজন ছিল। সে নরুণের বদলে পান্নুর নাক লইয়

ন। রাজিয়া রাত্রে তাহারই সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময়
য়া পানুর একটা সূচ পর্য্যন্ত লইয়া যায় নাই। নিজের চুরি করা সঞ্চয়
লি ছিল সেই গুলি লইয়াই গিয়াছে।

ানু খোঁজ করিয়া সব জানিয়া সমস্ত দিনটা নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত
া নূতন বউটাকে। তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। শেষ শ্বশুরের বাড়ী
অন্ধ বৃদ্ধকেও ঘা কতক দিয়া আসিল। রাত্রে নূতন বউটাকে ঘর হইতে
র করিয়া দিয়া ঘরে খিল দিল।

সকালে উঠিয়া দেখিল বউটা দুয়ারের গোড়ায় পড়িয়া আছে পোষা
ুরের মত।

বউটা আজও আছে। বয়স হইয়াছে প্রায় ত্রিশ। গোটা কয়েক ছেলে-
য়েও হইয়াছে। কাজ-কর্ম্ম করে, মার খায়। পানু আরও একটা বিবাহ
িয়াছিল, সেটা বিবাহের পর বাপের বাড়ী গিয়া আর আসে নাই।
জিয়াই বরং আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

দীর্ঘ দুইবৎসর পর আবার রাজিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে নিজে
গু ফেরে নাই—পানুই তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। পানু গিয়াছিল
রে একটা ডাকাতির মকর্দ্দমায় সাক্ষী দিতে। ডাকাতির চেষ্টা হইয়াছিল
হারই ঘরে। সাক্ষী দিতে গিয়া হঠাৎ শহরের পথে রাজিয়ার সঙ্গে দেখা
িয়া গেল। একটা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাজিয়া পথের উপর ছাই
ফলিতেছিল। পানু থমকিয়া দাঁড়াইল। রাজিয়া ভয়ে বিবর্ণ [illegible]
হূর্ত্তে সে ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। পানু কিন্তু [illegible]
টিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। লাফ দিয়া পিছন হইতে রাজিয়ার চুলের
ঠা ধরিয়া মাটিতে পাড়িয়া ফেলিল। রাজিয়া চীৎকার করিল না—শুধু
ভয়ে তাহার ডব-ডবে চোখের সেই দৃষ্টি মেলিয়া পানুর দিকে চাহিয়া
হিল।

পানু হিংস্র গর্জ্জন করিয়া যে প্রশ্ন রাজিয়াকে করিল তাহাতে রাজিয়া

াক হইয়া গেল। পানু প্রশ্ন করিল—এ কি? সাদা থান-কাপড় কেনে ার? হাত শুধু কেনে? সিঁথেয় সিঁদুর কই?

রাজিয়া চুপ করিয়া রহিল।

—সে হারামজাদ মর গেয়া?

রাজিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হঁ্যা।

—সে মরেছে—মরেছে, সে তোকে বিয়ে করে নাই। বিধবা সেজেছিস্ :ন তুই? আমি বেঁচে রয়েছি—কেনে বিধবা সেজেছিস্ তুই?

বলিয়াই সে তাহাকে দুর্দ্দান্ত প্রহার আরম্ভ করিল। রাজিয়া চীৎকার করে :, কিন্তু পানুর কিল-চড়ের শব্দেই বাড়ীর লোক জমিয়া গেল। সকলে হঁা করিয়া পানুকে ধরিয়া ফেলিল। পানু গর্জ্জন করিতেছিল—আমার রবার। পালিয়ে এসেছে। হারামজাদী আবার বিধবা সেজেছে! খুন :র ফেলব হারামজাদীকে।

রাজিয়া হাঁপাইতেছিল।

বাড়ীর লোকেরা বলিল—পুলিশে দাও হারামজাদাকে।

রাজি বলিল—না।—ও আমার সোয়ামীই বটে। ও যা বলছে—সব ত্য। ছেড়ে দেন আপনারা।

মুক্ত হইয়াও পানু রাজিয়াকে ছাড়িয়া আসিল না। শহরেই বাহারে লাল ড় শাড়ী কিনিয়া চুড়ি কিনিয়া সিন্দুর কিনিয়া—রাজিয়াকে বউ সাজাইয়া টী ফিরাইয়া আনিল। বাড়ী আসিয়া আবার একদফা দিল দুর্দ্দান্ত প্রহার। জি এবারও কাঁদিল না—অত্যন্ত কষ্টের মধ্যেও হাসিয়া বসিল—এইবার ড়। আর মারলে ম'রে যাব।

পানু ছাড়িয়া দিয়াও মধ্যে মধ্যে প্রহারোদ্যত হইতেছিল। রাজিয়া বলিল আবার দু'দিন পরে মেরো, গায়ের বেদনাটা মরুক।

পরদিন সকাল হইতে পানুর ঘরে রাজিয়াই আবার গৃহিণী হইয়া বসিয়াছে। নু কিন্তু তাহাকে রোজ প্রহার দিতে ভুলে না।

পানু জীবনে কাহাকেও আর বিশ্বাস করে না। কাহারও এতটুকু ঔদ্ধত্য করে না। মায়া নাই, দয়া নাই। মানুষ তাহাকে ঠকাইয়াছে—সে যাগ পাইলেই মানুষের উপর অত্যাচার করিয়া শোধ লয়। তাহার বুদ্ধি টা—সে লোককে ঠকাইতে পারে না, সে লোককে গায়ের জোরে কাইয়া রাখে, ঠেঙায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর তাহার প্রচণ্ড রাগ।

তাহার দিদি চারুও কিছুদিন তাহার আশ্রয়ে বাস করিতে আসিয়াছিল। গুর মৃত্যুর পর অনেক সন্ধান করিয়া পানুর কাছে আসিয়া অনেক ভণিতা রিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল—তুই আমার মায়ের পেটের ভাই, তোর কাছেই লাম।

পানু প্রথমেই তাহার গলায় হাত দিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তারপর অনেক কান্নাকাটির পর সে তাহাকে স্থান দিল, কিন্তু প্রতিদিন দুইটি বেলা তাহাকে সে সামান্য অজুহাতে প্রহার দিত। সেই গুরুর কথা তুলিয়া অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করিত। কিছুদিন পর দিদি পলাইয়া গেল। পানু সেদিন খুব হাসিল।

এমনি ভাবে জমাদার-দারোগা কোনদিন আসিয়া যদি তাহার কাছে ভাতের ভিক্ষুক হইয়া দাঁড়ায়—তবে সে বড় সুখী হয়।

ভাতের আজ তাহার অভাব নাই।

রাজিয়া যাহা বলিয়াছে সে সবই তাহার হইয়াছে। রাজিয়ার কল্পনার চেয়ে অনেক বেশী হইয়াছে। পুকুর-বাগান-জমি-দোকান-টাকা তাহার কিছুরই অভাব নাই। মনের আনন্দে সে দিন কাটাইতেছিল। হঠাৎ আজ তাহার এ কি হইল? অনেক জীব সে হত্যা করিয়াছে। হেঁসোর আঘাতে কুকুরের পা কাটিয়া দিয়াছে, গুলতিতে করিয়া কাক মারিয়াছে অসংখ্য। সেবার তাহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল। পানু তাহার লম্বা হেঁসোখানা হাতে করিয়া বাহির হইয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া একটা লোককে ঘায়েল করিয়াছিল। ডাকাতেরা সঙ্গীকে ফেলিয়াই পলাইয়া যাইতে বাধ্য

হইয়াছিল। পানু তখন আহত লোকটার বুকের উপর বসিয়া একটা হাতের আঙুল ওই হেঁসো দিয়া কাটিয়াছিল। কাটিয়াছিল আর হাসিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার এ কি হইল? একটা অস্থি-চর্ম্মসার রোঁয়া-ওঠা কদর্য্য চেহারার বাছুরকে লাঠি মারিয়া তাহার কি হইল?

অস্থি-চর্ম্মসার গো-শাবক। বড় লালসাতেই সে পানুর গাছটির দিকে মুখ বাড়াইয়াছিল। আঃ—মায়ের দুধ পেট পুরিয়া খাইতে পায় না, হত-ভাগ্যের হাড়-পাঁজরাগুলি সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে! গায়ের রোঁয়াগুলি পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে! ওই বিরল রোমগুলির উপরেই অসহায় মায়ের সস্নেহ লেহন-চিহ্ন চিকন হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। বেচারার মায়ের দুধের শেষ ফোঁটাটি পর্য্যন্ত গৃহস্থে টানিয়া বাহির করিয়া লয়। ক্ষুধার জ্বালায় বড় লালসায় সে গাছটায় মুখ দিয়াছিল। মুখের পাশ বাহিয়া সবুজ রস-মিশ্রিত লালা গড়াইয়া পড়িতেছে।

সামান্ত স্নেহে পানু তাহার গায়ে হাত বুলাইয়াছিল। তাহাতেই সে কৃতজ্ঞতা ভরে পানুর হাত চাটিতেছে।

পানুর চোখে বারবার জল আসিতেছে।

বাছুরটাকে যে বঞ্চনা মানুষ করিতেছে—তাহাতে সে হয়তো বাঁচিবেই না। সেই হয়তো শেষ আঘাত দিল। পানু এতকাল ধরিয়া যে বঞ্চনা পাইয়াছে—ওই বাছুরটার বঞ্চনার তুলনায় সব যেন তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে।

উনিশ

বেলা গড়াইয়া অপরাহ্ণেরও শেষভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। পানু এখনও সেই আহত বাছুরটার পাশে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। মনের মধ্যে তাহার সমস্ত জীবনের স্মৃতির ছবিই অত্যন্ত দ্রুতবেগে ভাসিয়া গেল। সে-সবের সঙ্গে এই বাছুরটাকে মারার সঙ্গে সম্বন্ধ বিশেষ নাই। তাহারই হাতে

লাঠির ঘা খাইয়াও বাছুরটা যখন তাহারই সামান্য আদরে ঈষৎ স্নেহের স্পর্শে পরম আনুগত্য প্রকাশ করিয়া পানু যে হাতে মারিয়াছিল, সেই হাতই চাটিয়াছিল—তখনই মনে পড়িয়াছিল তাহার বাপের কথা। নিষ্ঠুর প্রহার করিয়া জমাদার যখন দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়াছিল তখন তাহার বাপ জমাদারের পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়াছিল। রসিকতায় হাসিয়াছিল। জমাদারের এবং বাপের কথা হইতে মনে পড়িয়া গিয়াছিল তাহার নিজের পিঠের দাগের কথা। পিঠে হাত দিয়াই নিজের জীবনের কথা মনে পড়িয়াছিল। হয়তো আগাগোড়া স্মরণ করিয়া দুনিয়ার 'ভেল্কীর কথা' সম্বন্ধে তাহার ধারণাটাকেই শক্ত এবং বড় করিয়া দেখিতে চাহিতেছিল। স্বার্থপর দুনিয়ায় সকলেই ব্যস্ত আপন স্বার্থ লইয়া। জোর-জবরদস্তি—চোখের জল—মিষ্ট কথা—হাসি—সেবা—যত্ন—সব ভেল্কী, সব ভেল্কী। জমাদার, দারোগা, রুক্মিণী, চারু দিদি, গুরুঠাকুর, জমিদারের গমস্তা, চাপরাশী, ঘোষবাবা, জমি বিক্রেতা চাষী, মহাজন, যশোদিয়া, রাজিয়া, নতুন বউটা সব ভেল্কীদার ভেল্কীদারনীর দল। সে নিজেও ভেল্কীদার। তাহার ভেল্কী, গায়ের জোর—লাঠি। ওই ভেল্কীর জোরে সে দুনিয়ার ভেল্কী ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। বাছুরটাও আসিয়াছিল আপনার পেট ভরাইতে—চুপি-চুপি। সে তাহাকে ঠ্যাঙাইয়াছে—একখানা পা ভাঙিয়া দিয়াছে। বেশ করিয়াছে। এখন বাছুরটার ড্যাবা-ড্যাবা চোখে জল টল-মল করিতেছে—এও ভেল্কী। হাত চাটিতেছে—এও ভেল্কী। হয়তো তার মনের মধ্যে আপন হইতে সমস্ত স্মৃতিটা ভাসিয়া উঠার মূল কারণ তাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—তবুও সে সান্ত্বনা পাইতেছে না। চোখের ভিতর জ্বালা করিতেছে—একটা উত্তপ্ত দাহে যেন ভরিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল—চোখের কোণ দুইটা হইতে দুইটা পোকা নামিয়া আসিতেছে এবং পোকা দুইটার সর্ব্বাঙ্গে চোখের উত্তপ্ত দাহ। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছে। পানু চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু আবার জল আসিতেছে।

মনে হইল—এই বাছুরটার জীবনের সঙ্গে তাহার জীবনের মিল আছে। না—বাছুরটা তার চেয়েও হতভাগা। সে তো তাহার গায়ের জোরে অনেক বঞ্চনা ঠেকাইয়াছে। বাছুরটার গায়ের জোরও নাই। প্রথম যখন সে পলাইয়া গিয়াছিল—তখন তাহার ভাগ্যগুণে বুধন এবং বুধনের স্ত্রীকে সে পাইয়াছিল। বাছুরটা তাও পায় নাই। সে তো জানে! তাহার নিজের ঘরেই গরু-মহিষ আছে। লছমী-মঙলী—তাহাদের সন্তান-সন্ততি আছে; কেমন করিয়া জবরদস্তির ভেল্কীতে মানুষে গরু-মহিষ দোহন করিয়া লয়—সে তো পানু জানে।

সন্ধ্যা হইতে বাছুরটাকে বাঁধিয়া রাখে, দূরে বাঁধা থাকে তাহার মা। সমস্ত রাত্রি চলিয়া যায়—তৃষ্ণায় বাছুরটার বুক শুকাইয়া যায়, ক্ষুধায় পাকস্থলী মোচড়াইয়া উঠে, সে চীৎকার করে—হাম্বা-হাম্বা! মা—মা বলিয়া ডাকে। দূরে আবদ্ধ মা প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া ছিঁড়িতে চায় গলার দড়ি; কিন্তু মানুষের ভেল্কীর পাক লাগানো দড়ি ছেঁড়ে না—নিরুপায় হতাশায় মাও চীৎকার করে। আশ্চর্য্যের কথা, পানু পূর্ব্ব হইতেই জানে যে, যে-বাছুরটা ডাকে ঠিক তাহারই মা উত্তরে সাড়া দেয়। যে মা ডাকে ঠিক তাহারই বাচ্চাটা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিষ্ঠুর ক্লান্তির মধ্যেও ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া জানায়। মায়ের স্তন-ক্ষীরভার, স্তন-ভাণ্ডের কানায় কানায় ভরিয়া উঠে, স্নায়ু—শিরা—পেশী এমন কি কোমল ত্বক পর্য্যন্ত অসহ্য বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠে; প্রাণের ব্যাকুল অধীরতার সঙ্গে দৈহিক যন্ত্রণাও সমানে বাড়িয়া চলে—সে চীৎকার করে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া—চীৎকারও পানুর মনে পড়িল। সকালে পাত্র হাতে গৃহস্থ আসিয়া বাছুরটাকে ছাড়িয়া দেয়—বাছুরটা আকুল আগ্রহে ছুটিয়া যায়,—অধীর আনন্দে তাহার ছোট্ট লেজখানি দোলায় সে, তাহার মা ফোঁস ফোঁস শব্দ করিয়া তাহার দেহের আঘ্রাণ লয়—জিভ দিয়া সন্তানের অঙ্গ লেহন করে, ঈষৎ কুঁজা হইয়া সন্তানের মুখে তুলিয়া দেয় তাহার স্তনভাণ্ডের বৃন্তদেশ। পানু শুনিয়াছে, তখন মায়ের পাকস্থলীর মধ্যে একটা

আলোড়নের শব্দ উঠিতে থাকে—মনে হয় তাহার দেহের অভ্যন্তরে সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ হইয়াছে; দেহের রোমকূপে-কূপে শিহরণ জাগে—রোমগুলি খাড়া হইয়া উঠে—ত্বকখানি মাঝে মাঝে কাঁপে। ওদিকে বাছুরটার জিহ্বার স্পর্শে, আকর্ষণে ধারায় ধারায় নামিয়া আসে দুধের উচ্ছসিত ফেনায়িত ধারা। বাছুরটার মুখের চারিপাশে সমুদ্রের ফেনার মত ফেনা জমিয়া উঠে, বক্ষ ব্যহিয়া গড়াইয়া পড়ে দুধ। অমনি গৃহস্থ টানিয়া লয় বাছুরটাকে। তারপর মায়ের স্নেহোচ্ছ্বসিত অবসন্ন মন এবং দেহের এই অবস্থার সুযোগ লইয়া নিঃশেষে দোহন করিয়া লয় হতভাগ্যের জীবনীসুধা।

ওই মায়ের স্তনবৃন্ত টানিলে যেমন ধারায় দুধ গড়াইয়া পড়ে—তেমনি ভাবেই পানুর চোখের জলের ধারাও অকস্মাৎ প্রবল হইয়া উঠিল।

রাজুবালার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে দুধ বিক্রী করিয়া আসা অন্যতম কর্ম্ম। যায় খাওয়া-দাওয়ার পর সাড়ে বারোটা একটার সময়; ফেরে আড়াইটা তিনটার মধ্যে। সন্তানহীনা রাজুর বয়স প্রায় পানুর সমান, কিন্তু দেহে এখনও তাহার সামর্থ্য আছে। দেখিয়া মনে হয়, বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হইবে না। দেহের গঠনখানিই তাহার ভাল। পানুর ঘরে পর্য্যাপ্ত দুধ হয়—রাজু চুরি করিয়া দুধও খায়, তবু তাহার দেহে মেদ-বাহুল্য ঘটিয়া তাহার দেহে প্রবীণার ছাপ মারিয়া দেয় নাই। রাজু কাপড়-চোপড়ও ভাল পরে। মূল্যবান না হউক—ক্ষারে সোডায় কাচিয়া কাপড়-চোপড় সে পরিষ্কার রাখে। তাহার সে স্বভাব এখনও যায় নাই, দুধ বিক্রী করিতে গিয়া শহরতুল্য গ্রাম-থানার এখানে ওখানে রসিকজনের মজলিস দেখিলেই দু'দণ্ড দাঁড়ায়—হাস্য-পরিহাস করে। কখনও কখনও এমন জমিয়া যায় যে, ফিরিবার সময় পর্য্যন্ত তাহার ভুল হইয়া যায়। সেদিন বাড়ীতে ফিরিলেই পানু তাহাকে প্রহার করে। রাজু সে প্রহারকে তাহার জীবনের খাওয়া-পরার খাত পাওনা-গণ্ডার সামিল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সে মার খায়—

চীৎকার করে না। পানুই চীৎকার করে, পানুর চীৎকার ক্লান্ত হইয়া আসিলে বলে—নাও, এইবার ছাড়। রাজুর আজও অনেকটা দেরী হইয়া গিয়াছিল সে আজ প্রহারের মাত্রা কল্পনা করিয়া নিজের মনকে বেশ শক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বাড়ীর দাওয়ার উপর উঠিয়াই সে কিন্তু অবাক হইয়া গেল। পানু কাঁদিতেছে! সামনে একটা কঙ্কালসার বাছুর পড়িয়া আছে।

রাজু বিস্ময়ে হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। পানু একবার মুখ ফিরাইয়া রাজুকে দেখিল—তারপর আবার বাছুরটার দিকে মুখ ফিরাইয়া তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল, চোখের জল মুছিবার চেষ্টা করিল না, কান্নার জন্য কোন লজ্জাও বোধ করিল না।

রাজুর আজ পানুকে দেখিয়া অত্যন্ত ভয় লাগিল। পানুর এমন রূপ সে কখনও দেখে নাই। সভয়ে সসঙ্কোচে পানুর পাশে বসিয়া সে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—কি হ'ল?

পানু কোন কথা বলিল না।

রাজু আবার বলিল—হ্যাঁ গো?

পানু এবার রুদ্ধশ্বাস ব্যক্তির মত সমস্ত মুখটা মেলিয়া একটা নিশ্বাস লইল। কিছু একটা বলিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু কোন কথা বাহির হইল না, বাহির হইল—উচ্ছ্বাস-জড়িত একটুকরা শব্দ।

রাজু সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে পানুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তবুও পানু কিছু বলিতে পারিল না—শুধু বারবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না—না—না।

হয়তো এ 'না'-এর অর্থ, আমি বলিতে পারিতেছি না। অথবা জিজ্ঞাসা করিও না রাজু। অথবা—'আমার আর কিছু বলিবার নাই; দুনিয়ায় আমার কথা ফুরাইয়া গিয়াছে।' হয়তো বা, 'গোটা দুনিয়াটাই আমার কাছে 'না' হইয়া গিয়াছে। তাহার ভীষণ কঠিন মুখখানার পেশীগুলি আবেগের আক্ষেপে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে।

রাজু এবার বাছুরটার দিকে চাহিয়া দেখিল। বাছুরটা পড়িয়া আছে—পান্নুর হাত চাটিতেছে। মধ্যে মধ্যে ঘাড় তুলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। একটা ফোঁস করিয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া আবার শুইয়া পড়িতেছে। রাজু বাছুরটাকে নাড়িয়া দেখিয়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—এঃ—পাখানা একেবারে ভেঙে গিয়েছে!

পান্নু এবার বলিয়া উঠিল—আমি ওকে মেরে ফেললাম রে রাজি, আমি বাছুরটাকে মেরে ফেললাম।

পান্নুর নতুন বউটা ব্যাপারটা জানিত। সে কয়েকবারই ইহার মধ্যে উঁকি মারিয়া ব্যাপারটা দেখিয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছু বলিতে ভরসা পায় নাই। সে রাজুবালার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। রাজুকে পান্নু কিছু বলিল না দেখিয়া সাহস পাইয়া সে এবার বাহির হইয়া আসিল—বলিল—মা-গো! গো-হত্যে করলে তুমি!

রাজু আবার বারবার ঘাড় নাড়িল—যাহার অর্থ, না—না—না।

মেয়েটা বলিল—নাও, এখন গরুর দড়ি হাতে ক'রে ব্যা—ব্যা ক'রে দেশে দেশে ভিখ্ ক'রে বেড়াও!

গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত তাই-ই বটে। একটা নির্দিষ্টকাল গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়—মৌনী থাকিতে হয়, একমাত্র শব্দ—গরুর শব্দানুকরণ করিয়া 'ব্যা-ব্যা' বা 'হাম্বা' শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে পায় না। হাতে থাকে একগাছি গরুর দড়ি—সেই দড়ি দেখাইয়া এবং গরুর শব্দ করিয়া দেশে দেশে স্বীকার করিয়া ফিরিতে হয়—আমি মহাপাপ করিয়াছি—আমি গো-বধ করিয়াছি।

পান্নু তাহার কথা শুনিয়া ঘৃণায় ক্রোধে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল—কিন্তু কিছু বলিল না।

রাজু বলিল—তুই থাম বাপু! মরবে কেন? এক-কড়া আগুন কর।

সেঁক দিতে হবে। 'হাড়-জোড়া'র পাতা নিয়ে আসছি আমি, বেটে গরম ক'রে লাগিয়ে দি'। মরবে কেনে?

পানু রাজুর হাত ধরিয়া ব্যগ্রতাভরে বলিল—বাঁচবে? রাজু—বাঁচবে?

কুড়ি

রাজিয়া সয়তানী, সে পানুকে ছাড়িয়া একবার পলাইয়া গিয়াছিল, এখনও এই পরিণত বয়সে সে সাজিয়া দুধ বেচিতে যায়, দেরী করিয়া ফেরে, পানু সব বুঝিতে পারে কিন্তু রাজিয়া তবু অদ্ভুত। বড় ভাল। অনেক গুণ তাহার। বাহবা রাজি—বাহবা! পানুর মুখে এতক্ষণে অল্প হাসি দেখা দিল।

'হাড় জোড়া' গাছের পাতা আনিয়া মোলায়েম করিয়া রাজু পিশিয়া ফেলিল। তারপর গরম করিয়া ভাঙা জায়গাটায় প্রলেপ দিয়া কাপড়ের ফালি দিয়া বাঁধিয়া দিল। তাহার উপর দুইটা শক্ত বাখারী পায়ের মাপে করিয়া কাটিয়া দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া পায়ের সঙ্গে বাঁধিল।

পানু প্রশ্ন করিল—ও কি হবে?

রাজু হাসিয়া বলিল—দেখনা।

পানু চটিয়া উঠিল—রাজুর চুলের মুঠা ধরিয়া টান দিয়া বলিল—না। লাগবে ওর।

পানু চুলের মুঠি ধরিয়া আছে, তবু রাজুর মুখে হাসি, বলিল—ছাড় ছাড়। বলছি।

—কি?

—হাত ভেঙে গেলে ডাক্তারখানায় ভাঙা হাতে কাঠের ফালি বেঁধে দেয় না? দেখ নি?

পানু এবার রাজুর চুলের মুঠা ছাড়িয়া দিল।

রাজু বলিল—কাঠ বেঁধে না দিলে ভাঙা হাড় কেবলই নড়বে যে, জোড়া লাগবে কেন?

ঠিক! পানু এবার স্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িল—ঠিক!

রাজু বলিল—আমি ঠিক শক্ত ক'রে বাঁধতে পারছি না, তুমি বাঁধ দেখি!

পানু দড়ি হাতে লইয়া টান দিল—বাছুরটা সঙ্গে সঙ্গে কাতরাইয়া অন্য পা তিনখানা ছুড়িতে আরম্ভ করিল। রাজু বলিল—হাঁ-হাঁ এত জোরে নয়। করলে কি?

পানুর হাতের টানে ব্যাণ্ডেজের কাপড় কাটিয়া হাড়-জোড়ার রস বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পানু বোকার মতই রাজুর দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজু বলিল—আর একটু আস্তে।

পানু আবার দড়ি ধরিয়া টানিল—কিন্তু এবার দড়িতে আদৌ টান পড়িল না, দড়ির সঙ্গে পানুর হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে।

রাজু তাহার হাত হইতে দড়ি টানিয়া লইল—কিন্তু হাসিল না।

হাসিল অপর বউটা, বলিল—বুড়ো মিন্সে!

রাজু তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—যা ফ্যাক-ফ্যাক ক'রে হাসতে হবে না। আগুনে কাঠ দিয়ে এসেছিস্—আগুন হ'ল কিনা দেখ।

—আনছি! আনছি! তোমার ডাক্তারী বিদ্যেটা দেখি।

পানু উঠিয়া দাঁড়াইল। বউটা ভয়ে এবার বিবর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণ ধরিয়া পানুর এই বিহ্বল ভাবটা দেখিয়া তাহার সাহস হইয়াছিল—তাই সে এমন ভাবে রসিকতা করিয়া কথা বলিতে সাহস করিয়াছিল। পানু যে এমন অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইবে, সে কল্পনা করিতে পারে নাই। সরিয়া যাইবারও পথ নাই—সামনে পানু, পিছনে দেওয়াল, পাশে বাছুরটা—অন্যপাশে একখানা তক্তাপোষ। সে আতঙ্কে দেওয়ালে লাগিয়া গিয়া সভয়ে দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পানু কিন্তু তাহাকে কিছু বলিল না, সে তক্তাপোষটার উপরে উঠিয়া সেটার উপর দিয়াই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

নূতন বউটা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ পান্নুর গমনপথের দিকে চাহিয় থাকিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—দিদি, মিনসে এইবার মরবে।

রাজু চোখ তুলিয়া একবার তাহার দিকে চাহিল—তারপর বলিল—চু' কর। শুনতে পাবে এখুনি।

বউটা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—কি হ'ল বল দেখি?

—মানুষটার মনে বড় লেগেছে রে!

—মনে লেগেছে! মন!

সে আরও কিছু বলিত কিন্তু ওদিকে সবল পদবিক্ষেপ-ধ্বনি ধ্বনিত হইয় উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বউটা চুপ করিয়া রাজুর পাশে বসিয়া বাছুরের গায়ে হা' বুলাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। একটা প্রকাণ্ড কড়াই পরিপূর্ণ করিয়া আগু আনিয়া পান্নু নামাইয়া দিল।

নূতন বউটা এবারও আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল—ও মা গো! এ যে ভিয়েনের কড়াই! ভিয়েনের কড়াই সত্যই বড় যত্নের জিনিষ।

আগুনের আঁচে থাকিয়া পান্নু উত্তপ্ত হইয়াছিল—সে এবার বউটার ঘাড়ে ধরিয়া টানিয়া বলিল—আরে হারামজাদী! তোর হাড় ভেঙে দোব আজ।

বাধা দিল রাজু।—ছাড়—ছাড়। একটার হাড় ভেঙেছ, সেইটার ব্যবস্থা আগে হোক। তারপর ওটার হবে। ও তো পালাচ্ছে না।

পান্নু বউটাকে ছাড়িয়া দিল, বলিল—নেড়ী কুত্তি কাঁহাকা। এ'টা পাতের জন্যে পড়ে থাকে, তাড়ালে যাবে না—বাত দেখ না।

রাজু বলিল—যা লো সেজ, ন্যাকড়া নিয়ে আয় দেখি। ছেঁড়া চট আছে ভিয়েনের তাই নিয়ে আয় বরং।

পান্নু হাঁউ-মাউ করিয়া বলিল—তামাসা! তামাসা! সব তাতেই তামাসা!

রাজু কিছু বলিতে গেল—কিন্তু পান্নুর মুখের দিকে চাহিয়া পারিল না। সে অবাক হইয়া গেল। পান্নুর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। হাঁউ-মাউ

করিয়া বলা নয়—কান্নার আবেগে কথাগুলি এমন শুনাইতেছে। সে আর কিছু বলিল না, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিরাম সেঁক দিয়া বাছুরটাকে বেশ খানিকটা তাজা করিয়া তুলিল। তখন জানোয়ারটা বারবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাজু বলিল—বাঁধা পা-খানা এইভাবে আগে রেখে বসিয়ে দাও দেখি!

রাজিয়ার নির্দ্দেশ মত পানু বাছুরটাকে বসাইয়া দিল। বাছুরটা বেশ বসিল। পানু খুসী হইয়া বলিল—বাহবা রাজিয়া! বলিয়া সে সস্নেহে বাছুরটার মুখে হাত বুলাইয়া দিল—বাছুরটা এবার ফোঁস করিয়া মাথা নাড়িয়া পানুর হাতে একটা ঢুঁ মারিল। পানু এবার হা-হা শব্দে হাসিয়া উঠিল। বাহবা রাজিয়া! বাহবা রে!

* * * * *

এদিকে পানু কিন্তু বাছুরটার পায়ে লাঠি মারিয়া বাঘকে খোচা মারিয়া বসিয়াছে, কারণ বাছুরটা বাঘের পোষা বাছুর। এ অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী জমিদারের সুরভিনন্দিনী। প্রথম দুইদিন বাছুরটার কোন খোঁজই হয় নাই। পাল হইতে ছটকাইয়া বাছুরটা অন্য একটা পালের সঙ্গে এদিকে আসিয়া পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পানুর লাঠির সীমানায় হাজির হইয়াছিল। সেদিন রাখালটা কোন কথা কাহাকেও বলে নাই। পরের দিন সকালে দুধ দুহিবার সময় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হাজির হইয়া দেখিল একটা গাই কম দোহন করা হইতেছে। একেই দুগ্ধবতী গাভী এ বাড়িতে আসিলেই দুধ ক্রমশঃ কমাইতে সুরু করে; তাহার উপর, নিজেকে কিছু লইতে হয়, সেটা জল মিশাইয়া পূরণ করিয়া দেওয়া হয়। গাইগুলির দুধ কমিয়া যায় এবং দুধ জলো হয়—এ জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে প্রভু সকাশে তিরস্কৃত হইতে হয়। তাই একটা গাই কম দোহনের কারণ জানিয়া সে মূর্ত্তিমান কর্ত্তব্যপরায়ণতার মত প্রভুর সকাশে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে সমস্ত নিবেদন করিল। প্রভু রাখালের জরিমানা করিলেন। এবং কয়েকজন

লোক সন্ধানে পাঠাইতে আদেশ দিলেন। পাগড়ী বাঁধিয়া লোক বাহির হইয়া গেল, সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহাদের তিনজনই অবশ্য গ্রামান্তরে গিয়াছিল। একজন গিয়াছিল দুইক্রোশ দূরবর্ত্তী একগ্রামে প্রণয়িনীর বাড়ী। একজন গিয়াছিল বেহাই বাড়ী, অপরজন গিয়াছিল—শ্যালিকালয়। সংবাদ শুনিয়া জমিদার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন—বাছুরটা মরিয়াছে। গরুর জমা-খরচেরও খাতা আছে সেরেস্তায়, সেখানে খরচও লেখা হইল—"লোকসান খাতে খরচ—হারাইয়া মরিয়া যায় বাছুর একটি"। পুরোহিত বিধান দিলেন অপঘাতে গোহত্যা হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। খরচ লাগিবে। অর্দ্ধেক কাটিয়া তা'ও মঞ্জুর হইল। পুরোহিত বলিলেন—কেশ মুণ্ডন করিতে হইবে। প্রভু একটু ভাবিয়া বলিলেন—অনন্ত ঠাকুরকে ডাক।

অনন্ত ঠাকুর প্রভুর গৃহ-বিগ্রহের পূজক এবং পাচক—যুগ্মহস্ত।

সে আসিতেই প্রভু বলিলেন—একটা বাছুর মরেছে। প্রাশ্চিত্তির করতে হবে। তুমিই করবে।

—যে আজ্ঞে।

—পুরুত মশায় বলছেন—মাথা কামাতে হবে।

অনন্তের মাথায় খাসা টেরী, টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না। সে মাথা চুলকাইয়া বলিল—আজ্ঞে, চুলের মূল্য ধ'রে দিলেই—

পুরোহিত বলিলেন—পাঁচসিকে।

প্রভু বলিলেন—মাথা কামিয়ে ফেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি চকিত বিচিত্র দৃষ্টি হানিয়া আপন কাজে মন দিলেন।

আর কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। অনন্ত, পুরোহিত দু'জনেই চলিয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া অনন্ত পুরোহিতের দিকে একটা তীর্য্যক দৃষ্টি হানিয়া বলিল—পাঁচসিকে? নয়? পাঁচ পয়সায় হ'ত না? পাঁচটা পয়সাও তো পেতে!

পুরোহিত বলিলেন—বাঁদরামী করিস নে—থাম।

—থামব? আর এটা বুঝি বাঁদরামী হ'ল? তুমিও কিছু পাবে না, আমিও না, বেজা নাপিতও না। মাঝখান থেকে—। সে সস্নেহে আপনার চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া আক্ষেপভরেই বলিল—বাবুর তো টাক, কামাতেও হ'ত না। বললেই তো পারতে—মাথা তো আপনার মুড়ানো হয়েই আছে।

তৃতীয় দিনের দিন।

পাম্নু দোকান খুলিয়া বসিয়া ছিল। বেলা অপরাহ্ণের দিকে গড়াইয়া আসিতেছে। দাওয়ার উপর বাছুরটা তেমনিভাবে বসিয়া আছে। মুখের কাছে একটা মাটির পাত্রে দুধ, একটা পাত্রে মাড়, সামনে কতকগুলি কচি ঘাস। সেইদিন হইতে পাম্নু দিনে ঘুম ছাড়িয়াছে। সে বসিয়া ভাবে। ভাবনার কথা অন্য কিছু নয়, ভাবে আপনার বিগত কাহিনী—আর ভাবে বাছুরটার কথা। বাছুরটার দিকে চাহিয়া দেখে, মধ্যে মধ্যে প্রকট পঞ্জরাস্থি গুলির উপর হাত বুলায়—আঘাত পাওয়া স্থানটির উপর হাত বুলায়—সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে চোখে জল আসে। মনে হয় কেমন করিয়া মানুষে তাহার মায়ের দুধ নিঃশেষে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া তাহার এই দশা করিয়াছে। অন্য সময়ে সে কাজ-কর্ম্ম করে, সে সময় আশে-পাশে থাকে রাজিয়া আর সেজ বউটা। তাহাদের সামনে সে এমনভাবে ভাবিতে যেন কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তবুও তাহাদের কাছে পাম্নুর এই ভাবটা গোপন নাই।

পরের দিন হইতেই পাম্নু দুধ খাওয়া ছাড়িয়াছে।

নতুন বউটাই দুধ দিতে আসিয়াছিল।

পাম্নু বলিয়াছিল—উঁহু! নিয়ে যা।

—এ্যাঁ? বউটি কথা বুঝিতে পারে নাই।

—নিয়ে যা।

—নিয়ে যাব ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। কতবার বলব ?

—কেন ? দুধ তো বেশ ঘন ক'রে জ্বাল দিয়েছি !

পানু হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিয়াছিল—দুধের বাটিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে গিয়া—কি ভাবিয়া ফেলে নাই, বাটিটা হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া ওই বাছুরটার মুখের কাছেই ধরিয়া দিয়াছিল।

রাজু পিছনে পিছনে আসিয়া বাটিটা উঠাইয়া লইয়া বলিয়াছিল—জ্বাল দেওয়া দুধ ওকে দিতে হবে না, ও খাবেও না। ওকে কাঁচা দুধ দোব। এটা তুমি—

—না—না। রাজু! না! আমি আর দুধ খাব না। কখনও না। কখনও না।

তাহার সে দৃঢ়ভঙ্গিতে ঘাড়নাড়া দেখিয়া রাজু আর কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া আসিতেছিল।

পানু আবার ডাকিয়া বলিয়াছিল—রাজিয়া।

রাজু দাঁড়াইতেই বলিয়াছিল—মরবার সময়ও আমার মুখে যেন দুধ দিবি না।

রাজু হাসিয়াছিল।

—হাসিস না রাজিয়া। আর শোন! কাল থেকে মুংলী ধুলীকে আধা ক'রে দুইবি। খবরদার! পুরা দুইবি না।

রাজু কোন কথা না বলিয়াই চলিয়া আসিয়াছিল। পরের দিন পানু ঠিক আসিয়া দুধ দুহিবার সময় হাজির হইয়াছিল। অর্দ্ধেকের বেশী দুহিতে দেয় নাই। বলিয়া দিয়াছে—দুধের রোজ যাহারা লয় তাহাদের কয়েক-জনকে যেন জবাব দেওয়া হয়।

রাজু চুরি করিয়া দুধ খায়। দুধে জল মিশাইয়া দুধ বাড়াইয়া বিক্রয় করিয়া পয়সা করে। কিন্তু পানুর এ আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করে নাই।

পান্নুর মনের অবস্থার কথা তাহাদের কাছে গোপন নাই। কিন্তু তাহারাও মুখে কিছু বলিতে সাহস করিতেছে না। প্রথম প্রথম রাজিয়া সাহস করিয়াছিল—কিন্তু তাহারও সাহস ক্রমশঃ ফুরাইয়া যাইতেছে। পান্নুর ভিতর আর একজন নূতন কেহ উঁকি মারিতেছে। তাহার চেহারা কেমন এখনও তাহারা দেখিতে পায় নাই। তাই তাহাদের সাহসে কুলাইতেছে না।

পান্নু উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। তাহার ভিতরের নূতন জন অকপটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিয়াছিল।

ঠিক এমনি সময়ে একটি অভিযানকারী দল—জমিদারের চার-পাঁচজন চাপরাশী সদর্পে আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের পুরোভাগে মুণ্ডিতমস্তক অনন্ত পূজক! তাহার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই—হারামজাদা—শূয়ার কি বাচ্চা! আর তাহার হিন্দীতে কুলাইল না—মুণ্ডিত মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিল—পাষণ্ড—গো-হত্যাকারী!

একুশ

অনন্তের আস্ফালনটা মর্ম্মান্তিক দুঃখ-সঞ্জাত। বেচারার মাথায় একগুচ্ছ টিকি ব্যতীত অতিযত্নের কেশকলাপের সর্ব্বচিহ্ন বিলুপ্তপ্রায়। আয়নায় মুখ দেখিয়া অনন্তের নিজেরই চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল। ঠাকুর বাড়ীর 'দুকড়ি' নাম্নী যুবতী ঝি-টি যত রসিকা তত মুখরা,—ওস্তাদ কামারের হাতের পান দেওয়া ইস্পাতের অস্ত্রে গাছের কাণ্ড কাটিয়া যায় অথচ গাছ যেমন দাঁড়াইয়া থাকে—তেমনিভাবে সে মানুষের মর্ম্মচ্ছেদ করে অথচ মানুষের বলিবার কথা থাকে না। 'দুকড়ি' ঝি তাহাকে দশজনের সামনে যে অপ্রস্তুত করিয়াছে সে কথা তাহার মনের মধ্যে অপারেশনের ক্ষতে টিঞ্চার আয়োডিন-

প্রযুক্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইয়া কোন রকমে চাপা আছে। সে পানুকে পাইয়া দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যের মত গালিগালাজ আরম্ভ করিল।

সঙ্গের চাপরাশীরা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহারা পানুকে জানে। তাহার দৈহিক শক্তি, চরিত্রের প্রচণ্ড রূঢ়তা—এখানে কাহারও অজানা নয়। সে যদি হুঙ্কার ছাড়িয়া একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়ায় তবে ভীষণ কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইবে। তাহারা অবশ্য সংখ্যায় অধিক—এক্ষেত্রে পানুর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু পানু মরিলেও ঘটোৎকচের মত মরিবে। একা মরিতে মরিতেও অন্ততঃ দুইজনকে মারিয়া তবে সে মরিবে। সে-দুইজন হইবার আশঙ্কা প্রত্যেকেরই আছে। তাহারা অনন্তকে ধমক দিয়া বলিল—এই ঠাকুর! এই!

অনন্ত বলিল—আমি মরব। ওরে বেটারা আমি মরব। বেটা গো-হত্যে করেছে, ব্রহ্মহত্যেও করুক। নে—বেটা আমাকেও খুন কর।

পানু কিন্তু অনন্তকে কিছুই বলিল না। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল—পানু উঠিয়া ভাঙ্গাগলায় সবিনয়ে বলিল—বাছুরটি তোমার ঠাকুর?

রন্ধনকার্য্যে পারদর্শীরা রসায়ন-শাস্ত্র জানে না—কিন্তু একটা ভাত টিপিলেই হাঁড়ির খবরটা বুঝিতে পারে; চাপরাশীরা পানুর বিনয় দেখিয়া ঝট করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—চল্‌।

পানুর হাতখানা শক্ত হইয়া উঠিল—কিন্তু শক্তিপ্রয়োগ সে করিল না। বলিল—কোথা?

—কাছারী। বাবুর তলব আছে।

—বাবুর তলব? কাহে? বাবুর কি ধার ধারি আমি? বাবুর নামে পানু জ্বলিয়া উঠিল। সবাই সংসারে ভেল্কীদার, কিন্তু জমিদার বড় ভারী ভেল্কীদার। উহারা সব মাছকেই মাগুর মাছ কোটার পদ্ধতিতে কাটে। উহারা ফলের শাঁস খায় না—নিঙড়াইয়া রস বাহির করিয়া খায়। পায়ে হাঁটে না—লোকের ঘাড়ে চাপিয়া পাল্কী করিয়া যায়। হাতে মারে না—

ভাতে মারে; হাতে মারিলে নিজে মারে না—অপরকে দিয়া মারায়; মারিবার আগে বাঁধে। সে টানিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইল।

চাপরাশীটা বলিল—জবরদস্তি করলে ভাল হবে না।

পানু হুঙ্কার দিয়া উঠিল—তুমলোক জবরদস্তি করতা হায়। হাম নেহি।

—তুমি বাবুর বাছুর মেরেছ কেন?

পানু মুহূর্ত্তে যেন নিভিয়া গেল। বলিল—বাবুর বাছুর?

—হাঁ—হাঁ। চলো চলো! পানুর নিভিয়া যাওয়াটা আলো নিভিলে অন্ধকার হইয়া যাওয়ার মতই পরিস্ফুট; সে অন্ধকারের মধ্যে কোন আশ্রয়ী ভূতের মতই চাপরাশীর দল অন্ধকারের সুযোগে নাচিয়া উঠিল।—চলো—চলো।

পানু আর দ্বিরুক্তি করিল না। বলিল—চলো।

অপরাধীর মতই সে চাপরাশীদের সঙ্গে কাছারীর দিকে অগ্রসর হইল। মাথা নীচু করিয়া চলিল, মুখে কোন কথা বলিল না। তাহার পাশে পাশেই অনন্ত চলিয়াছিল, সমানেই সে গালিগালাজ করিতেছিল; পানু একবার তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তাহার মনের অপরাধ-বোধের কাছে এ সব অপমান এত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে যে তাহাতে তাহার কোন ক্ষোভ জাগিতেছে না।

বাবু বসিয়াছিল হাটু ভাঙ্গিয়া—কনুইয়ের উপর ভর দিয়া অনেকটা শীকারোদ্যত পশুরাজের মত। ঐভাবে বসাই তাঁহার অভ্যাস। ঐ বসার ভঙ্গির সঙ্গে যে জানোয়ারের শীকার ধরার ভঙ্গির সাদৃশ্য আছে এটা অবশ্য তিনি কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই; লোকেও ভাবিয়া দেখে না—ভাবে ওটা একটা রাজকীয় কায়দা।

বাবু তাহার দিকে চাহিয়া একেবারেই বলিয়া দিলেন—পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। বস্ ওইখানে। দিয়ে উঠে যা।

পান্নু কোন প্রকার বিদ্রোহ করিল না। বসিল।

তাহার নীরবতায় বাবু অত্যন্ত চটিয়া গেলেন, তাঁহার আসনের নীচেই পড়িয়াছিল তাহার চটি—সেই চটি তুলিয়া লইয়া তিনি ছুড়িয়া মারিলেন পান্নুর মুখে—হারামজাদা—গরু মার তুমি? গোহত্যাকারী!

কর্ম্মচারীবৃন্দ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নায়েব আসিয়া বাবুর সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—থাক।

বাবু তাহার ইঙ্গিত বুঝিলেন, ডাকিলেন—চাপরাশী!

চাপরাশী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

বাবু বলিলেন—হিঁয়া খাড়া রহো।

চাপরাশীটা দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যাহার জন্য এত শঙ্কা, এত সাবধানতা—সে যেমন মাথা হেঁট করিয়া আসিয়াছিল, মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল—তেমনিভাবেই বসিয়া রহিল—জুতা খাইয়াও একবার মাথা তুলিল না।

অনেকক্ষণ পর বাবু আবার বলিলেন—গোহত্যা কর তুমি?

পান্নু এবার চোখ তুলিয়া চাহিল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—পান্নু কাঁদিতেছে।

পান্নুর ভয় দেখিয়া অনেকে আশ্বস্ত হইল—এইবার গোঁয়ারের শাসনকর্ত্তা মিলিয়াছে।

বাবু নিজের দণ্ড-বাক্য আবার উচ্চারণ করিলেন—পঞ্চাশ টাকা জরিমানা!

পান্নু এবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাবু বলিলেন—বস।

—টাকা তো আমার সঙ্গে নাই বাবু। টাকা আনতে হবে তো! পান্নু সবিনয়েই বলিল।

বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টার মধ্যে!

—তাই দোব।

পান্নু আধ ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিয়া নীরবেই কাছারী হইতে বাহির হইয়া গেল। বাবু বলিলেন—টাকাটা জমা কর। বাজে খাতে আদায়—।

অনন্ত বাহিরে প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। তাহার কেশ-কলাপের মূল্য হিসাবে বাজে খাতে খরচের কত অঙ্ক নির্দ্ধারিত হয় শুনিবার জন্য। সে শুনিল—জমাই হইল পঞ্চাশ টাকা। খরচের কোন উল্লেখই হইল না। সে আর একদফা অভিসম্পাৎ দিল পান্নুকে—শালার অম্লশূল হোক—কুষ্ঠ হোক—বজ্রাঘাত হোক মাথায়!

এতক্ষণ ভালয়-ভালয় কাটিয়াও শেষরক্ষা হইল না। হাঙ্গামা একটা বাধিল। বৈকালে বাবুদের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল পান্নুর বাড়ীর সম্মুখে। পান্নু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—আবার কি?

—বাছুরটা নিতে এসেছি।

—বাছুর? পান্নু সাফ বলিয়া দিল—বাছুর আমি দোব না।

পান্নুর ওবেলার অপরাধীর মত আচরণ দেখিয়া এবারকার অভিযানটা নিতান্তই নিরীহ-গোছের ছিল। আদালতের পরোয়ানা লইয়া আসে পিওন—জানে ওই শীলমোহরটাই তাহার বল। সেটা যেখানে অমান্য হইবার আশঙ্কা থাকে সেইখানেই আসে পুলিশ। পুলিশের পর আসে ফৌজ। ফৌজ রাজ্য দখলের পর পুলিশ শাসন করে—তারপর চলে পরোয়ানাতেই কাজ। ওবেলায় ফৌজ এবং পুলিশের কাজ হইয়া গেছে। তাই এ বেলায় শুধু রাখালটা এবং একজন গাহিন্দার গাড়ী লইয়া বাছুরটাকে লইতে আসিয়াছিল।

রাখাল ছোঁড়াটা বলিল—ওই। বাছুর যে আমাদের।

পান্নুর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিল—সে বীভৎসভঙ্গিতে হাত-পা নাড়িয়া

দাঁত খিঁচাইয়া বলিল—ওরে, শালার বেটা শালা, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, ভাল চাও তো বেরোও ! বেরোও, বলছি বেরোও।

রাখাল ও মাহিন্দারটা হতভম্ব হইয়া গেল।

পানু বলিল—খুন ক'রে ফেলব। বেরো, বলছি। বেরো।

তাহারা গাড়ী লইয়া পলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আবার আসিল অভিযান। সাত-আটজন চাপরাশী—হাতে লাঠি।

পানু এবার একগাছা লাঠি হাতে দাঁড়াইল। নীরবে—কোন আস্ফালন সে করিল না। কিন্তু চোখে তাহার এমন দৃষ্টি যাহা দেখিয়া মানুষের মনে হয় জ্বলন্ত কয়লার খণ্ডকে।

একজন চাপরাশী বলিল—বাছুর দিস নাই কেন ?

পানু বলিল—বাছুর আমি কিনেছি।

—কিনেছিস ?

—হ্যাঁ। সকাল বেলায় করকরে পঞ্চাশ টাকা গুণে দিয়েছি।

—সে তো জরিমানা।

—জরিমানা টরিমানা আমি বুঝি না। বাছুরটাকে আমি মেরেছি, খোঁড়া ক'রে দিয়েছি, বাবু তার জন্যে পঞ্চাশ টাকা চাইলে, তাই দিলাম—বাছুর কেনে দোব আমি ! তোর কোন জিনিষ ভেঙে দিলে—তার দাম দিতে আমি বাধ্য। কিন্তু তাহলে ভাঙা জিনিষটা তো আমার !

পানুর যুক্তির দাম ন্যায়শাস্ত্র দিবে কি না জানি না—কিন্তু চাপরাশীরা দিল। এই শ্রেণীর লোকের কাছে যুক্তিটার মূল্য আছে—তাহারা অন্ততঃ বুঝিল।

পানু বলিল—এর জন্যে খুন হতে হয় জান দিতে হয় তাও দোব। আয় কে আসবি বাছুর নিতে, চ'লে আয়।

রাজুবালা মুখ বাড়াইয়া বলিল—পুলিশে আমরা খবর দোব। জবরদস্তি করার আইন নাই। রাজুবালার কথাও তাহারা অবিশ্বাস করিল না। রাজু

সব পারে। চাপরাশীরা ফিরিয়া গেল নূতন হুকুমের জন্যে। প্রয়োজন হইলে তাহারা পান্নুর মাথা ফাটাইয়া দিতে পারে কি না—পান্নু তাহাদের মাথা ফাটাইলে বাবু তাহার কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবেন সেটা জানাও তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

* * *

চাপরাশীরা চলিয়া গেল; পান্নু তখনও ফুঁসিতেছিল।

রাজুবালাকে এ অঞ্চলের লোকে পথে ঘাটে দেখিলে ডাকিয়া কথা বলে, রসিকতা করে, মিষ্ট কথায় তাহার মনস্তুষ্টি করিতে চায়, কিন্তু অন্তরালে বলে—সাংঘাতিক মেয়ে, সাততলা বুদ্ধি, না-পারে এমন কাজ নাই। রাজুর সংসার-জ্ঞান সত্যই খুব টনটনে। আইন বে-আইনও সে বুঝে। রাজু চাপরাশীদের মুখে শাসাইল—আমরা তাহলে থানায় যাব। কিন্তু চাপরাশীরা চলিয়া গেলে পান্নুকে বলিল—একটা কথা বলব?

—কি? পান্নু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রু কুঁচকাইল—কথার সুরটাই তাহার ভাল লাগিতেছে না।

রাজু বলিল—এইখানে এস, লাঠিটা রেখে বস। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর—তারপর বলব।

পান্নু অত্যন্ত চটিয়া উঠিল—রাজিয়ার কথাগুলার প্রত্যেকটাতে যেন একটা করিয়া খোঁচা আছে, সে মাথা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—না—না—। কোন্ কথা হাম নেহি শুনেগা!

রাজু চুপ করিয়া গেল। বৈকাল বেলা গড়াইয়া চলিয়াছে, সে ঝাঁটা-গাছটা তুলিয়া লইয়া বৈকালের কাজ সারিবার দিকে মন দিল। পান্নু কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া হন-হন করিয়া আসিয়া দাওয়ায় উঠিয়া—লাঠিগাছটা রাখিল—রাজুর হাতে ঝাঁটাগাছটা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাকে টানিয়া বসাইয়া বলিল—কি বলছিস বল।

রাজু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তারপর বলিল—ওই পা-

ভাঙা বাছুরটা নিয়ে কি হবে? ও নিয়ে হাঙ্গামা করছ কেন? ওঁদের বা ওদের দিয়ে দেওয়াই তো ভাল!

পান্নু এ কথায় আবার চটিয়া উঠিল, বলিল—পা ভাঙা সারবে। আ বাছুর ওদের কি ক'রে হ'ল? বাছুর আমার।

—তোমার কি ক'রে হ'ল?

—আমি পঞ্চাশ টাকা দিলাম যে।

—সে তো বাছুরটার পা ভেঙেছ বলে।

পান্নু বিব্রত হইয়া উঠিল, অনেক ভাবিয়া বলিল—বাছুরটার কত দাম?

—সে আর কত হবে? পাঁচ টাকা কি সাতটাকা—বড় জোর—দশটা টাকা।

—তবে? বাছুরটার দাম দশটাকা, তা ওর একটা ঠ্যাঙের দাম পঞ্চাশ টাকা কি ক'রে হয়?

এবার রাজুকে নির্ব্বাক হইতে হইল। পান্নু হঠাৎ তাহার একটা হাত টানিয়া ধরিয়া একটা কাঁচের চুড়ি দেখাইয়া বলিল—এটার কত দাম?

—কেন?

—বল, বলছি—বল?

—চার আনা।

পান্নু উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল, ফিরিয়া আসিয়া রাজুর হাতখানা আবার টানিয়া—মাটিতে ঠুকিয়া দিল। চুড়িটা ভাঙিয়া গেল। পান্নু একটা টাকা রাজুকে দিয়া বলিল—ওই নে! দাম দিলাম। তারপর ভাঙা চুড়ির টুকরা দুটা কুড়াইয়া লইয়া বলিল—এ দুটো এখন কার?

রাজু এবার পান্নুর ন্যায়শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণের মর্ম্ম বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—মরণ আমার! গরুটা যে জ্যান্ত জানোয়ার। ওটা কি কাঁচের চুড়ি?

রাজু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—পাঁঠাও তো জানোয়ার, কিনে

কাটি। গরু কিনে যে মুসলমানে কাটে। বাবুরা যে গুলী ক'রে পাখী মারে, কাউকে দামও দেয় না!

রাজু এবার বলিল—বাবু তো তোমাকে বাছুর বেচে নাই।

—তবে পঞ্চাশ টাকা নিলে যে?

—সে তো জরিমানা!

—জরিমানা? জরিমানা কি? জরিমানা কেনে দিব আমি? কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বারবার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—জরিমানা আমি কেনে দিব? উ আমি দিব না। ওটাকা দিলাম আমি, বাছুর আমি দিব না। দিব না আমি। জান কবুল! উ দিব না আমি!

রাজু শঙ্কিত হইল। পানুর ন্যায়ের তর্ক সে বুঝিয়াছে। কিন্তু ও ন্যায়ের যুক্তি জমিদার মানিবে কেন? জমিদারেরও যে পানুর মত একটা নিজস্ব ন্যায়শাস্ত্র আছে। সে ন্যায়ের যুক্তি অস্বীকৃত হইলে তাহার মীমাংসার পথও জমিদারের নিজস্ব মীমাংসা শাস্ত্র। তাহার বিধি-বিধানের সঙ্গেও রাজুবালার পরিচয় আছে। কাজেই সে শঙ্কিত না হইয়া পারিল না।

ফিরিয়া আসিয়া পানু কিন্তু নির্ব্বিকার। সে বাছুরটার পাশে বসিল। বাছুরটা এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। পা তাহার জোড়া লাগে নাই, কিন্তু তিনদিন সে পেট পুরিয়া খাইয়া অন্যদিকে সুস্থ হইয়াছে। তা ছাড়া এত সেবা সে কখনও পায় নাই। তাহার রোম-বিরল গায়ের চামড়া হইতে 'এঁটুলি' তুলিয়া ফেলা হইয়াছে; গরমজলে সমস্ত দেহের ক্লেদ মুছাইয়া দেওয়া হইয়াছে; বেশ সুস্থভাবে সে রোমন্থন করিতেছিল। পানু তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিল। বাছুরটা ফোঁস ফোঁস করিয়া পানুকে শুঁকিয়া দেখিতেছিল।

রাজু পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—সব্বনাশী! সব্বনাশী কোথা থেকে এসে একমুঠো টাকায় গায়ে জল দিলে।

পানু বলিল—এইবার ওর গায়ে বেশ রোঁয়া গজাবে রাজি, না?

রাজি বলিল—হাঁ, একবারে এলোকেশী হবে। এই বড় বড় চুল।

পানু হঠাৎ বাছুরটার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আচ্ছা বলেছিস রাজি; উ আমার সব্বনাশী—এলোকেশী!

বাইশ

রাজু রোজই আশঙ্কা করে—আজ একটা কিছু ঘটিবে। কিন্তু দুদিন তিন-দিন হইয়া গেল—কিছুই ঘটিল না। রাজু একটু বিস্মিত হইল।

পানুর কোন চিন্তাই ছিল না। সে শুধু তাহার লাঠিগাছটা একেবারে হাতের পাশেই রাখিয়াছে এবং ধারালো 'হেঁসো' নামক অস্ত্রখানা তাহার বসিবার জায়গার সামনে চালের বাতায় আটকাইয়া রাখিয়াছে, নহিলে সে নির্ভয়।

তাহার 'সর্ব্বনাশী এলোকেশী' এ কয়দিনে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে। বাখারী বাঁধা পা'খানা খোঁড়াইয়া টানিয়া চলিবার চেষ্টা করে। দুই-চারি পা চলিতেও পারে। বর্ষার ডাঙাজমির বুকের ঘাসের অঙ্কুরের মত তাহার রোঁয়া উঠা চামড়ার ছোট ছোট রোঁয়া গজাইতে সুরু করিয়াছে। তাহার গলার ডাকে বেশ জোর ধরিয়াছে, খাওয়ার সময় কোন রকমে পার হইলেই সে তার-স্বরে চীৎকার সুরু করে। 'সর্ব্বনাশী' চীৎকার আরম্ভ করিলেই রাজু এবং সেজবউ ব্যস্ত হইয়া উঠে, বিশেষ করিয়া সেজবউ। সর্ব্বনাশীর সঙ্গে এখনি পানুও চীৎকার আরম্ভ করিবে ষাঁড়ের মত। রাজুর রক্ষা আছে, তাহার অনেকটা সময় বাহিরে কাটে, সেজবউয়েরই যত জ্বালা।

দিন পনেরো পর।

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সেজবউ পুকুর ঘাটে আঁচাইতে গিয়া পরম উপাদেয় কলহপালার সন্ধান পাইয়া সেইখানেই জমিয়া গেল। পুকুরটার ওপারেই হাড়িপাড়া। হাড়িপাড়ায় ঝগড়া বাধিয়াছে। হাড়িপাড়ার 'সুকো'

হাড়িনী, আসল নাম সুখদা, নাচিয়া নাচিয়া গালিগালাজ করিতেছে। 'সুকো' হাড়িনীর ঝগড়ার ওই বিশেষত্ব, সে সত্যসত্যই নাচে আর গাল দেয়—"ওলো তুই বাপের মাথা খা'লো। ওলো তুই ভাইয়ের মাথা খা'লো। ওলো তুই ভাতারের মাথা খা'লো! ওলো তুই গতরের মাথা খা'লো! চোখের মাথা খাও, তুমি কানা হও, কানা হও; পা দু'খানি ভেঙে যাক—খোঁড়া হও, খোঁড়া হও; নাকে তোমার পিঙেস হোক, খোনা হও, খোনা হও! গতরের মাথা খেয়ে ভিখ ক'রে খা'লো, ভুগে ভুগে মর লো! মরলো, মরলো—ওলো তুই মরলো।" বলিয়াই, সে ঘুরপাক দিয়া নাচিয়া একটা পর্ব্ব শেষ করে।

ছন্দে গাঁথা গানের মত গালাগালখানি সুকোর মুখস্ত। একটি শব্দের এদিক ওদিক হয় না। নাচের সঙ্গে তালে তালে গানের কলির মত এক একটি পর্য্যায় শেষ হয়। অস্থায়ী অন্তরা প্রভৃতিও বোধ করি বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়। 'সুকো' গাল দিতে আরম্ভ করিলে লোকে দাঁড়াইয়া দেখে, মেয়েদের গা কেমন শির শির করে। গালাগাল শুনিতে শুনিতে সেজ-বউয়ের গাও কেমন শির শির করিতেছিল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল—বাপ-ভাই-স্বামী-গতর প্রভৃতির সহিত অভিসম্পাৎ শেষ করিয়াই এইবার 'সুকো' অশ্লীল পর্ব্ব আরম্ভ করিবে।

ঠিক এই সময়েই বাড়ীর ওদিক হইতে 'সর্ব্বনাশী' রব তুলিল। বাড়ীর খাওয়া-দাওয়ার পরই তাহাকে অবশিষ্ট ভাত ডাল তরকারী যাহা থাকে সেগুলি বেশ করিয়া চটকাইয়া খাওয়ানো হয়। পনেরো দিনেই সর্ব্বনাশীর সময়গুলি এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, ইহারই মধ্যে আদরিণী আবদেরে খুকীর মত চীৎকার সুরু করিয়া দিয়াছে। পানু বারান্দার তক্তপোষে শুইয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙিয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। ঘুম ভাঙার বিরক্তির ফলে তাহার এলোকেশীর প্রতি অবহেলার অপরাধটা এত বড় হইয়া উঠিবে যে সেজবউয়ের উপর—ওই বাছুরটার উপর লাঠি চালানোর মত—লাঠি চালানোও আশ্চর্য্য নয়। সেজবউ বেচারা ছুটিতে আরম্ভ করিল।

বাড়ী আসিয়াই হুড়মুড় করিয়া ভাত ডাল মিশাইয়া লইয়া সর্ব্বনাশীর উদ্দেশ্যে চলিল। হতভাগী কিন্তু এতক্ষণে থামিয়াছে। পানুরও তর্জ্জন গর্জ্জন শোনা যায় না। সেজবউ আশ্বস্ত হইল। ভগবান সর্ব্বনাশীকে সুমতি দিয়াছেন; সে চুপ করিয়াছে। পানুও জাগে নাই। বাড়ীর বাহিরের দাওয়ায় আসিয়াই, কিন্তু সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সর্ব্বনাশী খোঁড়া পা'খানা টানিয়া দাওয়ার ধারেই গাছগুলির কাছে হাজির হইয়াছে। শুধু তাই নয়, সেই হেনার গাছটি এই পনের দিনে আবার কতকগুলি পাতা মেলিয়াছিল, সেইগুলিই সে টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইতে সুরু করিয়াছে। ভাগ্য ভাল যে, পানু এখনও জাগে নাই। সেজবউ ছুটিয়া গিয়া সর্ব্বনাশীকে ধরিয়া টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল, চাপাগলায় তাড়া দিল—হেট! হেট! হেট! সর্ব্বনাশী কিন্তু কিছুতেই আসিবে না। সেজবউয়ের আকর্ষণের বিরুদ্ধে সে তাহার তিনখানা পায়েরই খুঁট দিয়া গাছটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। সর্ব্বনাশীর এতখানি শক্তি এবং ওজন সেজবউ কল্পনা করিতে পারে নাই। অতর্কিত-ভাবে সর্ব্বনাশীর ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া—নিজের কাপড় পায়ে বাধাইয়া সে-ই পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হো-হো হাসির শব্দে স্থানটা সচকিত হইয়া উঠিল। পানু হাসিতেছে। সেজবউ তাড়াতাড়ি উঠিয়া সর্ব্বনাশীকে আবার ধরিল।

পানু বলিল—ছেড়ে দে।

সেজবউ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু ছাড়িয়া দিতেও সে পারিল না।

—ছেড়ে দে।

—আবার সে হেনার গাছটা খেয়ে দিলে।

—দেখেছি। ছেড়ে দে, থাক।

সেজবউ ছাড়িয়া দিল।

পানু উঠিয়া ভাত-ডালের পাত্রটা লইয়া গিয়া এলোকেশীর মুখের কাছে ধরিল। বলিল—এই খা।

এলোকেশী ফোঁস্ শব্দ করিয়া মাথা নাড়িল, অর্থাৎ না। মাড়-ভাতের চেয়ে হেনা গাছের পাতা কয়টা অনেক সুমিষ্ট। পাসু এলোকেশীর মুখের দিকে চাহিয়া রসিকতা করিল, হুঁ। পাতাই মিষ্টি! গরু কিনা! তারপর সে গোটেই ডালটার পাতাগুলি নিঃশেষে ছিঁড়িয়া ওই মাড়-ভাতের সঙ্গে মিশাইয়া দিল। বলিল, নে এইবার খা।

এলোকেশী এবার মাড়-ভাতের পাত্রে মুখ ডুবাইল।

ব্যাপারটা দেখিয়া পাসুর তৃতীয় বউ সেজ বিস্ময়ে কেমন হইয়া গেল। ঠিক এই সময়ে ফিরিল রাজু; বাবুদের গ্রামে সে দুধ বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। পাসুর পিছনে সেজর সঙ্গে সামনাসামনি দাঁড়াইয়া সেও অবাক হইয়া গেল। ব্যাপারটা কি? সেজ বউয়ের মুখে এমন অভিব্যক্তি সে কখনও দেখে নাই। চোখে শঙ্কা নাই, ভঙ্গিতে সঙ্কোচ নাই অথচ চোখ দুইটা ছানাবড়ার মত বড় হইয়া উঠিয়াছে। আবার আনন্দ বা পুলকের কোন দীপ্তি বা চঞ্চলতাও এক বিন্দু নাই; সৃষ্টিছাড়া ধরণে পাসু তাহাকে কোনরকম সমাদর করিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। এই ধরণের সমাদর রাজু নিজেও মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকে; রাজু যে রাজু, যে এই জীবনে বহুস্থানে বিচরণ করিয়াছে—কয়েক জন পুরুষকেই পরখ করিয়াছে—সেও পাসুর এই বিচিত্র সমাদরে বিস্মিত হতবাক হইয়া যায়। এই কিছুদিন আগের কথা। রাজুকে লইয়া সে নির্জ্জন দুপুরে একরকম লোফালুফি করিতেছিল, হঠাৎ তাহাকে বলিল, বস্! তারপর একগাছা হেঁসো লইয়া বলিল—তুই এত্‌না মিঠা রাজু। তোকে আজ কেটে দেখব তোর ভিতর কি আছে! গ্রামপ্রান্তে ঘর, তাহার উপর গ্রীষ্মকালের দুপুরে মানুষজন দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘরে ঘরে তন্দ্রাচ্ছন্ন, চীৎকার করিলে কেহ শুনিতে পাইবেনা, শুনিলেও ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না, চীৎকারে পাসু রাগিয়া উঠিলে হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই কোপ বসাইয়া দিবে। সে স্থির নির্ব্বাক হইয়া পাসুর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ পাসু হা-হা করিয়া হাসিয়া হেঁসোটা ফেলিয়া দিয়া রাজুকে

লইয়া আবার খেলা করিতে আরম্ভ করিল। বলিল—তু, বহুত বোকা রাজিয়া, বহুত বোকা! বেশ মনে আছে চতুরা রাজুর চাতুর্য্য সেদিন—(মুহূর্ত্তে স্ফুরিত হয় নাই, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতে দেহে ও মনে, আনন্দ এবং পুলক সঞ্চারিত হইয়াছিল। পান্নুর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলিবার কথাও মনে হয় নাই। বর্ব্বর সমাদরও উপভোগ্য মনে হইয়াছিল। কিন্তু সেজর ব্যাপারটা কি? পান্নুর পিছনে দাঁড়াইয়া ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল—কি? হ'ল কি?

উত্তরে সেজও নিঃশব্দে বিস্ময়ের ইঙ্গিতে ঘাড় নাড়িল, চোখ দুইটা আরও খানিকটা বড় করিয়া গালের উপর হাত রাখিল—অর্থাৎ—অবাক্!

রাজু এবার ঘটি রাখিবার অছিলায় বাহির-বাড়ী হইতে ভিতরের উঠানে গিয়া দাঁড়াইল, চোখের ইশারায় সেজকে ডাকিয়া—উঠান হইতে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সেজ বউয়ের প্রাণটাও আই-ঢাই করিতেছিল, পেটটা যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে। রাজুকে ইঙ্গিতে জানাইতে গিয়া আকুলতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সেও আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং বলিল—অবাক! দিদি অবাক!

—কি? কি অবাক?

—মিন্‌সে আর ছ'মাস পেরুবে না দিদি। এ আমি বলে রাখলাম।

—হল কি তাই বল আগে।

—মতিভ্রম, দিদি মতিভ্রম। মরণের ছমাস আগুতে মানুষের মতিভ্রম হয়। যে গাছের পাতার লেগে বাছুরটার ঠ্যাঙ ভেঙেছিল—সেই গাছ আবার আজ খেলে ওই সর্ব্বনাশী; তা হা-হা ক'রে হাসি কি? তা 'পরে দিদি সে অবাক কাণ্ড।

আবার সে চোখ বড় করিয়া গালে হাত দিল।

রাজু ভ্রূকুঞ্চিত করিল—মনে হইল এই বিড়ালীর মত মেয়েটার গালে ঠাস করিয়া একটা চড় কষাইয়া দেয়। সেজ বউ কিন্তু রাজুর বিরক্তি

বুঝিস। সে বলিল—তুমি সে দেখ নাই, তুমি বুঝতে নারছ; তা পরে করলে কি জান? সর্বনাশী ওকে শুঁতিয়ে দিলে, ফোঁস করলে—মাড় ভাত মুখে ধরলে তা খেলে না, ওই গাছের ওপর ঝোঁক। শেষ নিজে হাতে দিদি—নিজের হাতে—

রাজু বলিল—থাম। সে কান খাড়া করিয়া ঘাড় তুলিল।

সেও বোকার মতই প্রশ্ন করিল—এঁ্যা?

—থাম। বুঝি—

রাজুর কথা ঢাকিয়া বাহিরে রাস্তার উপর কোথায় চমৎকার শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এদেশে পুজার সময় যে ঘণ্টা বাজায় সে ঘণ্টা নয়; এ ঘণ্টার সুর আলাদা—ঢং আলাদা।—টিং টং; টিং টং; টনো টং টনো টং; টং-টং-টং-টং!

তাহার সঙ্গে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠিতেছে। রাজু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাবুদের গাড়ী। নিশ্চয় বাবুদের গাড়ী। বাবুদের গ্রামে পশ্চিমা ভুপা মাহাতোর খান দুয়েক ছ্যাকরা গাড়ী আছে, তাহাতে ঘণ্টাও নাই, তাহার ঘোড়া দুইটার আটটা খুরে এমন জোরালো খপ্ খপ্ খপ্ খপ্ শব্দও উঠে না। শব্দ দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে। রাজু বাহিরে আসিল। পান্নুও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। পথের দিকে চাহিয়া আছে।

এবার বাবুদের গাড়ীটা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কালো রঙের গাড়ীতে সাদা জুঁড়ি। কোচম্যানের মাথায় সাদা চাদরের ধবধবে পাগড়ী। তাহার পাশে লাল পাগড়ী মাথায় চাপরাশী।

কি জন্য আসিতেছে? বাবুদের জুড়ি? অনন্ত ঠাকুর গরুর গাড়ী লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, এবার কি সে জুড়ি চড়িয়া আসিতেছে? অনন্ত ঠাকুর বাবুদের বাড়ীর ঠাকুরের পিতলের রথে চড়ে ঠাকুরের সঙ্গে, কিন্তু জুড়িতে চড়িতে তো পায় না! বাছুরটাকে লইয়া যাইবার জন্য ওবেলা গরুর গাড়ী আসিয়াছিল; ঘোড়ার গাড়ী নিশ্চয় সেটাকে লইবার জন্যও আসিতেছে না!

ঘোড়ার গাড়ীটার পিছন দিক হইতে আরও দুইটা লাল পাগড়ীপরা ভোজপুরী পালোয়ান, চাপরাশীর মাথা দেখা যাইতেছে। কোচম্যান-রাশ টানিয়া ঘোড়া দুইটার গতি মন্থর করিতেছে। গাড়ীটা যে তাহার এখানে আসিয়াছে এবং বাছুরটার স্বত্বের মামলার চরম মীমাংসার জন্য আসিয়াছে, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। রাজুরও না, পাঙ্গুরও না। রাজু বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, ভিতরের উঠান পার হইয়া খিড়কীর দরজার পথে বাহির হইয়া গাছপালার ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। পাঙ্গু আপনার দরজার উপর উঠিয়া এক হাতে পরচালার চালের একখানা বাখারি ধরিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক ওই বাখারিখানার উপরেই চালের খড়ের মধ্যে তাহার ধারালো হেঁসো নামক অস্ত্রখানা গোঁজা আছে।

গাড়ীটা আসিয়া ঠিক তাহার দাওয়ার সামনেই থামিল। রাশ টানিয়া কোচম্যানটা চুক চুক শব্দে ঘোড়া দুইটাকে বাহবা দিয়া শান্ত হইতে ইসারা করিল। দারোয়ান তিনজন লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল। একজন গাড়ীটার পাদানির দরজাটা খুলিয়া দিল। ভিতরের একজন মানুষের পায়ের দিকটা দেখা যাইতেছে কিন্তু কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত প্রায় আড়াল পড়ায় ঠিক চেনা যাইতেছে না। ম্যানেজার?

দরজাটা খুলিয়া দিতে স্বয়ং বাবুই নামিলেন। তাঁহার হাতে একগাছা লম্বা চাবুক।

তেইশ

স্বয়ং বাবুই আসিয়াছেন।

তিনি ঠিক বাছুরটার জন্য আসেন নাই। বাছুরটা গোবৎস না হইয়া ছাগবৎস হইলে এর চেয়ে বেশী দরদ থাকিত তাঁর, বিলাতী কুকুর হইলে কথাই ছিল না। বাছুরটার জন্য লোভ বা শখ তাঁহার আদৌ নাই। জরিমানা দিবার পর পাম্বু যদি জোড়হাত করিয়া তাঁহাকে বলিত—বাবু বাছুরটা আমাকে দিতে হবে,—এমন কি সকালে চাপরাশীদের সঙ্গে গিয়াও বলিত—তবে তিনি নিশ্চয় ওটাকে দান করিতেন; যে গাড়ীটা লইতে আসিয়াছিল সেই গাড়ী করিয়াই পাঠাইয়া দিতেন। এমন কি হাসিয়া বলিতেন—'ইচ্ছে হয় তো আরও দুটো নিয়ে যা!' কারণ বাড়ীর বালিকা গোমাতাগুলি তাঁহাদের মত বাবুদের বাড়ীতে কুলীন কন্যার চেয়েও গলগ্রহ; ওগুলা কোন কাজেই আসে না। শ্রাদ্ধ শান্তিতে দান করিতে দুই চারিটা লাগে, বাকীগুলা শুধু ভাগাড়ে ফেলিতে হয় কিন্তু হতভাগা পাম্বু ওবেলায় তাঁহার চাপরাশীদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, অনন্তঠাকুর ন্যাড়ামাথার চুল ছিঁড়িতে পায় নাই—তাহার পরিবর্ত্তে বুক চাপড়াইয়া ব্যাপারটাকে এমন ক্ষোভের সহিত নিবেদন করিয়াছে যে তিনি দুরন্ত ক্রোধে এই গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে নিজেই জুড়ি হাঁকাইয়া আসিয়াছেন। গাড়ীর ভিতর বসিয়া আসিবার পথে তাঁহার মনে বিস্ময়েরও উদ্রেক হইয়াছে!

লোকটার সম্পর্কে তাঁহার প্রচণ্ড কৌতূহল জন্মিয়াছে। এই লোকটাই দিন কয়েক আগে তাঁহার কাছারীতে বিনা বাক্যব্যয়ে গিয়া হাজির হইয়াছিল। অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছিল, তিনি নিজেও একটা হাঙ্গামা অনুমান করিয়াছিলেন। যে লোক একটা গাছের কয়টা পাতা খাওয়ার জন্য একটা বাছুরকে মারিয়া ফেলিবার মত আঘাত করিতে পারে তাহার সম্পর্কে

সকল শোনা কথাই তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু সব অনুমান ব্যর্থ করিয়া দিয়া কাছারী ঘরে লোকটা অপরাধীর মত হাজির হইল—বাবু জুতা মারিলেন—মাথা পাতিয়া সহ্য করিল। পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিলেন—অবনত মস্তকে জরিমানা আদায় দিল। লোকে বলিল—তিনিও বুঝিলেন, লোকটার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি জন্মিয়াছে।

সেই লোকটাই হঠাৎ লাঠি হাতে তাঁহার চাপরাশীদের বিরুদ্ধে নিদারুণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে! অনন্তের কথা তিনি ধরেন না। চাপরাশীগুলিকে তিনি জানেন। তাহারা সহজে ফিরিয়া আসে না। অন্ধকারের মধ্যে পোষা জানোয়ার যেমন বিপদ আপদকে একটা স্বভাব-বোধের দ্বারা অনুমান করিতে পারে, ঐ সব ব্যাপারে তাহাদেরও একটা স্বভাববোধ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে অনুমান অভ্রান্ত পরিণতিতে পৌছায়। তাহারা বলিতেছে—খুন-খারাবি একটা হইয়া যাইবে।

এমন কি করিয়া হয়? গাড়ীতে তিনি এই কথাই ভাবিতেছিলেন। তিনি অবশ্য সমস্ত কিছুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলেই হয় তো কাজ শেষ হইয়া যাইবে। না হইলে চাপরাশী তিনজন আসিয়াছে, তাহারা ভোজপুরের লোক—রীতিমত পালোয়ান, পান্নুর বিক্রম যতই হোক, তিনজনের যৌথ শক্তির কাছে, শহরের মাড়োয়ারীর গদির কাছে গ্রাম্য মহাজনের কারবারের মত নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তিনি নিজে আনিয়াছেন চাবুক, ঘোড়ার চাবুক নয়, সখ করিয়া কেনা শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক, লম্বা—লিক্‌-লিকে। আস্ফালন মাত্রেই তীব্র শিষের মত শব্দ করিয়া বেদের ঝাঁপির খোঁচাখাওয়া তেজালো সাপের মত ফোঁসাইয়া সাড়া দিয়া ওঠে। চাবুকটা ছাড়াও আর একটা অস্ত্র তিনি আনিয়াছেন। পকেটে তাঁহার পিস্তল আছে। সিক্স-চেম্বার অটোমেটিক। পকেটে থাকিলে বুঝিবার পর্যন্ত উপায় নাই।

বাবু নামিয়াই ভুরু কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। বৎসর কয়েকই

তাঁহার এ দিকে আসিবার কোন কারণ ঘটে নাই। তবে পরিচিত অঞ্চল, যৌবনে এ অঞ্চলে শিকার করিতে আসিতেন, কয়েক বৎসর আগেও একটা গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনিবার জন্য এই পথে কয়েকবারই সেই গ্রাম দেখিতে গিয়াছেন, এই পথেই ফিরিয়াছেন। বেশ মনে পড়িতেছে রুক্ষ লাল মাটির প্রান্তরের মধ্যে একটা মজা দীঘি; দীঘিটার কোণে দুইটা রাস্তার সংযোগ-স্থলে একটা বটগাছ ছাড়া আর কিছু ছিল না। মনে পড়িল বটগাছটার তলায় দূরের যাত্রী গাড়োয়ানরা এখানে গাড়ী রাখিয়া 'আঁট' দিত। এই বটগাছটা ছিল হরিয়াল পাখীর একটা আস্তানা। তাঁহার অল্প বয়সে যখন মজা দীঘিটায় অল্প-স্বল্প জল থাকিত তখন এখানে মরাল পাখী পাওয়া যাইত। বটগাছটাও আছে। কিন্তু গাছটা ছাড়া সে পুরাতন স্থানটার আর কিছুই নাই! রাস্তাটার দুইপাশে দুইটি সতেজ সবুজ ফলের চারায় ভরা বাগান, ইহারই মধ্যে সেকালের রোদে-পোড়া রাস্তার উপর ছায়া ফেলিয়া স্নিগ্ধ আভাস আনিয়াছে। মজা দীঘিটাকে দেখিয়া চেনা যায় না; ঠিক মাঝখানে কালো জলে পরিপূর্ণ পরিষ্কার একটি ছোট পুকুর, চারিপাশে সযত্ন কর্ষিত উর্ব্বর মাটির ক্ষেত। বাগান দুইটির মধ্যে কলাগাছগুলি সমারোহের সৃষ্টি করিয়াছে। ফলভারে বড় বড় গাছগুলি হেলিয়া পড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যে তরীর লতা। আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন তরমুজের গাছ দেখিয়া। তাঁহার চোখে যেন স্নিগ্ধ সবুজ কাজলের স্পর্শ লাগিয়া গেল।

এককালে বাবুর থিয়েটারের ঝোঁক ছিল। একটা নাটকের গল্পের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। বইখানার নাম বা গ্রন্থকারের নাম মনে নাই। সে এক বাদশার গল্প। বাদশা বন্দিনী করিয়া আনিয়াছিলেন পরমা সুন্দরী এক কুমারীকে। সম্ভবত কোন শাহ্জাদী। বন্দিনী শাহজাদীকে বাদশা বিবাহ করিতে চাহিলেন। মনে আছে, বাদশা তাঁহার মণিময় তাজ কুমারীর চরণতলে লুটাইয়া দিলেন, কোষাগারের সমস্ত মণিমুক্তা ঢালিয়া দিলেন। বলিলেন—'তোমার মুখের এক টুক্‌রা হাসির জন্য দুনিয়া জালিয়ে

দিয়ে রোশনাই দেখাতে পারি, এই রাজ্য সম্পদ সব ফেলে ফকির হতে পারি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, হাসো।' কুমারী জলভরা চোখ তুলিয়া বাদশার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'হাসি আমার আসছে না শাহান শা! আপনার এই বাগিচার গায়েই চেয়ে দেখুন ওই পাহাড়ের দিকে, কালচে-নীল মরা পাহাড় ধূ ধূ করছে—ধূ ধূ করছে; ওরই ছায়া পড়েছে আমার বুকে—আমার চোখে, আমার ঠোঁটে—আমার মনে। ওই পাহাড়কে সবুজ করে তুলতে পারেন শাহান শা? বানাতে পারেন ওখানে বাগিচা, বইয়ে দিতে পারেন ছোট্ট ঝরণা?

বাদশার ঘোষণায় কোন দেশান্তর থেকে আসিল এক পাগল শিল্পী। তার নাম ফরহাদ। কুমারীটির নাম শিরি। হ্যাঁ, শিরি-ফরহাদের কাহিনী; প্লে-টার নাম 'শিরি ফরহাদ।' নাট্যাভিনয়কে বাবুরা বলেন প্লে।

ফরহাদ আসিয়া সেই মৃত্যুরহস্যভরা কৃষ্ণাভনীল মরুপাহাড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল। কৃষ্ণনীলাভার মধ্যে শুভ্রবর্ণের ওগুলি কি দেখা যায়? কঙ্কাল। জীব-জন্তু-পাখী মানুষের কঙ্কাল। মৃত্যু ওখানে তৃষ্ণার বিষজিহ্বা বাহির করিয়া বসিয়া আছে। যে যায় সে তৃষ্ণায় বুক ফাটাইয়া ঢলিয়া পড়ে। ওইখানে বহাইতে হইবে শীতল স্নিগ্ধ কালোজলের ঝরণা। নীলাভ পাহাড় কাটিয়া মৃত্যুর বুক চিরিয়া জীবন আবিষ্কার করিতে হইবে। পাথর কাটিয়া সেখানে মাটি বাহির করিয়া রচনা করিতে হইবে সবুজ [illegible]ক্ষেত্র, রোপণ করিতে হইবে আঙুরের লতা, ডালিমের ঝাঁক, আপেল নাসপাতির গাছ।

ফরহাদ কুমারী শিরির বিষণ্ণ জলভরা আয়ত চোখের দিকে চাহিল, তাহার অপার মমতা-বিধুর মুখের দিকে চাহিল। ভুলিয়া গেল পৃথিবী—ভুলিয়া গেল মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা। তাহার বুকে এক বিপুল প্রেরণা অনুভব করিল। ফরহাদ মৃত্যুরহস্যভরা মরা-পাহাড় কাটিয়া রচনা করিল তেমনি উদ্যান। নন্দন-কানন রচনা করিয়া ফরহাদ মরিল। শিরিও মরিল ফরহাদের

বুকের উপর পড়িয়া! চমৎকার প্লে-টা। বাবুর মনে ঘোর ধরিয়া গিয়াছিল। বাহিরের স্নিগ্ধ শ্যামশ্রী এবং স্মৃতির ওই গল্প দুইয়ে চমৎকার মিশিয়া গিয়াছিল; তাঁহার সন্ধ্যাকালের পরম উপাদেয়—হুইস্কি এবং সোডার মত।

এইবার তিনি পান্নুর দিকে চাহিলেন। পান্নুকে না-দেখা নন, দেখিয়াছেন কিন্তু ওই রোমান্সের ঝোঁকে পান্নুর মধ্যে ফরহাদের মত শিল্পীকে আবিষ্কার করিতে চাহিলেন। কালো রঙ, কুশ্রী মুখ, বিশাল দুইটা কাঁধ, প্রশস্ত মাংসল বুক, হাত দুইটা যেন সতেজ লাল সেগুন শিরীষের নধর শাখার মত। বাবু তাহাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে চোখের এবং মনের রঙের ঘোর কাটিতেছিল।

পান্নু ঠিক একভাবে দাঁড়াইয়াছিল। ডান হাতে চালের বাখারি ধরিয়া আঙুল দিয়া হেঁসোর বাঁটখানা খুঁজিতেছিল। প্রয়োজন হইলেই—।

বাবু আগাইয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন। চাবুকটা বাঁ'হাতে লইয়া ডান হাতের আঙুল দিয়া পান্নুর বুকের পেশীতে খুঁচিতে আরম্ভ করিলেন।

পান্নু হেঁসোর বাঁটখানা একবার চাপিয়া ধরিল। তারপর বিস্মিত হইয়া আবার ছাড়িয়া দিল।

বাবু হঠাৎ তাহার ডান হাতখানাই চাপিয়া ধরিলেন। পান্নু চমকিয়া ঝটকা মারিয়া হাতখানা ছাড়াইয়া লইল এবং চালের দিকে হাত তুলিল। বাবু হাসিলেন, বলিলেন—হ্যাঁ, তোর গায়ে জোর আছে। শরীরও পাথরের মত। এসব তুই নিজে করেছিস? নিজে হাতে?

পান্নু বিস্মিত হইল। বাছুরটা ছাড়িয়া তাহার সঙ্গে বুঝাপড়া ছাড়িয়া বাবু তাহার ক্ষেতখামার বাগান—তাহার দেহখানাকে যেন চোখ দিয়া চুষিয়া খাইতে চায়। সে সবিস্ময়েই উত্তর দিল—হ্যাঁ। নিজের হাতে করলাম। মজুরও লাগালাম কিছু কিছু।

—হ্যাঁ। কিন্তু কিসের জন্য এত সব করলি?

—কেনে? সবাই যার জন্য করে! নিজের জন্যে। পেটের জন্যে

বাবু আবার হাসিয়া ফেলিলেন। বুদ্ধিহীনের বিপুল শক্তির মূল্য এইটুকুই বটে। এক কুঁচি হীরার দামের কাছে টন্ টন্ কয়লার দাম চিরকালই তুচ্ছ হইয়া যায়। তাও যদি কয়লাটা ভাল হইত! ওরে হতভাগা, এই প্রান্তরে এই পরিশ্রম না করিয়া উর্ব্বর কোন স্থান লইয়া পরিশ্রমটা করিলে ইহার অপেক্ষা কত ভাল হইত বল দেখি! কিন্তু সে কথা এই বর্ব্বরটাকে বলিয়া লাভ নাই। কর্ত্তব্যটা করিতে হইবে। বর্ব্বর শক্তিকে শাসনে রাখিতে না পারিলে সর্ব্বনাশ হয়। বুনো হাতী আর পোষা হাতী তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত!

বাবু এবার বলিলেন—হুঁ। পেট তোর অনেকটা বড় দেখছি! তা বেশ। কিন্তু—। শঙ্কর মাছের চাবুকটা আবার ডান হাতে লইয়া বলিলেন—আমার চাপরাশীদের কি বলেছিস ওবেলা?

পানু হেঁসোর বাঁটখানা চাপিয়া ধরিল, চালের খড়ের মধ্যে।

—তোকে আমি চাবুকে সোজা ক'রে দিতাম! কিন্তু—।

সঙ্গে সঙ্গে পানু চালের খড়ের মধ্য হইতে সড়াক করিয়া হেঁসোখানা বাহির করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। পানু দাওয়াটা চারিদিক লোহার শিক দিয়া ঘেরিয়াছে, শুধু একটা দুয়ার। সুতরাং দুয়ারে হেঁসো লইয়া দাঁড়াইলে, পানু বলে—যমের বাবার সাধ্যি নাই যে ঢোকে। মূর্খ পানু, সে এ-কালের যমকে ঠিক চেনে না। এবং ব্যাকরণ-জ্ঞানও নাই, তাই কিন্তুর পর বাবুর কথাগুলা যে ব্যাকরণ অনুসারে মারিবার অভিপ্রায়ের বিপরীত অর্থ ব্যক্ত করিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। হেঁসো বাহির করিয়া দাঁড়াইল।

বাবু পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন—হেঁসো ফেল! তিন গুণতে গুণতে ফেলবি। নইলে বুকে গুলী করব তোর। এক—।

পানু চমকিয়া উঠিল, বিবর্ণ হইয়া গেল সে! মনে ছিল না তার। এ কালের যমের পরিচয় সঠিক মনে থাকে না তার। নহিলে, বন্দুক-পিস্তল অ-দেখা নয় সে। বাবুদের পাখী মারা দেখিয়াছে বুলেটে—পাগলা কুকুর-

মারা দেখিয়াছে। দারোগার কোমরে পিস্তল দেখিয়াছে। শুনিয়াছে পিস্তলের গুলী বুকে ঢুকিলে পিট ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া যায়।

কিন্তু হেঁসো ফেলিতেও তাহার অন্তরাত্মা তীব্র আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। ক্রুদ্ধ-যন্ত্রণাকাতর পশুর আর্তনাদের মত সে আর্তনাদ। সে যদি শিকে ঘেরা এই দাওয়ার খাঁচার মধ্যে না ঢুকিত তবে সে হয় তো ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিত। কিন্তু সে নিজেই বন্ধ করিয়াছে। শিকের ফাঁক দিয়া পিস্তলের গুলী মুহূর্তে তাহার বুকে আসিয়া বিঁধিবে। লড়াই করিয়া মরিতে সে ভয় পায় না, কিন্তু অসহায়ের মত মরিতে তাহার সাধ নাই—অসহায় অবস্থার মধ্যে মৃত্যুভয় আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেছে পাহাড়িয়া চিতির মত।

বাবু বলিলেন—দুই।

পাম্নু আবার বর্বর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেঁসোখানা ফেলিয়া দিল।

বাবু পিস্তল হাতে অগ্রসর হইলেন; চাপরাশীদের বলিলেন—পাকড়ো হারামজাদ কো!

পালোয়ান দুইজন ভিতরে ঢুকিয়া পাম্নুকে ধরিল। টানিয়া বাহিরে আনিয়া ঘাড়ে রদ্দা এবং ধাক্কা মারিয়া মাটির উপর ফেলিয়া দিল। পাম্নুর কপালটা কাটিয়া গেল। কপালের রক্ত ফিনকি দিয়া পাথুরে শড়কটার বুকে পড়িল, পাম্নু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই রক্তসিক্ত মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ তার পিঠের উপর একটা আগুনের দড়ি কে যেন চকিতে টানিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে তাহার সবল দেহখানা জৈবিক রীতি অনুযায়ী চমকিয়া উঠিল মাত্র। মুখ তুলিয়া সে চাহিয়া দেখিল না, কি ঘটিল। লাল রক্ত লালচে কাঁকর মাটির সঙ্গে মিশিতেছে, রক্তবিন্দুগুলি পড়িবামাত্র বিন্দুর পরিধির পাশে ধূলা ফুটিয়া উঠিতেছে—চারিপাশ হইতে ঢাকিয়া দিতে চাহিতেছে; মাটিও তাহার রক্ত পিষিতেছে, শুষিতেছে!

হঠাৎ কাহার কণ্ঠস্বর তাহাকে চকিতচঞ্চল করিয়া তুলিল।

—নমো নারায়ণায়।

পানু মুখ তুলিয়া না দেখিয়া আর পারিল না।

বাবু দ্বিতীয় আঘাতের জন্য চাবুকটা তুলিয়াছিলেন। হিসাব করিয়া ধীরে সুস্থে তিনি পানুর প্রাপ্য মিটাইতেছিলেন। প্রথম চাবুকটা বাছুরটা দিতে অস্বীকার করার জন্য। দ্বিতীয়টা তুলিয়াছিলেন অনন্তকে গালিগালাজের জন্য, আরও দুই ঘা দিবার স্থির করিয়াছেন—লাঠি ধরিয়া রুখিয়া দাঁড়ানোর জন্য, তাহার পর তিন চাবুক কষিবেন হেঁসো তোলার জন্য, অবশেষে পালোয়ান দুই জন তাহার দুই কানে ধরিয়া—এই গ্রামখানা ঘুরাইয়া আনিবে। ওই—'নমো নারায়ণায়' শুনিয়া তিনি চাবুকটা হানিতেই হানিতেই ঘাড় ঘুরাইয়া চাহিলেন। তাহার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না, বক্তা এক প্রৌঢ় সন্ন্যাসী নিজেই আসিয়া ততক্ষণে বাবু এবং পানুর মাঝখানে দাঁড়াইলেন। মুহূর্তে দীর্ঘ চাবুকটা সন্ন্যাসীর কপাল হইতে মাথা বেড়িয়া পিঠের উপর সাপের মত শব্দ করিয়া ছোবল মারিয়া বসিল।

সন্ন্যাসীর পিছনে রাজুবালা চীৎকার করিয়া উঠিল। পালোয়ান দুইজন সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। বাবুর হাত হইতে চাবুকটা আপনি খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। পানু স্তম্ভিত দৃষ্টিতে মুখ বিস্ফারিত করিয়া সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিল। কপালের চামড়া ফাটিয়া দড়ির মত ফুলিয়া উঠিতেছে, ফুলিয়া ওঠা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, মধ্যে মধ্যে অতি ক্ষুদ্র রক্তাক্ত বিন্দু ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

সন্ন্যাসী চাবুকগাছা তুলিয়া বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—বাড়ী যান বাবা!

বাবু চাবুক হাতে লইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—গোসাই, তুমি সরে যাও এখান থেকে।

—তা কি পারি? আমি যোড় হাত করছি।

—তুমি এখানে এলে কেন?

—মেয়েটি কেঁদে গিয়ে পড়ল। না এসে কি পারি?

—তুমি সরে যাও।

—না। আপনি বাড়ী যান। এত রাগ করতে নাই।

—গোঁসাই! বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসী এবার বিচিত্র দৃষ্টিতে বাবুর দিকে চাহিলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—বাড়ী যান, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আপনি বাড়ী যান।

পালোয়ান তিনজন মিনতি করিয়া বলিয়া উঠিল—হুজুর! অর্থাৎ যাহা ঘটিয়া গেল—তাহার পর তাহারাও চাহিতেছে আর না, বাড়ী চলুন। বাবু থতমত খাইয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—রাগ যদি না মিটে থাকে—আমাকে মারুন, আমি ওকে মারতে দেব না।

পালোয়ানেরা বলিল—হুজুর!

বাবু নিঃশব্দে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

চব্বিশ

প্রৌঢ় সন্ন্যাসীটি এ অঞ্চলের পরিচিত মানুষ। যে রুক্ষ মরুভূমির মত লাল কাঁকরের উঁচু টিলার মত প্রান্তরটায় প্রাণহীন মরুস্থান রচনা করিয়াছে—সেই প্রান্তরটা দক্ষিণ দিকে ঢালু হইয়া যে সমতলে মিশিয়াছে সেই সমতলের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে বক্রেশ্বর নদী। নদী পার হইয়া ওপারে আরও ক্রোশখানেক দক্ষিণে—একটি বনজঙ্গলে ঘেরা প্রাচীন কালের কালী-মন্দির আছে। সন্ন্যাসী সেইখানে থাকেন।

বনজঙ্গলে ঘেরা মনুষ্যবসতিহীন আশ্রমটি। দিনের বেলাতেও অন্ধকার।

বহুকাল হইতে ওই স্থানটি শ্মশানেশ্বরী আশ্রম নামে এ অঞ্চলে বিখ্যাত। জঙ্গলের মধ্যে আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য নালা চলিয়া গিয়াছে সেগুলি এই নদীটিরই শাখা। কাদাজাম ও বন-শিরীষের ঘন জঙ্গলের নীচে প্রচুর কেয়ার ঝাড় ও নানারকমের লতা ও গুল্ম। লোকে বলে প্রাচীনকালে এখানে কোতল ঘোষার বিখ্যাত তান্ত্রিকেরা শবসাধনা করিতেন। কতজনে এখানে সিদ্ধি-লাভও করিয়াছেন। ক্রমে দেশ নাকি ধর্ম্মহীন হইল, ম্লেচ্ছাচারের প্রভাবে তান্ত্রিক বংশের মতিগতি অন্য দিকে ফিরিল, শ্মশানেশ্বরীর আশ্রম পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া রহিল। পাপী পুণ্যহীনের এখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল, মানুষেরা আশ্রমের বাহিরে শড়কের উপর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত। শ্মশানেশ্বরী আপন মনে খেলা করিতেন, শেয়াল, শকুন, সাপ তাঁহার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত; নানা ধরনের পাখীরা কলরব করিত; ফুল ফুটিত, ফল ধরিত, বীজ ফাটিত, নূতন চারাগাছ পাতা মেলিত, রাত্রে নাকি মহাকালীর সঙ্গে নাচিত ভূত-প্রেত প্রেতিনীর দল। একবার এক ডাকাতের দল অন্ধকারে ভুল করিয়া এই আশ্রমে ঢুকিয়াছিল। কাছেই একটি গ্রামে তাহাদের ডাকাতি করার কথা, স্থির ছিল রাত্রির প্রথম প্রহরের শেয়াল ডাকিলেই তাহারা আসিয়া গ্রামপ্রান্তের একটা পুরানো বাগানে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিয়া অপেক্ষা করিবে। দ্বিতীয় প্রহরের শিবারবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাহির হইয়া গ্রামে গিয়া পড়িবে। প্রথম প্রহরের শিবারব শুনিয়া ব্যস্ততার মধ্যে ভুল করিয়া এই আশ্রমে ঢুকিয়া পড়িল তাহারা। বাস্ সেই যে ঢুকিল আর সমস্ত রাত্রির মধ্যে বাহির হইতে পারিল না। সকাল বেলা, গ্রামের লোক আশ্রমের বাহির হইতে দেখিল একদল লোক মাটির পুতুল মানুষের মত বসিয়া আছে, হাঁক-ডাকে নড়ে না। শেষে পুলিশ আসিয়া তাহাদের ধরিয়া লইয়া যায়; তাহারা বলিয়াছিল ওখানে ঢুকিয়া কি যে হইয়াছিল তাহাদের কিছু মনে নাই; চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিল না, কানে কোন শব্দ শুনিতে পায় নাই,

বসিবার পর আর নড়িতে চড়িতে পারে নাই, দেহ যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল।

কতকাল পরে ওখানে আসিলেন এক সন্ন্যাসী। তিনি ইনি নন। তাঁহার একটা পা ছিল না, হাঁটু হইতে নীচের অংশটা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসী আগে ছিলেন পল্টনে, গুলীতে পা জখম হওয়ায় পা কাটিয়া-ঠেঙোর উপর ভর করিয়া গেরুয়া পরিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। পথে এই স্থানটি দেখিয়া জয় কালী করালী বলিয়া এখানে ঢুকিয়া বসিয়া পড়িলেন। সাধনার পুণ্য ছিল—মা প্রসন্ন হইলেন, সন্ন্যাসী মায়ের সেবা লইয়া এইখানে থাকিয়া গেলেন। চালা ঘর তুলিয়া মাটীতে গড়িয়া মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন, বনজঙ্গল অনেক পরিমাণে সাফ করিলেন, সাধারণ-মানুষের মায়ের দরবারে প্রবেশ করিবার অনুমতি তিনিই আদায় করিলেন মায়ের কাছে। পা কাটা সন্ন্যাসীকে লোকে বলিত 'ঠেঙো গোঁসাই'। ঠেঙো গোঁসাই দেহ রাখিলে আর একজন সন্ন্যাসী এখানে বসিবার চেষ্টা করিয়াছিল—সে ছিল ভৈরব, সঙ্গে ছিল ভৈরবী এবং আসলে ছিল ভণ্ড তাই মাস-খানেকের মধ্যেই মা তাহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন। তাহার পর আশ্রম আবার বৎসর-দুয়েক পূর্ব্বের মত পড়িয়া ছিল। বৎসর দুয়েক পর আসিয়াছেন এই সন্ন্যাসী।

লোকে বলে নমোনারায়ণ বাবা। তাঁহাকে প্রণাম করিলেই তিনি বলেন —নমো নারায়ণায়।

নমোনারায়ণ বাবা একটু আলাদা ধরণের গোঁসাই—অর্থাৎ সন্ন্যাসী। এখানকার ভক্ত যাঁহারা তাঁহার প্রথম প্রথম সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। এখন বলেন—গোঁসাই আসলে বৈষ্ণব ও এখানে এক বিচিত্র সাধনার জন্ম আসিয়াছেন। বীরাচার মতে জাগ্রত দিগম্বরী শ্যামাকে বৈষ্ণবী মন্ত্রে প্রসন্ন করিয়া অসি-খর্পর-ধারিণীকে মুরলীধররূপে দেখিতে চাহেন তিনি। তাঁহারা ঘাড় দোলাইয়া বলেন—ব-ড় কঠিন রে বাবা।

গোঁসাইয়ের আরও কতকগুলো বাতিক আছে। এ অঞ্চলের লোকজন লইয়া কারবার করেন বেশী। শ্মশানেশ্বরী তলায় হরিনাম সংকীর্ত্তনের চব্বিশ প্রহর উৎসব, অন্ন মহোৎসব, কালিকীর্ত্তন, দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজার্চ্চনা একটা-না-একটা লইয়া লাগিয়াই আছেন। প্রতি বৈশাখে পঞ্চতপাও করিয়া থাকেন। চারিদিকে পাঁচটি হোমকুণ্ড জ্বালিয়া নিজে মধ্যস্থলে বসিয়া পাঁচটি হোমযজ্ঞ করেন, চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত। আরও বাতিক আছে—এ অঞ্চলে পুরানো দেবস্থানের যেগুলি জীর্ণ হইয়াছে—ভিক্ষা করিয়া সেগুলিকে মেরামত করাইয়া থাকেন। সম্প্রতি এক কাজে লাগিয়াছেন, পাগুর বাড়ীর দক্ষিণে এবং তাঁহার আশ্রমের উত্তরে যে নদীটা আছে ওই নদীর দুই পাশে বন্যারোধের জন্য বাঁধ তৈয়ারী করিবেন। নদীটার মোহনা এখান হইতে ক্রোশ-দশেক দূরে, মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি অঞ্চলে ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে মিশিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়িয়াছে। মোহনাটায় এখন এমন বালি জমিয়াছে যে নদীর জল পূর্ণবেগে নিকাশ হইতে পারে না, ফলে উপরে বন্যার প্রকোপে বাড়িয়াছে। এ দিকে এ সব অঞ্চলে পূর্ব্বকালে যে সব বন্যারোধী বাঁধ ছিল—তাহার অস্তিত্ব নাই, শুধু চিহ্ন আছে মাত্র। পর পর কয়েকবৎসরই বন্যায় এ অঞ্চলের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সরকার হইতে কোন প্রতিবিধান হয় নাই। নমো নারায়ণ গোঁসাই স্বপ্ন দেখিলেন—বন্যা আসিয়া আশ্রম ডুবাইয়া দিয়াছে, মা কালী বন্যার জলে একটা ভেলা ভাসাইয়া তাহাতে চড়িবার উদ্যোগ করিতেছেন। পরের দিন হইতেই তিনি বাঁধের জন্য লাগিলেন। সেই বাঁধের কাজেই তিনি এ গ্রামে আসিয়াছিলেন।

এর আগে আগেও কয়েকবার আসিয়াছেন, গ্রামের লোকেদের গ্রামদেবতা বুড়ি-কালীর প্রাঙ্গণে ডাকিয়া আলোচনাও করিয়া গিয়াছেন। এ গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকটায় পাগুর বসতের টিলা—ওদিকে বন্যা আসে না। কোন কালেও আসিবে না। নদীগর্ভ এবং সমতল ভূমি হইতে প্রায় চল্লিশ-

পঞ্চাশ ফুট কি তারও বেশী উঁচু, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকটা বন্যায় ভাসে এবং সমউল পূর্ব্বমাঠটার মাঝখান দিয়া যে নালাটি গিয়া এইখানেই নদীতে পড়িয়াছে—সেই নালা বাহিয়া বন্যার জল মাঠে ঢুকিয়া গোটা মাঠটার ফসল পচাইয়া দেয়। পূর্ব্বমাঠে এ গ্রামের জমি কম কিন্তু তাহাতে কি? নমো নারায়ণ বাবা ধরিয়াছেন—বন্যায় ক্ষতি হোক বা না হোক নদী হইতে দেড় ক্রোশের মধ্যে যত গ্রাম পড়িবে সকল গ্রামকেই এ বাঁধের কাজে হাত লাগাইতে হইবে। শুধু তাই নয়—দশ হাজার লোকের কোদাল ও ঝুড়ি চার দিন না পড়িলে বাঁধ হইবে না। এ নাকি দেবতার প্রত্যাদেশ! যাহারা খাটিবে তাহারা মজুরী লইলে বাঁধ টিকিবে না, সে বাঁধ ভাঙিয়া যাইবে এবং ওই চার দিন নদীর কূলে রান্না করিয়া সমস্ত লোককে পাতা পাড়িয়া খাইতে হইবে। সে না হইলে নদী শুকাইবে অর্থাৎ অনাবৃষ্টি হইবে। সেই কারণে গ্রামে গ্রামে যেমন ফিরিতেছিলেন, এ গ্রামেও তেমনি ফিরিতেছেন। সক্ষম চাষী হইতে হাড়ি, বাউড়ি, ডোম সকলেই কোদাল ধরিবে, যে সব জাতির মেয়েরা মজুর খাটে তাহারা ঝুড়ি বহিবে এবং সদজাতিরা—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতিরা চাল দিবেন—ক্ষেতের তরকারী দিবেন, সামর্থ্য যাহাদের আছে তাঁহারা নগদ টাকাও কিছু দিবেন,—এই ব্যবস্থা হইয়াছে। এ গ্রামের মজলিশে পানুকেও ডাকা হইয়াছিল কিন্তু পানু যায় নাই। সে বলিয়াছিল, বান তো আমার কি? হাম নেহি যায়েগা!

বলিয়া সে একটা ছড়া কাটিয়া দিয়াছিল—

কাদপুর ডুবু-ডুবু দোনাইপুর ভাসে,
(এ) গাঁয়ের লোকের বুক ঢিপ-ঢিপ পরানকিষণ হাসে।

আমি তো বাবা, ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে বান দেখি আর নাচি। আমি কেনে যাব। বলগা তোদের নমোনারায়ণ না ফমো ফারান কে! সন্ন্যাসী! গোঁসাই!

বানেই বা পানুর কি? আগুনেই বা কি? বানে গাঁয়ের লোকের জমি ডোবে—পানুর ডাঙ্গা জমি ডোবে না, গাঁয়ে লোকের খড়ের ঘরে আগুন

লাগে—গ্রামের সঙ্গে সংস্রবহীন—গ্রামপ্রান্তে টিনের ঘর পানুর, পানুর ঘরে আগুন লাগে না। রাত্রে যখন লোকে জল জল করিয়া চেঁচায় পানু তখন শুইয়া হাসে। সেই পানু যাইবে সন্ন্যাসীঠাকুর স্বপন দেখিয়াছে বলিয়া বাঁধে মাটি কাটিতে।—"আহো! সাধুবাবা! ঠাকুর মহারাজ! গোস্বামী ঠাকুর! আ-হো!"

কথাগুলা বলিয়া পানু সেদিন খানিকটা নাচিয়া লইয়াছিল।—আ-হো! নমো-নারাণ বেটা—শঙ্কর গোঁসাই হইতে চায়, কলেশ্বরের সাধুবাবা হইতে চায়। আ-হো!…ভণ্ড কোথাকার!

শঙ্কর গোঁসাই একজন গোঁসাই ছিল বটে। একশো বছরের উপর বাঁচিয়াছিলেন। ছাই মাখিয়া চিমটা হাতে একদিন আসিয়া উত্তর বীরভূমে ময়ূরাক্ষীর ধারে চিমটাটা মাটিতে পুঁতিয়া বসিলেন। ময়ূরাক্ষী সেখানে বিপুল বিস্তার। ময়ূরাক্ষী গঙ্গার চেয়ে অনেক ছোট নদী কিন্তু এইখানটায় এপার হইতে ওপার পর্যন্ত গঙ্গার বিস্তৃতির প্রায় দ্বিগুণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। গর্ভটা বালুতে পুরিয়া তটভূমির সমান হইয়া উঠিয়াছে। ময়ূরাক্ষী নূতন পথ করিয়া ছুটিবে, পুরানো খাতটায় কানা পড়িবে।

শঙ্কর বাবা সেইখানে চিমটা পুঁতিয়া বসিয়া গাঁয়ের লোককে বলিলেন—একঠো চালা বনা দেও। চালা বনিল। বাবা ধুনি জ্বালিলেন। দেশ ভাঙিয়া লোক আসিয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িল। অপুত্রক পুত্র পাইল, অন্ধে চোখ ফিরিয়া পাইল, বধির শ্রবণ-শক্তি পাইল, অম্লশূলের রোগী—বাবার দরবারে তেলেভাজার সঙ্গে খিচুড়ী খাইয়া হজম করিয়া বাড়ী ফিরিল। কত লোকের হারানো সন্তান দেশে ফিরিল, কত কি হইল। বাবা ময়ূরাক্ষীকে বাঁধিয়াছিলেন। লোকে বলে—'বাঁধিয়াছিলেন,' কিন্তু আসল কথাটা তা নয়; জ্ঞানীগুণীতে বলে—বাঁধ-বাঁধানো লোক দেখানো ব্যাপার; নিজের মহিমা ঢাকিবার জন্য। আসলে তিনি ময়ূরাক্ষীকে হুকুম করিয়াছিলেন—হট্ যাও। ময়ূরাক্ষী হটিয়াছিল।

কলেশ্বরের সাধুবাবা অনাদিলিঙ্গ মহাদেবের নবরত্নের পুরানো মন্দির ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। কলেশ্বরে ওই শঙ্কর বাবার মত একদা আসিয়া তিনি চিমটা গাড়িয়া বসিলেন এক গাছতলায়। দেশে দেশে খবর রটিল। কত রাজা-মহারাজা, জমিদার, তালুক-দার, গৃহস্থ, আমির, ফকীর সব আসিয়া জুটিয়া গেল কয়েক মাসের মধ্যে। টাকা আসিল রাশি রাশি—ইঁট পুড়িল—চুন পুড়িল—বিলাতী মাটি আসিল। মন্দির তৈয়ারী হইল।

এই দুইজন সাধুর গল্প পান্নু জানে। এই দুইজনকে সে মনে মনে মানিতে রাজীও আছে। কিন্তু সে কাল নাই। সুতরাং সাধু কোথা হইতে আসিবে এ কালে? ভণ্ডামী ফন্দী ছাড়া এ লোকটার আর কিছু নাই। এ কালেই নাই তো ও পাইবে কোথায়?

আজ কিন্তু সে তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে আসিয়া বাবুর চাবুকের সামনে দাঁড়াইল, চাবুকের দাগটা ফুটিয়া ফাটিয়া একটা লাল রঙের দড়ির মত কপালে টক টক করিতেছে।

নমো নারাণ বাবা পান্নুর হাত ধরিয়া বলিলেন—ওঠ।

পান্নুর কপালের ক্ষতটা দিয়া তখনও রক্ত ঝরিতেছিল। গোঁসাই রাজুবালাকে বলিলেন—জল আন মা, ভাল করে ধুয়ে দাও। খানিকটা চুণে আর খয়েরে মিশিয়ে ওখানটায় লাগিয়ে দাও; খুব কামড়ে লেগে যাবে। একেবারে ঘা শুকালে আপনি ছেড়ে পড়ে যাবে।

রাজুবালা কাতরকণ্ঠে বলিল—বাবা আপনার—

সন্ন্যাসী আপনার চাদরখানায় কপাল চাপিয়া পাগড়ী বাঁধিয়া বলিলেন—ও কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা।

বলিয়া, যে পথে বাবুর গাড়ীটা চলিয়া গিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া হাঁটিতে সুরু করিলেন।

পান্নু কিছুক্ষণ সন্ন্যাসীর গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর

দুম-দুম করিয়া বাড়ী ঢুকিয়া সেজবউটাকে সামনে পাইয়া প্রশ্ন করিল—কোথা গেল? সে হারামজাদী কোথা গেল?

সেজ বউটা বোকা, কিন্তু সে-হারামজাদী কথাটা বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল না; বাড়ীতে মাত্র দুই হারামজাদী আছে, একজন সে নিজে—অপর জন রাজু। সে-হারামজাদী বলিতেই সে বুঝিল পানু রাজুকে খুঁজিতেছে। কিন্তু তাহার উপর এমন রাগটা কেন? রাগ হওয়ার তো কথা নয়। সেজ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রাজু নিজেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল; ঘরের মধ্যে সে চূণ ও খয়ের গুড়ায় মিশাইয়া পানুর জন্যই ঔষধ তৈয়ারী করিতেছিল; বাহির হইয়া আসিয়া সে বলিল—কি?

—কি? পানু দাঁতে দাঁতে কিস কিস করিয়া উঠিল!—কি?

—হ্যাঁ। কি?

—ওই গেরুয়া ঠাকুরকে কেনে ডাকলি তু?

রাজু অবাক হইয়া গেল। দোষ হইয়াছে তাহা বুঝিল না।

—বল? কেনে ডাকলি? সে আসিয়া একবারে ঘাড়ে ধরিল।

রাজুর এসব অভ্যাস আছে, নীরবে মাথা পাতিয়াই সহ্য করে, গ্রীষ্মকালের রৌদ্রের মত, বর্ষার সময়ের বৃষ্টির মত, কোন প্রতিবাদ করে না; আজ কিন্তু তার চোখের কোণে একটা প্রতিবাদ ঝিলিক হানিয়া গেল।

পানু বলিল—আঁ! আবার তাকানি দেখ!. ঘাড়টা সে টিপিয়া ধরিল।

রাজু বলিল—ছাড়। কণ্ঠস্বরেও তার প্রতিবাদ ফুটিয়া উঠিল।—ছাড় বলছি।

—কেনে ডাকলি তু?

—না। ডাকি নাই আমি।

—তবে উ এল কেনে? কেনে এল উ গেরুয়া ঠাকুর?

—সে কথা তাকে শুধিয়ো। আমি জানিনা।

—হাঁ-হাঁ। শুধাব আমি। ওই গেরুয়া ঠাকুর বেটাকে শুধাব আমি।

—শুধিয়ো। আমি তাকে ডাকি নাই। কোন্ মুখে, কোন্ লজ্জায় তাকে ডাকব আমি? তুমি তাকে গাল দাও, তিনি ডাকলে দুনিয়ার লোক যায়, তুমি যাও না, তাকে আমি ডাকব কি বলে? কাউকেই ডাকবার পথ তুমি রাখ নাই, গাঁয়ের লোকের নামেও তুমি ঝাঁটা মার, তবু তাদের কাছেই ছুটে গেলাম। ঠাকুর তখন মজলিস করছিলেন। আমি গাঁয়ের লোকের সামনে গিয়ে বললাম—আপনারা কেউ আসুন। লোকটা বোধ হয় খুন হয়ে যাবে। বাবুর নাম শুনে কেউ নড়ল না, একটা কথা বললে না। আমি চলে আসছি—পিছন থেকে ঠাকুর বললেন—দাঁড়াও। গাঁয়ের লোককে বললেন—কেউ যেন একটী প্রাণী এস না। তাতে হিতে বিপরীত হবে। আমার সঙ্গে চলে এলেন।

—হুঁ। হুঁ। চলে এল। চলে এল।

—কিন্তু তোমার ক্ষতিটা কি হল?

—জানি না। শালা গেরুয়া ঠাকুর, ভণ্ড বদমাস, সাধুবাবা—গুরুঠাকুর—জমিদার! পানু বর্ব্বর আক্রোশে জানোয়ারের মত দাঁত কট কট করিয়া উঠিল।

রাজু বলিল, বস, কপালে এইটা লাগিয়ে দি।

—না। বলিয়া আবার সে হন হন করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সেজ বউ বলিল—মতিচ্ছন্ন! মরণ!

রাজু তিক্ত চিত্তে ঠোঁট টানিয়া আক্রোশভরে পানুর ঘর দুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিল। এ সংসারে তাহার কোন মমতা নাই। কিসের আকর্ষণ? সেজ বউ পড়িয়া আছে, ছেলের মা, উহার না থাকিলে উপায় নাই!

ওই বর্ব্বর লোকটা একদিন তাহাকে রোগজীর্ণ অবস্থায় আশ্রয় দিয়াছিল—বাঁচাইয়াছিল—বলিয়া কৃতজ্ঞতায় আর কত সহ্য করিবে সে!

হঠাৎ পানুর বড় ছেলেটা আসিয়া চুপি চুপি বলিল—মা!

রাজু কান দিল না, সেজ কৌতূহল-ভরে প্রশ্ন করিল—কি? ছেলেটা

কথা বলিবার ভঙ্গির মধ্যে যেন কৌতুককর—কৌতূহলজনক সংবাদের সন্ধান পাইয়াছে সে।

ছেলেটা বলিল—বাবা কাঁদছে!

—কাঁদছে? সেজ পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া গালে হাত দিয়া ফিরিয়া আসিল।—দিদি! বাছুরটার গলা ধরে কাঁদছে। বাছুরটা পা চাটছে।

সন্ধ্যার সময় পানু বলিল—চলা যায়ে গা ছিঁয়াসে।

রাজু বা সেজ কেহই কোন কথা বলিল না। পানু আবার বলিল—সব বেচে দেব! থাকব না, এ হারামজাদার দেশেই থাকব না।

এ কথাতেও কেহ কোন কথা বলিল না। পানু বাহির হইয়া গেল। রাত্রি দুপ্রহর পর্য্যন্ত ফিরিল না। ঘরেই ফিরিল না কিন্তু রাজু, সেজ বউ দুজনেই দেখিল পানু সামনের ডাঙ্গাটার উপর অন্ধকারের মধ্যে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পরদিন সকালে উঠিয়াই সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। কোথায় গেল বলিয়া গেল না। বেলা তিন প্রহর পর্য্যন্ত ফিরিল না।

তৃতীয় প্রহরে 'নমোনারাণ বাবা' আসিয়া তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাজু অপরাধিনীর মত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—বাবা!

সন্ন্যাসী বলিলেন—বাবুরা আর কিছু বলবেন না মা। আমাকে বলেছেন। আমি সব শুনেছি! তারপর হাসিয়া বলিলেন—বাছুরটাও আর নেবেন না। জুতো মেরেছেন সেদিন, চাবুক মেরেছেন কাল; তার বদলে ওটা দিয়েই দিয়েছেন। বাবুর দয়া খুব মা। গরু মেরে জুতে দান করে লোকে; উনি—। হাসলেন বাবাঠাকুর।

রাজু কথাগুলি বোধ হয় শুনিলই না, সে বলিয়া গেল নিজের মনের কথা। বলিল—বাবা আমি ভুল করেছিলাম। আমি কেনে যে মরতে ছুটে গেলাম! ওর সাজা হওয়াই উচিত ছিল। সেই হ'লেই ত শিখত।

সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিলেন না। চলিয়া গেলেন। গ্রামে আজ আবার মজলিস বসিবে।

পানু ফিরিল প্রায় চারিটার সময়। স্নান করিয়া রাক্ষসের মত খাইয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। যেন মুহূর্তে ঘুমাইয়া গেল, নাক ডাকিতে সুরু করিল কয়েক মিনিটের মধ্যে। সে যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

রাজু বুঝিল—পানু সম্পত্তির খরিদ্দার ঠিক করিয়া আসিয়াছে অথবা—বাস করিবার নূতন কোন স্থান আবিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়াছে। সে একটু হাসিল। বিচিত্র মানুষ। গল্পে আছে চোরের উপদ্রবে রাগ করিয়া এক গৃহস্থ থালা কাঁসা বিক্রী করিয়া মাটিতে ভাত খাইত।

ওদিকে গ্রামে জয়ধ্বনি উঠিতেছে। জয় মা শ্মশানেশ্বরীর। জয় কালী! হরি হরি বল ভাই! হরি বোল।

সম্ভবত বাঁধে খাটিবার কথা পাকা হইয়া গেল।

পানু অঘোরে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সর্বনাশী অর্থাৎ ওই বাছুরটা মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে। পানুকে জাগাইতে চায় সে। বার-কয়েক আসিয়া তার গা চাটিল, বার দুয়েক ফোঁস ফোঁস করিল, কিন্তু পানু পরম নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে।

সেজ বউ সন্ধ্যা জ্বালিয়া পানুর দিকে চাহিয়া বলিল—কাল ঘুম।

পঁচিশ

পরদিন সকালে উঠিয়া পানু গভীর প্রসন্নতার সহিত চা খাইতে বসিল। সকালে সে এক জামবাটি চা খায়। হঠাৎ পিঠে চাবুকের কাটা ক্ষতে জ্বালা অনুভব করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া সে দেখিল—বাছুরটা তাহার পিঠ চাটিতেছে। সে যেন ক্ষেপিয়া গেল। প্রচণ্ড একট চড় উঠাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কি মনে হইল, চড়টা সম্বরণ করিয়া

আলগাভাবে পায়ের ঠেলা দিয়া বাছুরটাকে বাহিয়ে ফেলিয়া দিল। বাখারি দিয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা খোঁড়া পা-খানা তাহার এখনও অপটু, বাছুরটা ঠেলা খাইয়া মাটির উপর কাত হইয়া পড়িয়া গেল। ব্যা—ব্যা শব্দে চীৎকার করিতে শুরু করিল। পানু বিরক্ত হইয়া চায়ের বাটিটা লইয়া রাস্তার ওপাশে তাহার ছোট বাগানটার একটা গাছতলায় গিয়া বসিল।

রাজু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাছুরটা এমনভাবে চীৎকার করে কেন? সে ছুটিয়া আসিয়া বাছুরটাকে তুলিয়া তামাসা করিয়াই বলিল —আহা তোমার সর্ব্বনাশী এলোকেশী যে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। তুমি বসে আছ?

পানু বলিল, ওটাকে বেচে দোব।

—বেচে দেবে?

—হাঁ। কসাই ডেকে বেচব।

রাজুবালা শিহরিয়া উঠিল। সে স্থির-দৃষ্টিতে পানুর দিকে চাহিল। পানুর চোখে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা খেলা করিতেছে। পানু রাজুর দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—গুণ-ফোড়া ছুঁচ দিয়ে তোর ড্যাবড্যাবে চোখ ফুটো আমি কানা করে দোব রাজু!

রাজু বলিল, তোমার সঙ্গে আমার ফারখত! আজই আমি তোমার বাড়ী থেকে চলে যাব।

পানু ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—আমার বল্লম দিয়ে তোকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবো আমি!

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হন হন করিয়া আসিয়া শুইবার ঘরে মাচায় উঠিয়া সে বল্লমটা কাড়িয়া লইল। হাত-পাঁচেক লম্বা পাকা বাঁশের লাঠির মাথায় ইঞ্চি দুয়েক মোটা—ইঞ্চি আষ্টেক লম্বা লোহার সু'চাল ফলাগাঁথা বল্লম। দূর হইতে সাপ মারিবার জন্য এটা সে বরাদ দিয়া তৈয়ারী করিয়াছে। কামার হাসিয়া বলিয়াছিল—চালাতে পারবি ত? তৈরী ত করালে!

পান্নু সঙ্গে সঙ্গে চালাইয়া দেখাইয়া দিয়াছিল। হাত দশেক দূরের একটা তালগাছে ছুড়িয়া মারিয়াছিল। শালের চেয়েও কঠিন পাকা তালের কাণ্ড। নির্ভুল লক্ষ্যভেদে ঠিক মাঝখানে বল্লমটা গিয়া বিঁধিয়াছিল। প্রায় তিন ইঞ্চির মত লোহার ফলাটা বসিয়া গিয়াছিল। হা'-ঘরে জীবনের এই অস্ত্রচালনার অভ্যাসটা সে ভুলিয়া যায় নাই! যন্ত্রটা তৈয়ারী করাইয়া নূতন নূতন কয়েকদিন ব্যবহার করিয়া অভ্যাস ঝালাইয়াও লইয়াছিল। তাহার পর দীর্ঘদিন মাচার উপর তোলাই ছিল। তাহার হেঁসো অস্ত্রখানাই এই জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। রাজুকে সাজা দিতেও ওই হেঁসোখানাই যথেষ্টের চেয়েও বেশী। সেখানা এমনি ধারালো যে, খেজুর গাছের শক্ত কাণ্ডেও কোপ মারিলে হেঁসোটার আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া ফলাটা গোটাই বসিয়া যায়। রাজুর গলাখানা খেজুর গাছের কাণ্ডের চেয়ে অনেক কোমল। তবু সে আজ ওই বল্লমটাই পাড়িয়া লইল, ধূলা ও ঝুল ঝাড়িয়া মরচে-ধরা ফলাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া একটা ঝামা ইটের টুকরা লইয়া ঘসিয়া উজ্জ্বল করিতে বসিল।

রাজু হাসিল। বলিল, সেই ভাল! আমিও যাই—তুমিও চল। আমাকে বিঁধে মেরে, তুমি ফাঁসীকাঠে ঝুলো।

পান্নু চমকিয়া উঠিল। মনে পড়িল নাকুদত্তের ছিন্ন কণ্ঠ, মনে পড়িল—

সে বল্লমটা হাতে লইয়া উঠিয়া গেল। নির্জ্জনে তাহার বাগানের মধ্যে পুকুরঘাটে গিয়া সেটাকে ঘষিতে লাগিল।

রাজুবালা ঘরের দাওয়ায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বড় বড় চোখ দুইটা মধ্যে মধ্যে ঝকমক করিয়া উঠিতেছিল। যেন ওখানে পান্নুর ঘষিয়া ঘষিয়া উজ্জ্বল করিয়া তোলা বল্লমটার ছটা এখানে তাহার চোখে পড়িয়া প্রতিচ্ছটা তুলিতেছিল। সেজ বউ দুইজনের রকমসকম দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে। ভয় পাইয়াছে বেশী। পান্নু যদি রাজুকে খুনই করে তবে সে ফাঁসী যাইবে। তাহাতে ঘরসংসার জমিজমা তাহারই ষোল আনা

অধিকারে আসিবে বটে কিন্তু এসব বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ—দুনিয়ার মানুষ এগুলি ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া যে যেমন পারিবে, লইবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িবে, সে ধাক্কা সে সামলাইতে পারিবে না। আর রাজু যদি কোনক্রমে খুন না হইয়া বাঁচিয়া পলাইয়া যায়, তাহাতে সতীন-কাঁটা ঘুচিবে বটে কিন্তু তাহাকে একা পান্নুর প্রহার সহ্য করিতে হইবে। তাহাতে তাহার প্রথমটার চেয়ে বেশী আতঙ্ক।

সে সভয়ে রাজুকে ডাকিল—দিদি!

রাজু অকস্মাৎ নিজেকে একটা ঝাঁকি দিয়াই যেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ওকে শেষ পর্য্যন্ত আমি বিষ দিয়ে মেরে দোব সেজ। বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। সেজ চমকিয়া উঠিল—রাজু কি বিষ আনিতে চলিল নাকি? সে তারস্বরে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল—বলি—চললে কোথা?

—চুলোয়! বলিয়া সে হন হন করিয়া চলিয়া গেল। বাছুরটাকে সে লুকাইয়া রাখিতে গেল। না হইলে কখন বর্ব্বর মানুষটা এই সস্থাবিস্কৃত বল্লমটাই বিঁধিয়া ওটাকে মারিয়া ফেলিবে। সেজকেও সে কথা বলা ঠিক নয়। কখন যে বলিয়া ফেলিবে তাহার ঠিক নাই। সেজ বউটা দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে আপন মনেই বলিল—কি বিপদে আমি পড়লাম! হে ভগবান! শাখের করাতে পড়লাম আমি—আসতে কাটছে—যেতে কাটছে! হে ভগবান! বলিতে বলিতে সে চুপ করিয়া গেল।

পান্নু ঘরে আসিতেছে। খিড়কীর পথে তাহাকে দেখা যাইতেছে। তাহার বল্লমটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ঝকমক করিতেছে বৈশাখের প্রখর রৌদ্রচ্ছটায়। ঘরে ঢুকিয়া সে বলিল—তেল দেখি, সরষের নারকেলের কোরোসিনের।

সরিষার তৈল সে বাঁশের ডাণ্ডাটায় মাখাইল, নারিকেল ও কেরোসিন মিশাইয়া মাখাইল ফলাটায়। তাহার পর একটা ন্যাকড়া দিয়া ফলাটাকে জড়াইয়া—পরম যত্নে ঘরের কোণে রাখিয়া দিল। তারপর বলিল—আর খানিকটা তেল দে, চান করে আসি। ভাত বাড়। খিদে পেয়েছে।

ঠিক এই সময় রাজু ফিরিয়া ঘরে ঢুকিল, এবং আবার মেঝের উপর শুইয়া পড়িল।

—শুলি যে?

রাজু উত্তর দিল না। সেজ বউ তেলের বাটি নামাইয়া দিল।

খাওয়া শেষ করিয়া পানু বলিল—ডাক সে হারামজাদীকে।

সেজ বলিল—তুমি ডাক, আমি পারব না। আমাকে রা কাড়বে না।

পানু বলিল—কাড়বে কেন? জীবজন্তু সবাই হতচ্ছেদ্দা বোঝে যে। তারপর সে ডাক দিল—আয়—আয়—আয়!

সেজ আপনমনেই সবিস্ময়ে বলিল—অ—মা—গো—!

পানু বাছুরটাকে ডাকিতেছে। রাজুকে নয়।

সংসারে আর এক হারামজাদী জুটিল—দুই হারামজাদীর সঙ্গে!

বাছুরটাকে রাজু এক প্রতিবেশীর বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছে। সাড়া না পাইয়া পানু সবিস্ময়ে বলিল—গেল কোথা? এলোকেশী! এলোকেশী—! আয়—আয়। আঃ—আঃ!

এঁটো হাতে, ভাত-ডাল মাখা থালাখানা লইয়া সে বাহির হইয়া গেল। বৈশাখের রৌদ্রে লাল কাঁকরের সব চেয়ে উঁচু টিলায় দাঁড়াইয়া সে চারিদিকে দৃষ্টি হানিয়া ডাকিতে লাগিল—আঃ—আঃ—আঃ! এলোকেশী! এলোকেশী—! আঃ—!

বড় ছেলেটা পানুর পিছনে পিছনে থাকে—বাঘের পিছনে ফেউয়ের মত। কিছু তফাৎ আছে, ফেউয়ের মত ডাকিয়া ব্যাঘ্রসদৃশ পানুকে বিরক্ত করে না; তাহার পরিবর্তে ছুটিয়া আসিয়া দুই মাকে সংবাদটা দিয়া যায়। ছেলেটা ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল—মা—!

সেজবউ বিরক্তিভরেই বলিল—কি?

তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। ছেলেগুলা আগেই খাইয়াছে, পানুও খাইয়া লইল—সুতরাং অন্তদিন অপেক্ষা সকাল সকাল হইলেও ক্ষুধা তাহার মাথা

চাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু রাজু যে শুইয়াছে সে আর নড়িতেছে না। ডাকিলেও সাড়া দেয় না। জীবনটা তাহার জ্বলিয়া গেল। ইহার উপর কাহারও ঢং আর সে সহ্য করিতে পারিবে না। ছেলেটাকে মুখনাড়া দিয়া সে বলিল—কি? এমন করে চেল্লাও কেনে?

ছেলেটা সবিস্তারে বাপের কথা বর্ণনা করিয়া বলিল—বাছুরটা কোথা গেল মা?

সেজবউ রাজুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—জানি না।

রাজু পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল—তুই খা সেজ। আমি খাব না।

—খাবে না?

—না। তু খেয়ে নে। এ পাপ অন্ন আমি আর খাব না।

—পাপ অন্ন খাবে না?

—না—না—না। সে হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। উঠিয়া বাহিরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক চাহিয়া দেখিল। টিলা হইতে নামিয়া পানু ওই চলিয়াছে নদীর দিকে। নদীর ধারে সবুজ মাঠের মধ্যে গ্রামের লোকের গরু চরিতেছে। সম্ভবত বাছুরটাকেই খুঁজিতে চলিয়াছে। সে গিয়া গোয়াল ঘরে ঢুকিল। গোয়াল খালি। মঙলী এবং তাহার দুই কন্যা সন্তানসন্ততি লইয়া মহিষের স্বভাবমত বৈশাখ দ্বিপ্রহরে পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। এই গোয়ালের মধ্যেই তাহার গুপ্ত-সঞ্চয় লুকানো আছে। এক কোণে একটা ভাঁড় পুঁতিয়াছে, উপরে একটা ছিদ্র রহিয়াছে, অবসর মত সেই ছিদ্র দিয়া টাকা হইলে ফেলিয়া যায়। সঞ্চয়টা তুলিয়া এই অবসরে সে চলিয়া যাইবে।

জায়গার জন্য সে ভাবে না। আশ্রয়ের জন্যও না; অবলম্বনের জন্যও না। নিজের মূল্য সে জানে; সংসারের এ দিকটা সে দুই তুক বার দেখিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে। তাহার বয়স তিরিশ পার হইলেও বন্ধ্যাত্বের জন্য যৌবন এখনও পরিপূর্ণ। যৌবন এবং রূপকে সে কোনদিন অবহেলা

করে নাই, তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছে মার্জ্জনা করিয়াছে বলিয়া মালিন্য এখনও ছায়া ফেলিতে পারে নাই। সুতরাং চিন্তা করিবার তাহার কিছুই নাই। পানু ফিরিয়া অবশ্য তাহাকে না দেখিয়া বল্লম লইয়া একবার ছুটিবে। তাহার জন্যও সে ভয় করে না। সে গিয়া থানায় উঠিবে—আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য চাহিবে। কিম্বা বাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিবে। কিম্বা সে উঠিবে গিয়া নমোনারায়ণ বাবার আশ্রমে—বলিবে—ঠাকুর কোথাও যাইবার পথ বলিয়া দিতে পার? সে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘদিন অন্ন বস্ত্র এবং চুরি-করিয়া-সঞ্চয়ের-সুযোগের জন্য যেমন নিরাসক্ত ভাবে পানুর সকল বর্ব্বর আদর নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ব্যবসায়িনীর মত পড়িয়া আছে—তেমন ভাবে পড়িয়া থাকাটা আজ তাহার পক্ষে একান্ত ভাবে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন অন্ন বস্ত্র সঞ্চয় আবর্জ্জনা-স্তূপে ফেলিয়া দিয়া আত্ম-হত্যা করিয়াও সুখ আছে—শান্তি আছে।

পানু ফিরিল অপরাহ্নে। প্রায় সারা মুল্লুকটাই সে ঘুরিয়া আসিয়াছে। এইক্ষণ-পহরে বাছুরটার সে দিনের বড় কালো চোখের অসহায় ভয়ার্ত্ত কম্পিত দৃষ্টি—দীর্ঘ চক্ষুপল্লবের প্রান্তে শিশিরবিন্দুর মত টলটলে অশ্রুবিন্দু—যেন প্রান্তরের বুকের রৌদ্র ঝিলমিলির মধ্যে চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সকালবেলা বাছুরটাকে সে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কোথায় যে গেল বাছুরটা—কোথায় কোন খানায় বা ডোবায় বা গড়ানে পাথুরে মাঠে গিয়া পড়িয়াছে, খোঁড়া পা লইয়া অসহায় ভাবে পড়িয়া আছে, উঠিতে পারিতেছে না, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে, চীৎকারের ক্ষমতা নাই, শুধু চোখ দুইটা সে দিনের মত কাঁপিতেছে, চোখের রোঁয়ায় জল-বিন্দু জমিয়াছে—সূর্য্যের ছটায় চিক্ চিক্ করিতেছে। হয় তো সন্ধ্যার আগেই মরিয়া যাইবে। না মরিলে রাত্রে জীবন্তেই শেয়ালে ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিবে।

মানুষের চেয়ে জন্তু জানোয়ার—কুকুর বিড়াল গরু মানুষকে সে চিরদিন

বেশী ভাল বাসিয়াছে। গরু মহিষকে সব চেয়ে বেশী। কিন্তু এই বাছুরটার মত কোনটাকে ভাল বাসে নাই। বাছুরটার কাছে তাহার দেনা যেন অনেক। তাহার পা-খানা সে নির্ম্মম আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিল, বাছুরটা তাহার হাত চাটিল। পৃথিবীতে এমন প্রতিদান সে কখনও পায় নাই। হাঁ-ঘরেদের দলে থাকিবার সময় সে কুকুর পুষিত। কুকুর গুলার মত অনুগত জীব আর হয় না। কিন্তু মারিলে সেগুলা এক বেলাও অন্তত দূরে দূরে থাকিত, হয় ভয়ে পলাইত অথবা গোঙাইত। দুনিয়াতে অনেক জনের কাছেই নির্ম্মম প্রহার পাইয়াছে, সে তাহাদের কাহাকেও ক্ষমা করে নাই, অনেক জীবকে সে প্রহার করিয়াছে—হত্যা করিয়াছে—সে গুলার অধিকাংশই বন্য বা অপরের গৃহপালিত, তাহাদেরও কোনটা এমন ভাবে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই তাহাকেই পরম আশ্রয় বলিয়া জড়াইয়া ধরে নাই। বাছুরটার আনুগত্য তাহার কাছে অভিনব,—এমন অনুভূতির আস্বাদন সে জীবনে কখনও পায় নাই। তাই সে গোটা মুল্লুকটাই প্রায় ঘুরিয়া আসিল। থালাটা হাতে লইয়াই গিয়াছিল। ভাতগুলা ফেলিয়া দিয়াছে, ভাত ডালের দাগ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। থালাখানা নামাইয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বলিল, পেলাম না।

সেজবউ চুপ করিয়া রহিল। উত্তর দিতে সাহস হইল না। বাছুর—বাছুর বাছুর করিয়া ফিরিতেছে, আর ঘরে যে কাণ্ড—।

—রাঙ্গিয়া কই? রাজু!

সেজবউ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল—যা করতে হয় কর। আমি জানি না, আমি পারব না।

—কি?

—সারাটা দিন কাঠের মত শুকিয়ে পড়ে আছে মানুষ, কথাও নাই, বার্ত্তাও নাই, ওই দেখ। একটা লোক না খেয়ে থাকলে—আমি খাই কি ক'রে? বলি মানুষের চামড়া তো গায়ে আছে।

রাজু খায় নাই। কি যে তাহার হইয়াছে, সে নিজেও তাহা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু সঞ্চয়ের ভাঁড়টি তুলিয়া—আঁচলে ঢালিয়া বাঁধিয়াও সে যাইতে পারে নাই। সেগুলিকে আবার যথাস্থানে রাখিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়াছে। জলবিন্দু মুখে না দিয়া পড়িয়া আছে।

পান্নুর সঙ্গে একবার লড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। না হয় ওই বর্ব্বরটার হাতেই মরিবে। তবু উহার নিষ্ঠুরতার শেষ সে দেখিবে। সঙ্গে সঙ্গে তিক্ততা এবং ক্রোধের উন্মত্ততার মধ্যে যে জীবনের কথা তাহার মনে হইয়াছিল—সে জীবনস্মৃতিও ভাল লাগে নাই। আশ্চর্য্য, চোখে জল আসিল সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে আসিয়া শুইয়াও সে অনেকক্ষণ কাঁদিল। সৈজ ডাকিলে সাড়া দিল না, নড়িল না।

পান্নু ঘরে আসিয়া রাজুর সামনে দাঁড়াইল।—এই হারামজাদী!

রাজু উত্তর দিল না। নড়িল না!

—শুনছিস?—খাস নাই কেনে?—এই হারামজাদী! এই—রাজিয়া।

রাজু নির্ব্বাক নিস্পন্দ!

পান্নু তাহার চুলের মুঠা ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিল। রাজু বসিয়া আপন দেহের কাপড় সংবৃত করিয়া লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

—খাস নাই কেনে?—এ—ই! এই হারামজা-দী—! শূয়া-রের বা—চ্চি।

রাজু বলিল—আমার ইচ্ছে!

—তোর ইচ্ছে? পান্নু খপ করিয়া তাহার সুডৌল বাহুমূলের খানিকটা অংশ দুই আঙুলে টিপিয়া ধরিয়া পাক দিতে সুরু করিল। এবং থামিয়া থামিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল—তোর ইচ্ছে? বল্?—তোর ইচ্ছে?—তোর ইচ্ছে?

রাজু চোখ বন্ধ করিল, যন্ত্রণায় তাহার কপাল ভুরু নাক মুখ—সব আপনি কুঁচ্‌কাইয়া জড়ো হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তবু সে একটি শব্দ উচ্চারণ করিল

না! পানু বিস্মিত হইয়া নিজেই ছাড়িয়া দিল। কয়েক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—হেঁসো? হেঁসোটা কই? হেঁসোটা!

রাজু হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। গতকাল হেঁসোখানা সে-ই কুড়াইয়া রাখিয়াছিল। সে নিজেই সেখানা বাহির করিয়া আনিয়া পানুর হাতে দিয়া বলিল—নাও! মার! মার! কোপাও!

সে যেন পাগল হইয়া গিয়াছে। ভয় নাই। চোখ তাহার জ্বলিতেছে অথচ সেই জ্বলন্ত চোখ হইতে জল গড়াইয়া এক অদ্ভুত মূর্ত্তি হইয়াছে তাহার।

পানু আজ সভয়ে পিছাইয়া গেল।

অকস্মাৎ বনে আগুন জ্বলিয়া উঠিলে—রাত্রির অরণ্যচারী পশুর পূর্ণ বর্ব্বর হিংসাও যেমনভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পিছাইয়া পিছাইয়া গহ্বরে গর্ত্তে গিয়া লুকায়, রাজুর চোখের দৃষ্টির সম্মুখে পানুর সকল সাহস সকল ক্রোধ—সকল নিষ্ঠুরতা তেমনিভাবেই সঙ্কুচিত হইয়া যেন লুকাইতে চাহিতেছে।

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াও সে বাড়ীর ভিতরে থাকিতে পারিল না। বাড়ির বাহিরে—দোকানের দাওয়ার সামনে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনে কখনও সে এমন অসহায় বোধ করে নাই। এমন জটিল নাগপাশের মত বন্ধনে সে কখনও জড়াইয়া পড়ে নাই। গোটা জীবনটাই সে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে, থানার জমাদার হইতে শুরু, বেদের দলের প্রতিদ্বন্দ্বী, দিদির গুরুঠাকুর, জমিদারের গোমস্তা, যশোদিমার বাবা, জমি বিক্রেতা সদ্গোপ চাষী, এই গাঁয়ের লোক, এমন কি এই যে সম্ভ এলোকেশীর মালিক—খোদ জমিদারের সঙ্গে বিবাদ শুরু হইয়াছে—এ পর্য্যন্ত কোথাও সে হারে নাই। কোথাও হাতে মারিয়াছে, কোথাও ঘরে আগুন দিয়াছে, প্রতিশোধ সে লইয়াছে, তাহার উপর প্রতিটি ক্ষেত্রে তাচ্ছিল্যের লাথি মারিয়া মনে সুগভীর তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। জমিদারের সঙ্গে লড়াই তাহার শুরু হইয়াছে, শেষ হয় নাই। শোধ সে লইবেই! হায়

স মানে নাই। তাহার উদ্যোগেই সে গতকাল হইতে একটা নেশায় মাতিয়া আছে। তাহার জন্যই সে গতকাল পাঁচক্রোশ-পাঁচক্রোশ দশক্রোশ হাঁটিয়াছে। তাহারই জন্য আজ সকালে সে তাহার পাঁচহাত লম্বা বল্লমটা পাড়িয়া মাজিয়া ঘষিয়া শানাইয়া সেটাকে কালদণ্ডের মত ভয়ঙ্কর এবং তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। রাজুকে উপলক্ষ পাইয়া তাহার নাম করিয়া বল্লমটা পাড়িলেও আসল লক্ষ্য হইল বাবুর উপর প্রতিশোধ। কালকে গিয়াছিল উত্তরে একটা বড় নদী পার হইয়া নদীপারের একটা গ্রামে; বনজঙ্গলের মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ ভল্লা বাগ্দীর বাস সেখানে। পুরুষানুক্রমে তাহারা ডাকাতি করিয়া খাইয়া আসিতেছে। মদ খায়—গাঁজা খায়—সমস্ত দিনটা ঘুমায়—রাত্রে জাগে বন্য বাঘের মত, সারা রাত তাণ্ডব নৃত্য করে। সুযোগ সুবিধা পাইলে ডাকাতি করে। ধরা পড়ে, জেল খাটে, আন্দামানে যায়, কেহ ফেরে, কেহ ফেরে না—সেইখানেই মরে। দল অনেকই আছে, কিন্তু এ দলের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা ভীষণ মানুষ, তাহারা শুধু এই বাংলাদেশেই ডাকাতি করে নাই বা করে না, এ-দেশ ও-দেশ পর্য্যন্ত মারিয়া আসিয়াছে; পাঞ্জাবী, ভোজপুরী, পেশোয়ারীদের সঙ্গে মিশিয়াও কাজ করিয়াছে। কয়লার কুঠি লুটিয়াছে, নদীতে নৌকা মারিয়াছে, ট্রেনে উঠিয়া লুঠ করিয়া শিকল টানিয়া নামিয়া পলাইয়াছে। লোকটার দুইটা বন্দুকও আছে, লুঠ করা মাল। পানু অনেক সন্ধান করিয়া সেই লোকটার কাছে গিয়াছিল। কিছুদিন আগে আন্দামান হইতে ফিরিয়াছে। নদীর ধারে একটা ভাঙা পরিত্যক্ত মসজিদের চত্বরের উপর ঘর তুলিয়া বাস করে। বিড় বিড় করিয়া বকে—মালা জপে। কথা কয় না সহজে। পানু তাহার সহিত প্রাথমিক কথাবার্তা বলিয়া আসিয়াছে। সে বলিয়াছে—আমি ভেবে দেখি, তুইও ভেবে দেখ! কিন্তু মালের ভাগ তুই পাবি না! তোর ভাগে সে শালার জামাটা রইল। পানু উল্লসিত হইয়া ফিরিয়াছে। তাহার সে উল্লাস—তাহার সে ভয়ঙ্কর কল্পনা আজ একটা মেয়ে যেন এক মুহূর্ত্তে বিপর্য্যস্ত করিয়া

দিতেছে। বাহিরে যুদ্ধযাত্রার মুহূর্তে হারামজাদী রাজিয়া ঘরে এমন যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, যে যুদ্ধে মুহূর্তে তাহার অবস্থা অজগরের পাকে জড়ানো ক্ষিপ্ত বাঘের অবস্থার মত সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠুর আক্রোশ তাহার পরিমাপহীন, নিষ্ঠুর আক্রোশ তাহার দুনিয়ার সকলের উপর, সেই আক্রোশের ঠিক চরম উন্মাদনাপূর্ণ কল্পনার মুহূর্তটিতেই এক অকল্পিত দিক হইতে ততোধিক অকল্পিত এক আঘাত খাইয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দেহ-মন যেন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। মনে মনে বলিল—থাক, সবুর কর, কয়টা দিন সবুর কর। তারপর সে দেখিবে। ওই বাবুর বাড়ীতে যে রাত্রে তাণ্ডবনৃত্য করিবে, বাবুর বুকে ওই বল্লমটা বিঁধিয়া দিবে সেই রাত্রেই ইহার প্রতিকার সে করিবে। দেশ তাহাকে ছাড়িতেই হইবে। এবং এবার দেশ ছাড়িতে হইবে একা। কাচ্চা-বাচ্চা আর দুইটা বউ লইয়া পালানো অসম্ভব। একমাত্র রাজুকে লইয়াই পালানো চলিত। মুঙলী ও তাহার কন্যার পিঠে দুইজনে চড়িয়া নদীর ধারের জঙ্গল ধরিয়া চলিতে পারিত। কিন্তু না, থাক সে কল্পনা। বাবুর বাড়ীতে তাণ্ডব সারিয়া বাড়ী ফিরিবে, বাড়ীতে ওই রাজুটাকে কাটিবে। হঠাৎ আরও একজনের কথা মনে হইল; হাঁ, রাজুকে কাটিয়া নদী পার হইয়া শ্মশানেশ্বরীর আশ্রমে ঢুকিয়া ওই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কাটিবে—তাহার পর সে রওনা হইবে। আশ্রয়ও সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। সেই অরণ্য আশ্রয়। খুন করিয়া ধরিবে সে নদীগর্ভের বালুপথ। নদী বড় ভাল। পাহাড় হইতে বাহির হইয়া বনে বনে প্রান্তরে প্রান্তরে সে চলে। দু'পাশে শরবন—কাশবনের আড়াল কাটাইয়া তাহার পথ। তাহার মনে পড়িল বেদে জীবনের 'দেওতাদের' কথা। বনে পাহাড়ে থাকেন দেওতারা, নদীতে থাকেন 'দেওমায়ীরা'। নদীপথ ধরিয়া সে গিয়া উঠিবে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলভরা পাহাড়ে। কাপড় ছাড়িয়া লেংটি পড়িবে। সেই পুরানো বুলিতে কথা বলিবে,

দাড়ি-গোঁফ কামাইবে না, আবার গজাইবে। গায়ে ক্রমে সেই গন্ধ উঠিতে আরম্ভ করিবে। একদিন হয় তো সেই বেদিয়ার দলটার সঙ্গে দেখাও হইয়া যাইবে। বাস্ খতম।

হাঁ। আর কয়েকটা দিন সবুর কর। এক রাত্রে তিনটা মাথা লইবে সে! বাবু, রাজিয়া, সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীটাও তাহার দুষমণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পিঠের চাবুক নিজের কপালে লইয়া লোকটা বহুত বাহাদুরি করিয়াছে। কাল সন্ধ্যার সময় ফের লোকটার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, আজও সকালে দেখা হইয়াছে। পাগু লোকটার সামনে মাথা তুলিতে পারে নাই। মিষ্টি মিষ্টি কথা কয়, মিষ্টি মিষ্টি হাসে! রাজিয়া কি?—হাঁ-হা! তিন মাথা সে লইবে।

ঘরে ঢুকিয়া বল্লমটা লইয়া সে রওনা হইয়া গেল। বড় নদীর ধারে জঙ্গলে ঘেরা ভাঙা মসজিদের উপর কাঠের ধুনিতে আগুন জ্বলিতেছে, কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছে, বুড়া গাঁজা খাইতেছে, মদের বোতল গড়াগড়ি যাইতেছে; তাহার পায়ে পাতার মর-মর শব্দ উঠিবামাত্র আলোটা নিভিয়া যাইবে, আগুনটার উপর একটা গরুর জাবখাওয়া ডাবা ঢাকা পড়িয়া আর দেখা যাইবে না।

চলিতে চলিতে পথে সে থমকাইয়া দাঁড়াইল। বাছুর ডাকিতেছে। গ্রামের উত্তর প্রান্তের ঘন বন-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় একটা বাছুর ডাকিতেছে। কোন্ বাছুর—কাহার বাছুর?

ছাব্বিশ

বাছুরটা সেই সর্বনাশী এলোকেশীই বটে। রাজুবালা বাছুরটাকে ফিরাইয়া আনিতেছিল। অনাহারে পড়িয়া থাকার মত ক্ষোভের মধ্যেও সন্ধ্যা হইতেই তাহার বাছুরটার কথা মনে হইয়াছে। না মনে করিয়া উপায়ও ছিল না। খিড়কীর দরজার মুখে অপরাহ্ন হইতে এ পর্য্যন্ত তাহ

বাউড়িনী তিনবার উঁকি মারিয়া গিয়াছে। রাজু উত্তর-পাড়ায় ভাদুর বাড়ীতেই এলোকেশীকে তখন রাখিয়া গিয়াছিল। ভাদুর সঙ্গে রাজুর কারবার আছে। ভাদু নিজেও দুধ বেচিয়া থাকে, হাঁস আছে, ডিম বিক্রী করে। আর করে দালালী—নিজেদের পাড়ার মেয়েদের থালা, কাঁসার বাসন, রূপার দু-এক পদ গহনা লইয়া মহাজন দেখিয়া বাঁধা দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াও দেয়। রাজু ভাদুর মারফত গোপনে মহাজনী করে, ভাদুর বাড়ীতে কয়েকটা হাঁসও কিনিয়া রাখিয়াছে, ডিম ও বাচ্চার আধা ভাগ ভাদুকে দেয়, ভাদু তাহার বাধ্য লোক, তাঁবের মানুষও বটে। ঝোঁকের মাথায় ও-বেলায় যখন সে বাছুরটাকে ভাদুর বাড়ীতে রাখে তখনই ভাদু বলিয়াছিল—আমাকে তুমি ফেরে ফেল্লা রাজু দিদি! খুনে মানগুড়ের জ্যান্ত গরুর বাছুর কি করে ছাপিয়ে রাখব বল্ দেখি? জানতে পারলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে, হয়ত ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

রাজু চমকিয়া উঠিয়াছিল—কথাটা সে বুঝিয়াছিল। কথাটা নির্ভুল সত্য বলিয়াছে ভাদু। তা ছাড়া—ক'দিন এমন ভাবে রক্ষা করিতে পারিবে সে? ভাদু বলিয়াছিল—তা তুমি এনেছ দিদি, রেখে যাও এ-বেলা। ও-বেলায় কিন্তুক নিয়ে যেয়ো তুমি। আমার ভাই ঠাঁইঠুনো নাই। বোঝার ওপরে শাকের আঁটি তো আঁটি—পাতার কুটো রাখবার জায়গা নাই আমার।

রাজু তবুও তখন রাখিয়া গিয়াছিল। ভাবিয়াছিল—থাক এ-বেলাটা। ইতিমধ্যে সে চলিয়া যাইবে, যাইবার পথে বাবুদের অথবা সন্ন্যাসীকে বলিয়া যাইবে—গো-হত্যে হবে, বাছুরটাকে বাঁচান।

কিন্তু তাহার পর অকস্মাৎ সব পাল্টাইয়া গেল। কি যে হইল—কেন যে এমন হইল সে কথা সে বুঝিল না, বুঝিতেও চাহিল না, একটা দুর্দম হৃদয়াবেগ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তাহার বাস্তব-বোধ, সকল বুদ্ধি—এমন কি সকল ভাল-মন্দ বিচারের প্রবৃত্তিও সে আবেগে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কঠিন সঙ্কল্প লইয়া সে পাহুর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার সম্মুখে ভয়লেশশূন্য সহশক্তি লইয়া

পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে ক্রমে সে শক্তি কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া এমনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে আঘাতে আঘাতে গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয়তো চলিবে কিন্তু তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া কি অবহেলায় ছুঁড়িয়া ফেলা চলিবে না। সে আজ যেন পানুকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেও পারিয়াছে। কেমন করিয়া জানি না, পানুর মন অভিপ্রায় আজ সে, পাখীমায়ের ডিমের খোলার-ভিতরের-ছানার-নড়াচড়া-ও-ঠোঁটের-ঠোকর-বুঝিতে-পারার মত অনুভব করিতে পারিতেছে। পানুর বুকের স্পন্দনের স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা নদীর ঘাটে স্রোত এবং ঢেউয়ের মত রাজুর মনে স্পর্শ দিয়া চলিয়াছে, আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। সে বেশ বুঝিতেছে, ভীষনতম একটা কল্পনা পানুর বুকের স্পন্দনকে দ্রুততর করিতেছে, চোখকে—সঙ্কুচিত দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ-ভয়াল করিয়া তুলিতেছে, মুখের রেখাগুলিকে করিয়া তুলিতেছে কুটীল, ক্রুর। আবার এলোকেশীর জন্য ব্যর্থ অনুসন্ধানে সারা দুপহরটা ফিরিয়া সন্ধ্যার আগে যখন পানু ফিরিল তখন রাজু দেখিল, গম্ভীর বেদনায় পানুর অন্তরটা সম্মুখের ওই রুক্ষ রসহীন টিলাটার বর্ষা-ঋতুর রূপের মত শ্যামল কোমল হইয়া উঠিয়াছে, সে সবুজ শোভা ডাকিতেছে এলোকেশীকে। তখন তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। তখন ইচ্ছাও হইয়াছিল, হাসিয়া আশ্বাস দিয়া তাহাকে বলে—আছে গো আছে। সর্ব্বনাশী এলোকেশী আছে। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য তাহার অভিমানও হইয়াছিল। পর মুহূর্ত্তেই সেজ তাহার বিরুদ্ধে পানুর কাছে অভিযোগ করিল, পানু রক্তচক্ষু লইয়া তাহাকে শাসন করিতে আগাইয়া আসিল। রাজুও আবার কঠিন হইয়া সব সহিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

পানু ভয় পাইয়া প্রথম হার মানিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রাজুর আবার হইল অভিমান। ঠিক এই সময়েই ভাদু আর একবার উঁকি মারিয়া দেখা দেখা দিয়া তাগিদ জানাইয়া গেল। ভাদুর উপরে খানিকটা রাগ করিয়াই রাজু উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভাদু বলিল—নিয়ে যাও ভাই রাজু দিদি। যে চেঁচালে সারাটা দিন! আমি তো ভয়ে সারা, কখন শুনতে পেয়ে খেঁটে নিয়ে আসবে তোমার আয়ান ঘোষ।

রাজু কোন কথা না বলিয়া বাছুরটার গলায় আঁচল বাঁধিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল।

ভাদু তাহাকে পিছন হইতে ডাকিল—রাজু দিদি!

ভুরু কুঁচকাইয়া রাজু বলিল—কি?

ভাদু কাছে আসিয়া কেরোসিনের ডিবেটা তুলিয়া তাহার মুখের সামনে ধরিল, সবিস্ময়ে বলিল—রাজু দিদি!

—কেন? বল্ না কি বলছিস?

—কি হয়েছে ভাই, তোমার?

—কি হবে?

—কি হবে? চোখের চারপাশে কালি পড়েছে। তবু চোখ দুটো ডব ডব করছে ভরা পুকুরের মত, খুব কেঁদেছ—সারাদিন কেঁদেছ, নয়?

রাজু বলিল—আমার শরীরটা ভাল নয় ভাদু। তোর সঙ্গে রসের কথা কইবার আমার সাধ্যি নাই আজ।

ভাদু তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।—কি হয়েছে ভাই। তিনবার গেলাম—তিনবারই দেখলাম শুয়ে রয়েছ। মেরেছে?

রাজু হাসিয়া—বাঁ হাত দিয়া ডান বাহুর উপরের কাপড় সরাইয়া দেখাইয়া বলিল—এই দেখ।

গৌরবর্ণ বাহুটার উপর—ঘননীল কালসিটে পড়িয়াছে, ফুলিয়া উঠিয়াছে। রাজু ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিয়া বলিল—আবার বলে খুন করব! আমি হেঁসোটা দিলাম হাতে। বললাম—কর খুন। তখন পিছিয়ে গেল। আমি দেখব ভাদু, ওকে আমি দেখব—।

শিহরিয়া ভাদু বলিল—না—না দিদি, ওকে বিশ্বেস নাই।

উপেক্ষা করিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে ঠোঁট দুইটা উল্টাইয়া দিয়া রাজু চলিয়া গেল। বাছুরটা এতক্ষণ বেশ ছিল, রাজুর হাত চাটিতেছিল কিন্তু গলায় টান পড়িতেই খোঁড়া পা লইয়া দ্রুত চলিবার শক্তির অভাবে চীৎকার শুরু করিয়া দিল।

ও-বেলায় রাজু সর্ব্বনাশীকে কোলে তুলিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু সারাদিন অনাহারে থাকিয়া এবং নির্য্যাতন সহ্য করিয়া শরীরটা এ-বেলায় ভাল নাই। নহিলে কোলেই তুলিয়া লইত। কিন্তু ওটাও যাইবে না, যাইতে পারিবে না বেচারী। অগত্যা রাজু বাছুরটাকে কোলে তুলিয়া লইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পান্নু সেই পাঁচ-হাত লম্বা বল্লমটা হাতে অন্ধকারের মধ্যে প্রেতের মত তাহার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—হুঁ। শালী!

রাজুও তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যেই চিনিয়াছিল। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র চঞ্চল হইল না। স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কোথা যাচ্ছ তুমি?

সে কথার জবাব না দিয়া পান্নু বলিল—শালী সারাদিন উপোস করে আছিস নয়? হুঁ। উপোস ক'রে বাছুর ঘাড়ে করতে ক্ষ্যামতা থাকে! শালী!

রাজু যেমন ভাদুর কথায় হাসিয়াছিল, ঠোঁট উল্টাইয়া তেমনি বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসিল।

পান্নু চাপা চীৎকারে বলিয়া উঠিল—নোড়া দিয়ে দাঁত ভেঙে ঠোঁট ছেঁচে ওই হাসি তোমার বার করে দোব হারামজাদী!

—তা দিয়ো। রাজু আবার হাসিল। কিন্তু তুমি যাবে কোথা? এই সন্ধ্যের সময়, গলা চেপে কথা বলছ তুমি?

পান্নু কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া গেল। তারপর উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করিল—বাছুর পেলি কোথা? কোথা ছিল?

রাজু বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া বলিল—গো-হত্যের ভয়ে ওকে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম।

পান্নু সবিস্ময়ে বলিল—ওকে আমি মারতাম?

—না হয় কসাইকে বেচতে! আজ তোমাকে বিশ্বাস ছিল না। কথা শেষ করিয়া বাছুরটাকে কোল হইতে নামাইল; পানুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—কোথা যাবে তুমি?

গম্ভীর স্বরে পানু বলিল—হাত ছাড়।

—না, কোথা যাবে তুমি?

—যাব সে এক জায়গা।

—জায়গা ছাড়া মানুষ যায় না। কোন্ জায়গা?

পানু বলিল—তোর মরণ-পাখা উঠেছে রাজু—তোর মরণ-পাখা উঠেছে।

—উঠেছে। পাখায় আগুন ধরিয়ে তোমাকে পুড়িয়ে ছারখার করব আমি। বল তুমি কোথা যাবে? কাকে খুন করতে যাবে?

পানু চমকিয়া উঠিল।

রাজু বলিল—বল?

পানু এবার বলিল—হাঁ—হাঁ। খুন—খুন! তিন খুন করব আমি! তিন খুন!

রাজু শিহরিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া উঠিল—না। যেতে পাবে না তুমি! আমাকে খুন ক'রে—

—হাঁ—হাঁ। তুকেও বাদ দিব না। তুইও বাদ যাবি না। হাঁ-হাঁ! আগে লিব ওই বাবুর মাথা! অন্ধকারের মধ্যে পানুর চোখ জ্বলিয়া উঠিল।

—না!

—হাঁ—হাঁ! তারপর লিব তোর মাথা! অন্ধকারের মধ্যে পানুর সাদা দাঁত ঝকমক করিয়া উঠিল।

রাজু বলিল—আমাকে খুন কর তুমি—

বাধা দিয়া পানু বলিল—তা পরেতে লিব ওই সন্ন্যাসী ঠাকুরের মাথা।

রাজু চীৎকার করিয়া উঠিল—না!

পানু হাসিয়া উঠিল। বলিল—তবে বাবুর বাদে লিব ওই সন্ন্যাসীর

মাথা। তারপর তু। সে ঝাঁকি দিয়া রাজুর হাত ছাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

রাজু বলিল—শোন! শোন! ফের বলছি ফের!

পান্নু ফিরিয়া আসিল। নিষ্ঠুর ভাবে কৌতুক করিবার জন্যই বোধ হয় ফিরিয়া আসিল।

রাজু তাহার হাত ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পান্নু অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—হাত ছাড়! তুকে কাটব না। ছাড়!

—না। তুমি আমাকে কাট। কিন্তু এ পাপ তুমি করতে পাবে না।

—পাপ? দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া পান্নু বলিল—পাপ? বাবু আমাকে চাবুক মেলে, আমাকে জুতা মেলে—আমার জরিমানা করলে তাতে পাপ হ'ল না! আমার পাপ হবে? পাপ! তার পাপ নাই আমার পাপ!

—সে পাপের সাজা ভগবান দেবেন—

—ভাগ! আমি দিব। আমার নিজের হাতে আমি দিব।

—না—না—না।

পান্নু পশুর মত একটা ক্রুদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল।

রাজুও পাগলের মত সেই মাঠের মধ্যেই তাহার পায়ে মাথা কুটিতে লাগিল। বর্ব্বর পান্নুও এবার ক্ষেপিয়া গেল। সে রাজুর মাথার উপরে লাথির উপর লাথি মারিতে সুরু করিল। গোটা কয়েক লাথি মারিয়া সে হন হন করিয়া চলিয়া গেল। পিছন ফিরিয়া একবার চাহিল না পর্য্যন্ত।

কিছুক্ষণ পর ভাদু আসিয়া রাজুকে তুলিল। কপাল কাটিয়া গিয়াছে, নাক দিয়াও রক্ত গড়াইতেছে, রাজুর কালো চুলের রাশি খুলিয়া ধূলায় বিপর্য্যস্ত হইয়া ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। চীৎকার শুনিয়া ভাদু আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া সব দেখিয়াছে।

রাজু লজ্জায় মরিয়া গেল।

ভাদু রাজুর ভাবের লোক। তাহার কাছে কোন কথা তাহার গোপন নাই। কতজনের কত দৌত্য ভাদু তাহার কাছে নিবেদন করিয়াছে। বছর খানেক আগে পর্য্যন্ত রাজু তাহার পছন্দমত দৌত্য মধ্যে মধ্যে গ্রাহ্যও করিয়াছে। বৎসর খানেক এ সবে কেমন অরুচি জন্মিয়াছে। কিন্তু রসিকতা চলিত দুই সখির মধ্যে। ভাদু কোন দৌত্য আনিলে সে হাসিত, রঙ্গও করিত কিন্তু শেষে অগ্রাহ্য করিয়া বলিত, না; সেই ভাদুর কাছে তাহার লজ্জাটা যেন চরম হইয়া উঠিল। মনে হইল ভাদু যখন দেখিল তখন পানু তাহাকে মারিয়া শেষ করিয়া দিয়া গেল না কেন?

ভাদু বলিল—ওঠ।

তারপর বলিল—রাজু দিদি তুমি চলে যাও; তুমি চলে যাও! ছি-ছি-ছি কপালের নেকন তোমার! কতজন সাধছে—ওই গাঁয়ের ময়রা জমাদার বলে—আসে তো পাল্কী পাঠিয়ে নিযে যাব।

রাজু নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সাদা কাপড় পরা রাজু কাপড় ঝাড়িল বার দুই; কাপড়ের ধূলা ঝাড়িয়া উড়িয়া অন্ধকারকে গভীর করিয়া তুলিল। পিছনে যেন একটা আবরণ তুলিয়া দিয়াই সে চলিয়া গেল। ভাদু তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া জিভ কাটিয়া বলিল—মরণ। এই বয়সে মজলে তুমি! হায়-হায়-হায়!

সেও চলিয়া গেল আপনার বাড়ীর দিকে!

এলোকেশী দূরে উত্তর মাঠে ডাকিতেছিল। খোঁড়াইয়া পা টানিতে টানিতে সে চলিয়াছে।

পানু দাঁড়াইল। কি বিপদ! রাজু ছাড়িল তো এটা সঙ্গ ধরিয়াছে। তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে আসিতেছে। সামান্য ক্ষণ দাঁড়াইয়া সে আবার চলিতে সুরু করিল। থাক—পিছনে পড়িয়া থাক। এই নির্জ্জন মাঠে এই রাত্রিকালে উহার নিয়তি ঘনাইয়াছে। তাহার উপর পানুর কি হাত আছে! শিয়ালের পালের নজরে পড়ার অপেক্ষা। নজরে পড়ারও

প্রয়োজন নাই, যে মরণ ডাক ও নিজেই ডাকিতেছে—সেই ডাক শুনিয়া এতক্ষণ মাঠের মধ্যে এখানে ওখানে শেয়ালগুলা কান খাড়া করিয়া দিক লক্ষ্য করিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। পাঁনুর অনুমান মিথ্যা নয়। একটা চতুষ্পদ তাহার পাশ দিয়াই ছুটিয়া গেল। বাছুটার ডাকেরও বিরাম নাই। রাত্রেই ফিরিবার পথে পানু একটু খুঁজিলেই কঙ্কালটা দেখিতে পাইবে। আঃ—ছি! ছি! ছি! সে আবার দাঁড়াইল। এবার ফিরিল।

তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে বাছুরটার চোখের সেই দৃষ্টি। আঃ—ছি-ছি-ছি! আজ রাজুর হাতে যখন চিমটি কাটিয়া ধরিয়াছিল তখন ঠিক এমনি চাহনি চাহিয়াছিল সে। তারপর চোখ মুদিয়াছিল। তার চোখে তখন আগুন জ্বলিয়াছিল। এই অন্ধকারের মাঠের মধ্যে আবার সেই চাহনি চাহিয়াছে রাজু। আঃ—ছি-ছি-ছি!

দূরে কয়েকটা শেয়াল ছুটিতেছে। বাছুরটা চীৎকার করিতেছে। পানু ছুটিল। একবার বল্লমটা উঠাইল—পাশেই একটা ছুটন্ত শেয়ালের দিকে! কিন্তু পরক্ষণেই নামাইয়া লইল। খাদ্য আর খাদক। বনের পশু। পাইলেই খাইবে। না খাইলে পাইবে কোথায়? এই তো বিধান! উহারা বাবু নয়, ঠাকুর নয়! শেয়ালে শেয়াল ধরিয়া খায় না। মানুষে মানুষের বুকের রক্ত চোষে।

এলোকেশী মাঠের একটা উঁচু আল-পথ হইতে পড়িয়া গিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দূরে দূরে অন্ধকারের মধ্যে ছায়ার মত চতুষ্পদ ঘুরিতেছে। বোধ হয় আগাইয়া আসিতেছিল। পানুকে দেখিয়া থামিয়া গেল। এলোকেশী ভয় পাইয়াছিল। পানু লেজে ধরিয়া ওটাকে খাড়া করিল। বাছুর এবার ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিল। প্রচণ্ড বিরক্তির সহিত সে নির্বোধের মতই চারিদিকে তাকাইল। বাছুরটাকে কোথায় পৌঁছাইয়া দিয়া সে রওনা হইতে পারে। পশ্চিমে পূর্ব্বে উত্তরে মাঠ অন্ধকার একাকার হইয়া গিয়াছে। কতদূরে যে গ্রাম বনরেখা তাহা বুঝাই যায় না। দক্ষিণে

অদূরে তাহার গ্রাম। পশ্চিম-দক্ষিণ গ্রাম প্রান্তে তাহার বাগানও দেখা যাইতেছে। তাহার পাশে ওই টিলাটা। সে বাছুরটার পাশে বসিল। বাছুরটার মত ভাল আর কোন জীব সে পৃথিবীতে দেখে নাই। যে নিষ্ঠুর প্রহার সে তাহাকে করিয়াছিল—তাহার পরই এমনভাবে হাত চাটিয়া ভালবাসা জানাইতে কেহ পারে বলিয়া পানুর ধারণা নাই। কিন্তু আজ সে ভালবাসাই বিপদে ফেলিয়াছে তাহাকে।

এই অবসরটুকু পাইয়াই বাছুরটা তাহার পিঠ চাটিতে সুরু করিয়াছে। পানু গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। চল্—হারামজাদী! চল্।

বাছুরটাকে ঘাড়ে তুলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।—চল্।

খানিকটা দূর আসিয়াই সে আতঙ্কে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

আগুন! লকলক করিয়া আগুন জ্বলিতেছে—নাচিতেছে! একি কোন শুক্‌না শরবনে আগুন লাগিয়াছে? ওঃ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে টিলাটার ধারে! তাহার মধ্যে, তাহার ঘরে। লকলক করিয়া শিখা উঠিয়া নাচিতেছে। বৈশাখ মাস, বৈশাখের আগুন শিবের কপালের আগুন! অন্ধকার লাল হইয়াছে। বাতাসে এখানে পর্য্যন্ত উত্তাপ আসিতেছে কিন্তু এ কি হইল? তাহার ঘরে—তাহার টিনের ঘরে—আগুন! খড়ের গোয়াল আছে। আটি-বাঁধা শর আছে। কে? কে? কে দিল আগুন! রাজু! রাজু! শয়তানী শোধ লইয়াছে। ওঃ! গ্রামপ্রান্তে বাছুরটাকে ফেলিয়া দিয়া উন্মত্তের মত বল্লম হাতে সে ছুটিল।

আগুন জ্বলিতেছে। বৈশাখের আগুন। দাঁড়াইয়া পুড়িতেছে।

—আমি জানতাম! আমি জানতাম! আমি জানতাম! আঃ—আঃ—আঃ সর্ব্বনাশী বুকের আগুন গায়ে লাগাল? ভানু ছুটিতেছে তাহার সামনে।

আগুনটা আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

আগুনকে অতিক্রম করিয়া পানু ঘরে আসিয়া পৌঁছিল। দুই চারিজন লোক জমিয়াছে; আরও লোক আসিতেছে, সেজ বউ বুক চাপড়াইতেছে—ওগো দিদি, কি করলি গো! ওগো দিদি—ও দিদি গো;

বড় ছেলেটা চেঁচাইতেছে—ওগো মেজ মা গো; ওগো—মেজ মা কেনে পুড়লি গো।

পানু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজু? রাজু পুড়িয়াছে? পুড়িতেছে? রাজু? রাজু? বিলাসিনী রাজু? চুরণী রাজু? তেল্কী-দারুণী রাজু! রাজু? রাজু!

ভাদু এবং কয়েকজনে রাজুর জ্বলন্ত কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল। সেজ বউ হঠাৎ সেই জ্বলন্ত কাপড়ের টুকরা কুড়াইয়া লইয়া পাগলের মতই পানুর গায়ে ছুঁড়িয়া দিল—পোড়—পোড়, তুইও পুড়ে মর।

পানু পুড়িল না কিন্তু উত্তাপে পাথরের মত সশব্দে ফাটিয়া মাটির উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

ভাদু আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—রাক্ষসকে ভালবেসে পুড়ে মলি শেষে। রাজু—রাজু—রাজু দিদি!

গাঁয়ের লোক ভাঙিয়া আসিল। পানুর উপর কঠিন নিষ্ঠুর অভিসম্পাত অজস্র বর্ষণ করিল। তাহাকে কেহ আজ ভয় করিল না, পানুর ঘরের কথা বলিয়া অনধিকার চর্চ্চা মনে করিল না। সুদীর্ঘ দিন এই কথাটারই গণ্ডী টানিয়া আপন ঘরে রাজুকে সেজ বউকে ছেলেকে মহিষকে কুকুরকে ইচ্ছামত ঠেঙাইয়া নির্য্যাতন করিয়াছে। যদি কেহ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে তাহাকেও দু'চার ঘা দিয়াছে—অন্ততঃ ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে।

কয়েকজন বলিল—ধর হারামজাদা রাক্ষসকে, হাতে পায়ে বেঁধে—যে কেরোসিনটা আছে এখনও গায়ে জেলে দাও—ওই আগুন ধরিয়ে দাও।

ভাদুই সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। বলিয়াছে—লাথির উপরে লাথি। মাথার ওপরে। দোষ কি? না—ও বলে বাবু আমাকে চাবুক

মেরেছে—জরিমানা করেছে আমি তাকে খুন করব, নমোনারায়ন বাবা ওর হয়ে সেই চাবুক খেয়েছে তাকে খুন করব। রাজু দিদি বলেছে না তা পাবেনা; দোবনা আমি তোমাকে সে পাপ করতে। এই বলে—তবে তোকেও খুন করব। তিন খুন করেঙ্গা বলে রাক্ষসের মত দাঁত কট মট করে উঠল।

সমবেত জনতা প্রতিবাদে ক্রোধে ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিতেছিল। একজন বলিল, থানায় খবর দাও। ভাদু তোকে বলতে হবে সব কথা। তুই নিজে কানে শুনেছিস।

পানু কোন কথা যেন শুনিতেই পাইতেছে না। একবার সে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল—তাহার পর উঠিয়া রাজুর পোড়া দেহখানার কাছে বসিয়া এক বিচিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে শুধু চিবুকটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। বুকের মধ্যে একটা কিসের পাথর যেন 'উতল-পাতল' করিতেছে! গলার কাছে একটা ডাক যেন পথ না পাইয়া সেইখানেই মাথা কুটিয়া মরিতেছে। রাজু, রাজিয়া, রাজু, রাজুরে!

ভাদু আক্ষেপ করিতেছিল,—আমি জানতাম, এমুনি একটা কিছু হবে—তা জানতাম আমি। রাজু দিদির ভাবগতিক দেখে বুঝেছিলাম আমি। বছরখানেক থেকেই অসম্ভব মতিগতি হয়েছিল। ওই রূপের মেয়ে, ওর ঘরে সাজে, না থাকে? রোগের সময় দুঃসময়ে ঠাঁই দিয়েছিল—তাই থাক। বলত আমাকে। কিন্তু বছরখানেক—কি যে হ'ল—? নেকন। [illegible]ন ছাড়া কি? নইলে রাজুকে নাকি ওই রাক্ষসের টানে পড়তে হয়, ওই পিশাচে নাকি মজে?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—জিনিষ যে বড় খারাপ। ও ছুঁলে আর রক্ষে নাই। দেখলাম অনেক। চোখের নেশা, নতুনের নেশা, দু'দিনের নেশা, দশ দিনের নেশা, কত দেখলাম। কিন্তু এই নেশা—রাজুকে যা পেলে শেষকালে—

কে একজন তাহাকে ধমক দিল—কি আবোল-তাবোল বক্‌ছিস ?

সে হাসিয়া বলিল—ভালবাসা গো, ভালবাসা ! আঃ, ভালবেসে পুড়ে মরল ছুঁড়ি।

আদুর কথাই হয়তো সত্য। হয়তো নয়, ওই কথাই সত্য। নহিলে কি কেহ এমন অবহেলাভরে আগুনের জ্বালা দেহে ধরাইয়া নিজেকে পুড়াইয়া দিতে পারে ? ভাল না বাসিলে রাজু কি এমন নির্ব্বোধ হয় যে, নিজে মরিয়া পান্নুর মত পাষণ্ডকে দুঃখ দিবার, কাঁদাইবার কল্পনা করে ? নিজেকে দুঃখ দিলে—ভালবাসার জন দুঃখ পাইবে—এ বিচিত্র আবিষ্কার—ওই বিচিত্র বস্তুটির। ও বস্তুকে যে সত্য করিয়া পাইয়াছে বা ওই বস্তু যাহাকে পাইয়া বসিয়াছে—সেই পারে—এমন অবহেলাভরে নিজেকে ছাই করিয়া ফেলিতে ! আর যে পায় এই দুর্লভ সামগ্রী—তাহার নিসংশয় প্রমাণ দিয়া যে এমনি করিয়া মরে তাহার জন্য গোটা বাস্তব সংসারের মানুষ কাঁদিয়া সারা হয়—চোখে জল আপনি আসে। বাস্তব সংসারের মানুষের অন্তরে অন্তরে এই তৃষ্ণা হাহাকার করিতেছে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত !

গোটা গাঁয়ের লোক উত্তেজনা ভুলিয়া—পান্নুর উপর ক্রোধ ভুলিয়া—চোখ মুছিতে লাগিল।

পান্নু ঠিক তেমনিভাবে বসিয়া আছে।

পুলিশ আসিয়া গেল !

পান্নু দারোগার মুখের দিকে চাহিল। আজ আর তাহার এক বিন্দু ভয় নাই, ক্রোধ নাই। শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বোধ হয় এই প্রথম দীর্ঘনিশ্বাস।

জনতার পিছন দিকে—লোকেরা হঠাৎ চঞ্চল হইল।

—সরে ; সরে ভাই ; পথ দাও।

নমোনারায়ণ বাবা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পান্নু এতক্ষণে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নমোনারায়ণ ঠাকুরের

কপালের দাগটা আজও মিলায় নাই। কালো দড়ির মত ফুটিয়া রহিয়াছে।

পান্নুর গলায় এবার কথা ফুটিল—ওষুধ বিষুদ জানেন বাবা? রাজুকে—।

তিমিরময়ী রাত্রি, দীর্ঘ—সুদীর্ঘ যেন একটা যুগ—একটা শতাব্দী না তারও চেয়ে দীর্ঘ সহস্রাব্দ—বহু সহস্রাব্দের মত দীর্ঘ। পান্নুর তাই মনে হইল। উপরে কৃষ্ণপক্ষের আকাশে কত তারা; কয়টা তারা খসিয়া গেল; পান্নু রাত্রির আকাশের দিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

দারোগা সুরতহাল রিপোর্ট লিখিতেছেন।

নমোনারায়ণ বাবা লিখাইতেছেন।—খুনের কথা? তিনি হাসিলেন। বলিলেন—হয় তো—বলেছিল। হয় তো করত। কিন্তু করে নাই, আর—। না! আর করবে না!

পান্নু একবার নড়িল না পর্য্যন্ত।

আকাশের দিকে চাহিয়া সে ক্ষণ গণিতেছে; চোখ দিয়া অনর্গল জল পড়িতেছে। এই অসহনীয় দীর্ঘ রাত্রি কখন শেষ হইবে—তাহারই জন্য সে প্রতীক্ষা করিতেছে; সর্ব্বশক্তি নিঃশেষিত অসহায় দুর্ব্বলের মতই সে প্রতীক্ষা করিতেছে।

সাতাশ

পান্নুর কাছে রাত্রিটা সত্যসত্যই দীর্ঘ, সুদীর্ঘ রাত্রি। শুধুই কি তাই? সে কি রাত্রি—সে শুধু পান্নুই জানে। জন্ম হইতে জন্মান্তরের অন্তর্ব্বর্ত্তী-কালের মত দীর্ঘ উদ্বেগময়; অমোঘ দণ্ডপাতের যাতনায় দুঃখে জর্জ্জর, বিমূঢ়; কালান্তরের বিপ্লব রাত্রির মত জটিল, বিশৃঙ্খল। সুদীর্ঘ রাত্রি শেষ হইল। পান্নু একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

রাজুর মৃতদেহের উপর তাহারই সবচেয়ে প্রিয় শাড়ীখানা ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল। সূর্য্যালোক আসিয়া আবৃত দেহের উপর পড়িতেই, পান্নু ঢাকা

খুলিয়া রাজুর মুখটা ভাল করিয়া দেখিল। ম্লান হাসিয়া রাজুকেই প্রশ্ন করিল—হাসছিস্? আমার দুঃখু দেখে? আবরণটা আবার টানিয়া ঢাকা দিল রাজুর মুখের উপর।

ছেলেটা সবিস্ময়ে পানুর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, সেজ বউও অবাক হইয়া গিয়াছে। পানুকে যেন চেনা যাইতেছে না। কত—কত—কত বয়স যে হইয়াছে অনুমান করা যায় না, পানুর বয়সের যেন গাছ-পাথর নাই।

সন্ন্যাসী সমস্ত রাত্রিই ছিলেন। তিনিই সুরতহাল তদন্ত শেষ করাইয়া দারোগার কাছে শবের শেষকৃত্যের অনুমতি লইয়াছেন। পানু বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী,—সেই অনুযায়ী সমাধি দিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। সকাল হইতেই তিনি বলিলেন—আমি চলি বাবা।

পানু শুধু সজল চক্ষে তাহার দিকে তাকাইল। কোন কথা বলিতে পারিল না। বাবাজী চলিয়া গেলেন।

গ্রা ঘরতিনেক বৈষ্ণব আছে; বাবাজীর ব্যবস্থায় তাহারা সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। খোল বাজাইয়া নাম সংকীর্ত্তন সুরু হইল। সামনের টিলাটায় রাত্রেই সমাধি খোঁড়া হইয়াছে। ওইখানেই রাজুর সমাধি হইবে। শবদেহ পানু একাই বহিল, আর কাহাকেও প্রয়োজন হইল না, পানু রাজুকে তাহার দুই বাহুর উপর শোয়াইয়া বুকের কাছে ধরিয়া বলিল—চল!

সমাধি দিয়া স্নান করিয়া সে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রি প্রহর-খানেকের পর সে ঘর হইতে বাহিরে আসিল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া রাজুর সমাধির পাশে বসিল। সকালে আসিয়া আবার ঘরে ঢুকিল।

**

তাহার পর কত দিন চলিয়া গিয়াছে! অনেক দিন, বৎসর-দুয়েকেরও বেশী।

শ্মশানেশ্বরী মায়ের আশ্রমে নমোনারায়ণ বাবার সম্মুখে পানু সেদিন আসিয়া বসিল। বাবাজী স্মিতহাসি হাসিয়া বলিলেন—এস!

পান্নু তাঁহাকে প্রণাম করিল, হাত জোড় করিয়া বলিল—তোমার অনুমতি নিতে এলাম।

আশ্চর্য্য—পরমাশ্চর্য্য! এ কণ্ঠস্বর পান্নুর সে কণ্ঠস্বর নয়! এ ভাষা সে ভাষা নয়। স্বরের মধ্যে সঙ্গীতের সুর—ভাষায় ভালবাসার লালিত্য। শুধু স্বর নয়—তাহার সর্ব্বাঙ্গটাই যেন আগেকার পান্নুর নয়। এমন পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিল—কি করিয়া ঘটিল—কেহ বুঝিতে পারে না, শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হয় লোকে। তাহার দেহ-বর্ণে রূপান্তর ঘটিয়াছে, কালো রঙ গৌরবর্ণ হয় নাই কিন্তু একটি পাণ্ডুর-শ্রী দেখা দিয়াছে। তাহার চামড়া শিথিল হয় নাই কিন্তু সে কর্কশতা নাই—[illegible] হইয়াছে। সারা অবয়বটাই যেন ভাঙা-চোরা হইয়া গিয়াছে। চোয়ালের সে উদ্ধত কঠোর হাড় দুইটা ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বিশীর্ণ মুখে মোটা নাকটা পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। পান্নুর চোখে শান্ত দৃষ্টি, একটি বিচিত্র আভাস তাহাতে দেখা যায়—মনে হয় সজল একটি স্তর অহরহ টলমল করিতেছে। পান্নুর গলায় তুলসী-কাঠের মালা, নাকে কপালে তিলক;—সে পান্নু যেন এই জন্মেই এক অভিনব গর্ভবাস অতিক্রম করিয়া জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

এই কিছুদিন পূর্ব্বে। একটি বিশাল প্রৌঢ় আসিয়া তাহার দোকানের সামনে দাঁড়াইল। স্থির দৃষ্টিতে সে পান্নুর দোকান ও পান্নুর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। পান্নু তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিল। তাহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল, পান্নু এই শিকঘেরা বারান্দার পরিসরের সঙ্কীর্ণতার সুবিধায় একা তাহার হেঁসোটা লইয়া লড়িয়া তাহাদের হঠাইয়া দিয়াছিল। সামনে ছিল যে লোকটা, অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া সে হেঁসোর কোপ হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য হাত তুলিয়াছিল, হেঁসোখানা ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। হেঁসোর কোপে তাহার তিনটি আঙুল বিসর্জ্জন দিয়া সে প্রাণে বাঁচিয়াছিল বটে কিন্তু ওই আঙুল-কাটার জন্য ধরা-পড়া এড়াইতে পারে নাই। লোকটার পাঁচ বৎসর জেল হইয়াছিল। এ সেই লোক।

পানু রামায়ণ পড়িতেছিল। লোকটিকে সে ডাকিল। লোকটি তাহার কাছে আসিয়া বলিল—তুমি কি তার ভাই? সে কোথা?

পানু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিয়া বলিয়াছিল—সে নাই।

—মরেছে? আঃ! লোকটি মা কালীর জয় ঘোষণা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

পানু নিজেও জানে এ তার জন্মান্তর। লোকেও তাই বলে। নমো-নারায়ণ বাবাও তাই বলেন। বলেন—পুরাণের গল্প জান, বাবা? সমুদ্র মন্থন হল—তাতে শেষে উঠল হলাহল, বিষ! শিব সেই বিষ অমৃতের মত পান করলেন; পান করেই তিনি ঢলে পড়লেন। তখন শিবাণী এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে স্ত্রী হয়েও নিজের স্তন পান করালেন। স্তনে ছিল অমৃত। শিব চেতনা ফিরে পেলেন। সেও তো এক জন্মান্তর বাবা। প্রাণকৃষ্ণের আমার জন্মান্তর তেমনি রাজু বেটির মধ্যে। ওরা তো সামান্য নয় বাবা। শিবাণী-ব্রহ্মাণী-বৈষ্ণবী-রাধা-কালী-জগদ্ধাত্রী-সবারই একটু একটু ওদের মধ্যে আছে যে।

নমোনারায়ণ বাবার কাছে পানু দীক্ষা লইয়াছে। তাঁহার এত সব তত্ত্বকথা সে বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চায়ও না, তবে রাজুর জীবনের মধ্যেই যে তাহার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে এ কথার মত সত্য আর কি আছে? তাহার চেয়ে এ কথা বেশী কে জানে, কে বুঝে? সে আপন মনেই কথাটা ভাবে, অনুভব করিয়া ঘাড় নাড়ে। চোখ দিয়া জলও গড়াইয়া পড়ে। মনে পড়ে সে কি কষ্ট! সে কি যন্ত্রণা!

দিনের পর দিন অন্ধকার ঘরে সে কাটাইয়াছে; রাত্রির অন্ধকারে বসিয়া থাকিত রাজুর সমাধির পাশে। রাজুর মৃত্যু-রাত্রির তিমিরময়ী স্মৃতিকে দীর্ঘ হইতে সুদীর্ঘ করিয়া চলিয়াছিল। সেজ বউ বলিত—ক্ষেপিয়া গিয়াছে। সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল—পানুর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ একদিন।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, আলো ফুটিতেছে, রাজুর সমাধি হইতে পানু ফিরিতেছে ঘরে, তাহার চোখে পড়িল সামনের সড়ক দিয়া সারি সারি লোক চলিয়াছে। মেয়ে-পুরুষ-বালক দলে দলে চলিয়াছে; কাঁধে কোদাল মাথায় ঝুড়ি। কলরব করিতে করিতে চলিয়াছে। নমো নারায়ণ বাবার সেই নদী বাঁধ বাঁধার কাজ সুরু হইবে আজ। অন্তত দশ হাজার লোকের কোদাল ঝুড়ি চারিদিন পড়িতে হইবে, তবে সে বাঁধ হইবে। সেই বাঁধ। মানুষের সারি চলিয়াছে, তাহার যেন আর শেষ নাই। দীর্ঘদিন পরে আজ সে কোদাল লইয়া বাহিরে আসিয়া মেজ বউ এবং বড় ছেলেকে বলিল—চল্ ঝুড়ি নিয়ে চল! দীর্ঘকাল পরে সূর্য্যালোকিত নদীর ধারে মানুষের কর্ম্মসমারোহের মধ্যে মিশিয়া যেন ঐ নদীর তটপ্রান্তে নূতন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইল।

পানু কাজ করিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহার পিঠের উপর হাত রাখিলেন। পানু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সন্ন্যাসী তাহার পিঠের সেই বেতের দাগের উপর হাত বুলাইয়া বলিলেন—গর্ভবাস শেষ হ'ল বাবা?

পানু কথাটা বুঝিল না। শুধু কাঁদিল। সন্ন্যাসী বলিলেন—কাজ কর বাবা। নূতন জন্ম হয়েছে—কাজ কর।

সন্ধ্যায় পানু শ্মশানেশ্বরী আশ্রমে গিয়া উঠিল। বলিল—রাজুকে ফিরে দিতে পার বাবা?

সন্ন্যাসী তাহার সারা অঙ্গে শুধু স্নেহের স্পর্শ বুলাইয়া দিলেন। কথা বলিলেন না।

পানু তাহার দুটি হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, বাবা!

সন্ন্যাসী বলিলেন—না বাবা। কেউ পারে কি-না জানি না, তবে আমি পারি না।

পানু কিন্তু ছাড়িল না। দিনের পর দিন নমোনারায়ণ বাবার কাছে